আরেক ভুবন
সোভিয়েত ইউনিয়ন
আবু জাফর শামসুদ্দীন

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর, ১৯৮২

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

প্রকাশক : প্রাচ্য প্রকাশনী
৬৭/৩, কাকরাইল, ঢাকা—১

মুদ্রণ : সুরমা আর্ট প্রেস
১৯/১-আই, শেখ সাহেব বাজার, ঢাকা—৫

মূল্য : বারো টাকা

....

লেখকের অন্যান্য বই : পদ্মা মেঘনা যমুনা। সংকর সংকীর্তন। প্রপঞ্চ। ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান। শ্রেষ্ঠ গল্প, শেষ রাত্রির তারা। এক জোড়া প্যাণ্ট ও অন্যান্য। রাজেন ঠাকুরের তীর্থ যাত্রা। চিন্তার বিবর্তন ও পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য। সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস। সোচ্চার উচ্চারণ। Sociology of Bengal Politics and Other Essays........ইত্যাদি।

আরেক ভুবন

সোভিয়েত ইউনিয়ন

আবু জাফর শামসুদ্দীন

প্রাচ্য প্রকাশনী ॥ ঢাকা

ভূমিকা

সোভিয়েত ইউনিয়নে আমার অভিজ্ঞতা বিষয়ে কিছু লেখার শুরুতেই মনে পড়ছে পরলোকগত মওলানা আবুল কালাম আজাদকে। ভারত সরকারের উদ্যোগে রচিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস একটি মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থ। তৎকালীন ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী রূপে মওলানা আবুল কালাম আজাদ ঐ গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দেন। মাত্র ১৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সমাপ্ত রচনাটির শুরুতে এক অনামী ইরানী কবির দু'টি পঙক্তির উদ্ধৃতি আছে যার ভাবার্থঃ "পৃথিবী একটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি। পাণ্ডুলিপিটির প্রথম এবং শেষ পৃষ্ঠা হারিয়ে গেছে। তাই গ্রন্থটি কিভাবে আরম্ভ হয়েছিল এবং কিভাবে তা' শেষ হ'তে পারে তার কিছুই আমরা জানি না"। ভূমিকাটির উপসংহারে মওলানা আজাদ মন্তব্য করছেন, "ইরানী কবির দু'টি পঙক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে ভূমিকাটি শুরু করেছিলাম। কবি বলেছেন, অস্তিত্ব বিষয়ক গ্রন্থটির (Book of Existence) প্রথম এবং শেষ পৃষ্ঠা হারিয়ে গেছে। হারানো পৃষ্ঠাগুলোর পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টা দর্শন শাস্ত্রের কাজ। প্রায় তিন হাজার বছর ধরে এ চেষ্টা চলছে। কিন্তু হারানো পৃষ্ঠাগুলো পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। ভবিষ্যতে সাফল্য লাভেরও কোনো সম্ভাবনা নেই। দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাস এ প্রচেষ্টারই বিবরণ। এ ইতিহাসে সাফল্যের বিবরণ নেই, কিন্তু বিধৃত আছে অভিযাত্রা এবং অনুসন্ধিৎসার এক চমকপ্রদ কাহিনী।

"দর্শনের তীর্থযাত্রিগণ অভীষ্ট বস্তু লাভ করেন নি। কিন্তু সুদীর্ঘ যাত্রাপথে অন্য একটি অত্যন্ত মূল্যবান বস্তুর সন্ধান পেয়েছেন। দর্শনের সন্ধান পথে ও'রা আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞান। বিজ্ঞান মানবজাতিকে নববলে বলীয়ান করেছে। কিন্তু শান্তি দেয় নি।

নির্মাণ-যন্ত্ররূপে বিজ্ঞানের প্রথম আবিষ্কার ঘটে। কিন্তু আজ সেটা ধ্বংসের অস্ত্ররূপে বিভীষিকার সঞ্চার করছে। শান্তি এখন মানবজাতির সামনে সব চেয়ে বড় সমস্যা। বিশ্ব-শান্তির পথ দর্শন শাস্ত্রকেই খুঁজে বের করতে হবে! একদা মানুষ শান্তিতে ছিল। হারানো পৃষ্ঠাগুলো খুঁজে না পাক, তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু দর্শন তার নব প্রচেষ্টায় যদি লুপ্ত শান্তি পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে পারে তাহলে একটি নতুন মহাগ্রন্থ রচিত হবে যার নাম হবে মানবতা। তা' হলে অন্য একজন ইরানী কবির ভাষায়, দর্শন শাস্ত্র এই বলে গৌরব করতে পারবে, "যারা এ পথের পথিক তারা কখনও ক্লান্ত হয় না, কেননা পথ এবং গন্তব্যস্থল যে অভিন্ন।"

সভ্যতার শীর্ষ বিন্দু আছে কি না জানি না। মানবজাতির সামাজিক ইতিহাস পাঠ করলে এ ধারণা হয় যে, সভ্যতা আপাত-দৃষ্টিতে এমন একটি উপলব্ধি যার ব্যাখ্যা স্থান কাল পাত্রভেদে বুঝিবা বিভিন্ন। কেননা আমরা সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে ভাগ বাটোয়ারা করে দেখতে অভ্যস্ত। সাধারণ ইতিহাসগ্রন্থে ভাগ-বাটোয়ারা করেই দেখানো আছে। মিশরীয়, বেবিলনীয়, গ্রীক, রোমান, চীনা, ভারতীয় প্রভৃতি নানা নামে সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিশেষিত। একালে নতুন নামকরণ হয়েছে ঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য। সমাজ বিজ্ঞানিগণ ঐ ভাবে বিশেষিত সভ্যতার উন্মেষ, উন্নতি, অবনতি, বিলুপ্তিকাল ও কারণও নির্ধারণ করেছেন। পাঠ করলে মনে হয়, বুঝিবা এক প্রহেলিকার আবর্তে ডুব দিলাম। সভ্যতা ও সংস্কৃতির কি দৈর্ঘ্য প্রস্থ ওজন আছে? তার উন্নতি অবনতি নির্ধারণের মাপকাঠি কি? পুঁথি পুস্তকে এ সব প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজেছি। বাহুবল কি সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন? অথবা বিভিন্ন যুগে আবিষ্কৃত এবং ব্যবহৃত যানবাহন এবং অস্ত্রশস্ত্র? সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন কি স্থপতির নকসা অনুযায়ী নির্মিত সুদৃশ্য নগর? সভ্যতা ও সংস্কৃতি কি মসজিদ, মন্দির, সমাধিসৌধ, নাট-মন্দির, ষ্টেডিয়াম, সেতু, পাকা সড়ক প্রভৃতির মধ্যে বিধৃত?

সুর, সংগীত, নৃত্য-বাদ্য, বাদ্যযন্ত্র, কাব্য ও সাহিত্যের মধ্যে কি সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিচরণ করছে ?

বিপরীত দিক থেকেও বিষয়টা বুঝতে চেষ্টা করেছি। সভ্যতা ও সংস্কৃতি কি নয় ? অর্থাৎ অসভ্যতা ও অসংস্কৃতি কি অথবা কি কি বিশেষ বস্তু ? এ প্রশ্নের সাথে আরো একটি প্রশ্ন মনে জেগেছে। অর্থশাস্ত্রের ভাষায় ইউটিলিটি অর্থাৎ ব্যবহারিক মূল্য বা আবশ্যকতা বলে একটি কথা আছে। অপরিহার্য আবশ্যকতা এবং পরিহার্য আবশ্যকতা পৃথক করা সম্ভব। অপরিহার্য আবশ্যকতা নৈসর্গিক বিধান। সাধারণতঃ জৈবধর্মের বাইরে মানবেতর প্রাণীর কোনো ধর্ম নেই। মানুষ প্রাণী হয়েও তার ব্যতিক্রম। সে ব্যবহারিক মূল্যহীন বহু অনাবশ্যক বস্তুকে অত্যাবশ্যক করে নিয়েছে। বহু অস্পর্শ্য ও অপ্রমাণিত উপলব্ধিকে সে সত্যরূপে গ্রহণ করেছে।

এটাই নান্দনিক বোধ। সংবেদনশীল মানবজীবনে জৈবধর্মের বাইরেও আনন্দ-নিরানন্দ বোধ আছে। তাই আনন্দ পাওয়ার আবশ্যকতাও আছে। শিল্পকলাকে আবশ্যক জ্ঞান করার পশ্চাতে এটাই রহস্য।

কিন্তু অনিবার্য আবশ্যকতা এবং পরিহার্য আবশ্যকতার মধ্যে পার্থক্য আছে। পার্থক্য আছে মানবমনের নানা বিচিত্র চিন্তা ও ধ্যান ধারণার মধ্যেও। প্রশ্ন করেছিলাম সংস্কৃতি ও সভ্যতা কি এবং কি নয়। তাতেই ফিরে আসছি। অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষেরও কতকগুলো জৈবধর্ম আছে। তার মধ্যে কতকগুলো নিয়নন্ত্রণযোগ্য, কতকগুলো আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণযোগ্য এবং কতগুলো সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণের বাইরে। শেষেরগুলোকে আগে চিহ্নিত করছি। যেমন, আহার নিদ্রা জাগরণ এবং মলমূত্র ত্যাগ প্রভৃতি অনিবার্য জৈবধর্ম। পশুরাও ওগুলোর অধীন। মানুষ ওগুলোর উপর অলঙ্কার ও পোশাক পরিয়ে নিয়েছে। সে স্থান কাল বেছে নেয়। বিবেক, রুচি, কল্পনা, ভাববিলাস প্রভৃতি

অব্যাখ্যাত বস্তু দ্বারা সে চালিত হয়। অনিবার্য জৈবধর্ম পালন-কালেও সে যে নির্বাচনি-চৈতন্যের পরিচয় দেয়, আমার বিবেচনায় এটাই আর্ট—এটাই সভ্যতা ও সংস্কৃতি। পুরুষ-পরম্পরায় বংশগতি রক্ষিত হচ্ছে। এটা প্রাণী জগতের নিয়তি। মানুষ জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছে: মৃত্যু অনিবার্য জেনেও জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করছে, বন্ধ করছে না। মানুষ স্বরচিত আইন-কানুন মেনে সামাজিক জীবনযাপন করে, ধর্ম-কর্ম এবং উৎপাদনের কলাকৌশল এবং প্রথাপদ্ধিতর আবিষ্কর্তাও মানুষ। স্বরচিত আইন-কানুন এবং উৎপাদনের প্রথা পদ্ধতি প্রয়োজন অনুযায়ী সে অবিরাম সংশোধন এবং পরিবর্তন করে চলছে। এভাবে সামাজিক জীবনযাপন করাটাকে আমি আর্ট বলি। বস্তুতঃপক্ষে এটাই মানবমস্তিষ্ক প্রসূত মহত্তম আর্ট।

পশুপক্ষীরাও এক ধরণের সামাজিক জীবন যাপন করে। মানুষের মতো ঝগড়া ফ্যাসাদ ওদের মধ্যেও আছে। ওদের সমাজে কোনো আইন-কানুন নেই: বিচার-আচারের ব্যবস্থাও অনুপস্থিত। আইন-শৃঙ্খলা প্রয়োগ করার জন্য আলাদা সংস্থা নেই। কিন্তু পরাজিত ও পলায়নপর স্বজাতীয় শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে হত্যা করে না। বিরল ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে সে স্বজাতীয় প্রাণীর মাংসভোজী নয়। মানবেতর সমাজের এদিকটাই সম্ভবতঃ আর্ট এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতা।

মানবজাতির সব চেয়ে বড় ব্যর্থতা এখানে। গ্রন্থের বিলুপ্ত পাতা দুটির রহস্য অনুদ্ঘাটিত থাকা সত্ত্বেও এটা সত্য যে, বিশ্বের প্রতিটি মানুষ প্রকৃতই মানুষ। বর্ণ আকার আকৃতি এবং ভাষাভেদ সত্ত্বেও মানুষের একমাত্র পরিচয় সে মানুষ। মওলানা আজাদ বলেছেন, সুদূর কোনো প্রাগৈতিহাসিক কালে মানবসমাজে শান্তি ছিল। শান্তির একটাই অর্থ: হানাহানি মারামারি কাটাকাটি নেই এমন সামাজিক জীবন। আদিকালে হয়তো তাই-ই ছিল। মানুষ তখন অনাবশ্যক বস্তুকে অত্যাবশ্যক জ্ঞানে যেকোনো উপায়ে সেটা

অর্জন করার প্রবৃত্তি এবং জ্ঞান অর্জন করেনি। এযুগের "সংস্কৃতিবান সুসভ্য" মানুষ সজ্ঞানে নরহত্যায় লিপ্ত। ঐতিহাসিক কালের প্রথম দিকে দ্বৈরথ যুদ্ধ হতো; পরবর্তীকালে হাতাহাতি যুদ্ধের আগে দু'পক্ষের সৈনিক পরস্পরের প্রতি গালিগালাজ বর্ষণ করে নিজেদের উত্তেজিত করে নিত। এযুগে শত্রুকে চেনাজানার প্রয়োজন নেই। এমন কি শত্রু হওয়াও আবশ্যক নয়। হাজার হাজার মাইল দূরে বসবাসকারী অজ্ঞাত অপরিচিত সাধারণ শান্তি-প্রিয় মানুষকে মহা আনন্দে পাইকারিভাবে হত্যা করা হয়। হিরোশিমা নাগাসাকির লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নিরস্ত্র মানুষ হত্যা করে মাকিন যুদ্ধবাজ চক্র বিজয়োল্লাস করে। আবার শান্তি শৃঙ্খলা এবং ধন রক্ষার নামে বিবস্ত্র বুভুক্ষু মানুষের জীবন অবলীলাক্রমে হরণ করে তার স্বদেশী সরকার।

আগেই বলেছি, প্রাণীমাত্রেই কতকগুলো অনিবার্য আবশ্যকতার দাস। ক্রমিকভাবে সাজালে, জন্মলাভের পর উদরপূরণ তার অনি-বার্য আবশ্যকতা। এটা মুলতবী রাখা অসম্ভব। আদিকালের ন্যায় এখনও মানুষ এই বিশেষ ক্ষেত্রে বিধির দাস। যৌবনে সে রতিক্রিয়ার দাস। এসব ক্ষেত্রে বর্ণ-আকৃতি নির্বিশেষে বিশ্বের সকল শ্রেণীর মানুষ একই সমতলে অবস্থান করছে। জৈব বিধি-বিধানের বাইরে মানবজাতির বাকী সবকিছু তার স্বসৃষ্ট আর্ট— অনিবার্যও নয় নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূতও নয়।

স্বদেশ বিদেশের নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনীর গোলাগুলীতে যারা নিহত হয় তারা বিবেকের দৃষ্টিতে কোনো অপরাধ করে না। ওরা অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের দাবী উত্থাপন করে মাত্র। ওরা সৌভাগ্য-বান প্রতিবেশীর সমান সুযোগ সুবিধা চায়। নরনারীর যৌন মিলনকে প্রথা-পদ্ধতির শৃংখলে আবদ্ধ করে স্বাভাবিক সমাজ জীবনের নিদর্শনরূপে গ্রহণ করামাত্র বঞ্চিতদের অন্নবস্ত্র বাসগৃহ শিক্ষা স্বাস্থ্য কর্ম প্রভৃতির দাবীও অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। অনিবার্য-আবশ্যকতাগুলোকে আইন কানুনের নিয়ন্ত্রনাধীন করার পর

নিয়ন্ত্রণযোগ্য আবশ্যকতাগুলোকে সমাজের কিছু অংশের জন্য নিয়ন্ত্রণহীন এবং বাকী বৃহত্তর অংশের জন্য কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীন করার পশ্চাতে কোনো যুক্তি নেই। এ ধরণের ব্যবস্থা মানব সমাজে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে। কিছু লোক অনাবশ্যক আবশ্যকতা পূরণের পরিপূর্ণ সুযোগ সুবিধা পায়। পক্ষান্তরে অধিকাংশ লোক অনিবার্য জৈব প্রয়োজন পূরণের সুযোগ সুবিধা হতেও বঞ্চিত থাকে। এটা মানবিক আইন নয়—হতে পারে না। অথচ বঞ্চিতেরা সকল মানুষের জন্য সমান সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির দাবী উত্থাপন করলেই সেটা অপরাধরূপে গণ্য হয়। বিশ্বের তিন-চতুর্থাংশেরও বেশী সম্পদ ভোগ করছে এক-চতুর্থাংশেরও কম মানুষ। এ বৈষম্য নিরসনের দাবী জোরদার হয়ে উঠলে 'গণতন্ত্র', 'ব্যক্তিস্বাধীনতা', 'ক্ষমতার ভারসাম্য', 'জাতীয় স্বার্থ' প্রভৃতি বিপন্ন হওয়ার ধুয়া ওঠে। এমন কি বিশ্বযুদ্ধও বাধে। বিশ্বের বিশাল বঞ্চিত অঞ্চলকে ভাগাভাগি করে ভোগতছরূপ করার ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের আভ্যন্তরীণ মতানৈক্য দু'দু'টি বিশ্বযুদ্ধের মূল কারণ। অভিপ্সিত লক্ষ্যার্জন সম্ভব হয় নি। দু'টি মহাযুদ্ধ বঞ্চিত মানবকুলকে অধিকতর শক্তিশালী করেছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শিবির নিরস্ত হয় নি। নয়া-উপনিবেশবাদী কৌশল এখনও বিশ্বের তিন-চতুর্থাংশ মানুষের জীবনকে বিড়ম্বিত করে রেখেছে। এই বঞ্চনা ও বিড়ম্বনার জন্য শুধু সাম্রাজ্যবাদ দায়ী নয়, রাজনৈতিক স্বাধীনতাপ্রাপ্ত পুরাতন কলোনিসমূহের শাসকশ্রেণীও সমান দায়ী, অধীক দায়ী বললেও অত্যুক্তি হয় না।

বিজ্ঞান মানুষের হাতে এমন সব অস্ত্র তুলে দিয়েছে যা দিয়ে সে গোটা প্রাণীজগতের অস্তিত্ব লোপ করে দিতে পারে। এ অস্ত্র প্রয়োগ অথবা প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন করেই এক-চতুর্থাংশের চেয়েও কম সংখ্যক ভোগ-বিলাসী মানুষ তিন-চতুর্থাংশেরও বেশী মানুষকে তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রেখেছে। মওলানা আজাদের মতে বিজ্ঞান দার্শনিক চিন্তার আবিষ্কার। দর্শনের আবিষ্কার আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক প্রথাপদ্ধতিও। কিছু

প্রথা-পদ্ধতি মানব সমাজকে ভোগী ও বঞ্চিত দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে ঃ পৃথিবীকে করে তুলেছে একটি স্থায়ী যুদ্ধক্ষেত্র। দার্শনিক চিন্তা মানবসমাজকে ও সকল অমানবিক প্রথা-পদ্ধতি হতেও মুক্তি দিতে সক্ষম। মানবাবিষ্কৃত প্রথা-পদ্ধতি জৈবধর্মের ন্যায় অনিবার্য অমোঘ বিধি নয়। শান্তি ও শৃঙ্খলার অন্তরায়রূপে প্রমাণিত প্রথা ও পদ্ধতি বর্জন করাইতো আর্ট—প্রকৃত সংস্কৃতি ও সভ্যতা। মানবকল্যাণ কোনো নতুন মতবাদ নয়। নতুন দর্শনও নয় ওটা। মহাত্মা বুদ্ধের চিন্তার মধ্যে মানবকল্যাণকামী দর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়। পরবর্তীকালেও অসংখ্য জ্ঞানী মানুষ মানবকল্যাণের চিন্তা করেছেন। ওঁদের অনেককে ইউটোপিয়ান—অর্থাৎ স্বপ্নবিলাসী বলা হয়। কেননা পুরাতন জরাজীর্ণ প্রথা-পদ্ধতির মধ্যে ওরা মানুষের সুস্থ বিচার-বিবেচনা শক্তির উপর নির্ভর করেছিলেন, নতুন প্রথা ও পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং প্রয়োগ করেন নি। প্রাগৈতিহাসিক সাম্যবাদী সমাজজীবনের পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত প্রথা-পদ্ধতির উৎসমূলে ক্রিয়া করেছে সর্বাগ্রে 'বলীর বেঁচে থাকার" অধিকার-দর্শন। ঐ দর্শনকে ভিত্তি করেই দাস-প্রথা, ভূমিদাস-প্রথা, বর্ণাশ্রম, সাম্রাজ্য, আঞ্চলিক রাষ্ট্র—এমনকি কোনো কোনো ধর্মেরও জন্ম। ক্রমে ক্রমে মানুষ তার উদ্ভাবিত প্রথা ও পদ্ধতির সেবাদাসে পরিণত হয়। খৃস্টপূর্ব পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী এমনকি তারও বহু আগে দার্শনিক চিন্তার জন্মলগ্নে মানুষ অত্যাশ্চর্য মৌলিক উদ্ভাবনি-শক্তির প্রমাণ দিয়েছে। পরবর্তীকালে সে তার আপন উদ্ভাবিত রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং প্রথা-পদ্ধতির জাঁতাকলে পড়ে সে শক্তি হারিয়ে ফেলে। প্রায় সমস্ত আবিষ্কার নরহত্যার যন্ত্রে অথবা তার সহায়কে পরিণত হয়। প্রচলিত প্রথা ও পদ্ধতি কর্তৃক অনুমোদিত ও উৎসাহিত "সর্বাগ্রে বলীর বাঁচার অধিকার"—দর্শনের সচেতন-অবচেতন দাস হয়ে পড়লো মানুষ।

পূর্বসূরী অনেকের মতো কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডরিক এঙ্গেলসও মানবকল্যাণকামী দার্শনিক। কিন্তু একটি ব্যাপারে পার্থক্য মৌলিক। প্রায় আড়াই হাজার বছর পরে ওঁরাই প্রথম প্রচলিত

প্রথা ও পদ্ধতির দাসত্ব থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ মুক্ত করতে সক্ষম হন। প্লাতো, আরিস্ততলের পরে সমাজ বিন্যাসোপযোগী নতুন প্রথা ও পদ্ধতির প্রথম উদ্ভাবক ওঁরা। ওঁদের যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক চিন্তা প্রকাশিত হওয়ার সংগে সংগে বিশ্বের বঞ্চিত আশাহত মানুষের মনে বলিষ্ঠ আশার সঞ্চার হয়। ওঁরা দান-দাক্ষিণ্যের আবেদন বর্জন করেন। কেননা ব্যক্তির দানদাক্ষিণ্য সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। দান-দাক্ষিণ্যের বিপরীতে দারিদ্র্য ও নিপীড়ন সততঃ অবস্থান করেছে। মার্কস এ্যাঙ্গলসের দৃষ্টিতে মানব-কল্যাণ স্বপ্নবিলাস নয়, একটি সামগ্রিক পদ্ধতি। ওঁরা ঐ পদ্ধতির খসড়া নীল-নকসা উপস্থিত করেছিলেন। জীবৎকালে ওঁরা ওঁদের উদ্ভাবিত পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগ দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু মার্কসের মৃত্যুর ৩৪ বছর এবং এ্যাঙ্গেলসের মৃত্যুর মাত্র ৭ বছর পরে মানবকল্যাণের ঐ নবাবিষ্কৃত পদ্ধতি তার উপযোগী প্রশাসনিক কাঠামোসহ সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রবর্তিত হয়। সমাজতন্ত্র আর মানবকল্যাণকামীর স্বপ্নবিলাস রইল না, বাস্তব সমাজজীবনে পরিণত হলো। আমাদের বাল্যকালে সংঘঠিত এ বিপ্লবের আবেদন ছিল কতকটা রোমাণ্টিক। সাম্রাজ্য-বাদী প্রচারণা ছিল ঐ বিপ্লবের বিরুদ্ধে। পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক পদ্ধতিপ্রসূত জাতীয়তাবাদের পাশাপাশি স্থাপন করে সমগ্র বিশ্বের মানবসমাজের কল্যাণোপযোগী সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ হয় নি। বৃদ্ধ বয়সে সে সুযোগ এলো। কতটা সদ্ব্যবহার করতে পেরেছি জানি না। পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলো তারই প্রয়াস এবং আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি। প্রত্যাদিষ্ট ধর্মসহ কোনো বিমূর্ত সামাজিক তত্ত্ব সমাজজীবনে অবিকল প্রয়োগ করা যায় না। মস্তিষ্কের বিচরণক্ষেত্র প্রায় অসীম। তার গতিও ভয়াবহ। সমাজ সীমিত স্থানকালের মধ্যে বিচরণ করে। তাঁর গতি অপেক্ষাকৃত শ্লথ। তাই বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যেই বিপ্লব সাফল্যলাভ করে। এ সত্য স্মরণ রেখেই আমি সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজ-জীবনকে বুঝতে চেষ্টা করেছি।

ঢাকা, ৬.৯.৮১ — আবু জাফর শামসুদ্দীন

এক

সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি বিশাল ভূখণ্ড। পনরটি স্বায়ত্বশাসিত এবং স্বেচ্ছায় সংযুক্ত অঙ্গরাজ্যের সমন্বয়ে গঠিত এ বিশাল যুক্তরাষ্ট্রের নাম ইউনিয়ন অব্ সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক্‌স। পৃথিবীর স্থলভাগের এক-ষষ্ঠাংশ এ-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। সোভিয়েত ইউনিয়ন শুধু বহুজাতি রাষ্ট্র নয়, বহু নৃগোষ্ঠীর লোকও এ রাষ্ট্রের অধিবাসী। ভৌগোলিক বৈচিত্র্যেও সে তুলনাহীন। পৃথিবীর ছাদ মধ্য-এশিয়ার মালভূমি, সুদীর্ঘ গিরিশ্রেণী, মরুভূমি, সবুজ উপত্যকা ও সমতলভূমি, বৃহৎ হ্রদ, বিশাল বনভূমি, বরফাচ্ছাদিত মেরু প্রভৃতি সব কিছুর সমাবেশ রয়েছে এ রাষ্ট্রে। প্রায় সব রকমের পশু-পাখী সে দেশে দেখতে পাওয়া যায়। মানুষের ভোজ্য সব খাদ্য সে দেশে উৎপন্ন হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষ বহু ভাষায় কথা বলে। লেনিন প্রতিটি অঙ্গ রাজ্যকে ইউনিয়নভুক্ত হওয়ার অথবা তার বাইরে স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখার অধিকার দিয়েছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে এখনও ঐ অধিকার আছে। এই বিশাল রাষ্ট্রের খুব কম অধিবাসী তার সমস্ত অঞ্চল স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পায়; প্রয়োজনও হয় না। ভ্লাদিভোস্তক থেকে লেনিনগ্রাদের দূরত্ব বোধ করি ছ' হাজার মাইল। দূরত্বই একমাত্র বাধা নয়। এ দেশে বহু দুর্গম এবং জীবন-যাত্রার জন্য অত্যন্ত প্রতিকূল স্থান আছে। ইচ্ছে থাকলেও নিজ উদ্যোগ ও ব্যয়ে সকল স্থানে কারো পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

একজন বিদেশী তার স্বল্পকালীন সফরে বিশাল এ দেশের কতটুকুই বা দেখতে পারে। রাশিয়ায় মোট এক মাস ছিলাম।

তার মধ্যে প্রথম ন' দিন কেটেছে হোটেল এবং ক্লিনিকে মেডিক্যাল চেক আপে। বাকি একুশ দিন দেখার ও জানার সুযোগ পেয়েছি। তার মধ্যেও অনিবার্য বিশ্রাম ও বিরতি গেছে। এ অল্প সময়ের মধ্যে মস্কো এবং লেনিনগ্রাদের বাইরে সোভিয়েত ইউনিয়নের মাত্র দু'টি অঙ্গরাজ্য কিছুটা ঘুরে ফিরে দেখতে পেরেছি। একটি উজবেকিস্তান, অপরটি আজারবাইজান। মস্কো থেকে উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে বিমানযোগে পৌঁছতেই সময় লাগে সাড়ে তিন ঘণ্টা। সমরকন্দ থেকে কাস্পিয়ান সাগরের তীরে অবস্থিত আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে যেতেও প্রায় একই সময় লাগে। বোম্বাই থেকে ঢাকা পৌঁছতে এ্যারোফ্লোতের ঐ বিমানেই সময় লাগে মাত্র দু'ঘণ্টা দশ থেকে বিশ মিনিট। এ থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নের স্থলভূমির বিশালতা অনুমেয়। তাই সময় সংক্ষেপের জন্য পরস্পর দূরবর্তী উল্লেখযোগ্য স্থানে যাতায়াত করার জন্য একমাত্র বাহন বিমান। আমাকেও বিমানেই ঘুরতে হয়েছে। বিমান মানুষের কর্মকাল বৃদ্ধি করেছে : প্রসারিত করেছে তার দিগন্ত। কিন্তু শেখ সাদী, ইবনে বতুতা, আলবিরুনি, ইবনে খলদুন, মার্কোপলো, বার্নিয়ার প্রমুখের মতো যারা নৈসর্গিক জগতের বিচিত্র লীলা দর্শন এবং অজানা অচেনা দেশের মানব সমাজকে তার সমগ্রতায় বুঝতে চায় জানতে চায় তাদের জন্য বিমান অনুকূল যান নয়। মানব সমাজ শুধু বিশিষ্ট ও প্রসিদ্ধ স্থানে বসবাস করে না। এখনও পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লীতে বাস করে। শিল্পোন্নত দেশে নগরবাসী লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী, এই যা তফাৎ। মানবজীবনকে তার সমগ্রতায় উপলব্ধি করার জন্য দ্রুতগামী যানবাহনে বিশাল পরিসরে সংক্ষিপ্ত সফরের চেয়ে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন যানবাহন এবং ঈশ্বরদত্ত পদযুগলের সহায়তায় দীর্ঘমেয়াদী কম পরিসরের সফর অধিক উপযোগী। ভ্রমণ কাহিনীও কখনো কখনো অনুপম সাহিত্য হয়ে ওঠে। সাহিত্য সৃজনের জন্য চাই তাড়াহুড়োহীন অবসরে কৃত পর্যবেক্ষণ। আমার অভিজ্ঞতা তাই অপূর্ণতার শর্তসাপেক্ষ।

তবে যতটুকু দেখেছি, বা সেখানে যা দেখেছি, চোখ খুলে তার ভালোমন্দ গুণাগুণ মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছি। কৈশোরে-যৌবনে দেখলে তার মধ্যে হয়তো ভাবাবেগের আবেগ অধিক পরিমাণে থাকতো। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতো অসাধারণ ব্যক্তিরাই শুধু সত্তুরোর্ধ বয়সে প্রেমে পড়েন। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় আজন্ম প্রেমিকের পরিণত বয়সের কাব্যেও বলাকা যুগের "বেগের আবেগ' অনুপস্থিত। আমি সাধারণ অখ্যাত মানুষ। বয়স সত্তুরের বেশী। কাহিনীকে অলঙ্কারে সজ্জিত এবং উপলব্ধিকে ভাবাবেগের ফাগে রঞ্জিত করে উপস্থিত করার ক্ষমতা কখনো অল্পবিস্তার থাকলেও এখন আমার কুম্ভ রংগীন জলশূন্য।

মানব কল্যাণের তত্ত্বের মধ্যে এখন আমি রোমাণ্টিক ভাববিলা-সের সক্রংমণ দেখি না। মানবজাতির ভবিষ্যৎ অস্তিত্বের জন্য বিশ্ব-শান্তি অপরিহার্য মনে করি। ধর্ম, বর্ণ, আকার, আকৃতি প্রভৃতির পার্থক্য নির্বিশেষে অথবা তা' সত্ত্বেও নিঃশর্ত মানব-কল্যাণের জন্য বিশ্বব্যাপী অভিন্ন কর্মসূচী প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। পারমাণবিক বোমাসহ সকল শ্রেণীর মারণাস্ত্রের আতঙ্কমুক্ত বিশ্বশান্তি ঐ কর্মসূচী প্রয়োগের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। এটা মৌলিক ব্যাপার, মৌলিক সত্য। এই বিশেষ ক্ষেত্রে দেশভেদে জাতীয় প্রতিভা ভিন্নধর্মী হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সার্বিক মানবকল্যাণ এবং বিশ্বশান্তি যার কাছে মানব জাতির একমাত্র লক্ষ্যাদর্শরূপে বিবেচিত তার দৃষ্টিতে ঐ লক্ষ্য সাধনের একটি ভিন্ন দুটি পথ নেই। অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং জাতীয় অহংবোধ উনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীরও প্রথম চার দশক পর্যন্ত অসংখ্য জ্ঞানীগুনী ব্যক্তিকে প্রভাবিত এবং বিভ্রান্ত করেছে। স্তাদালের ন্যায় শক্তিমান ফরাসী লেখকও নেপোলিয়ন-প্রেমে অন্ধ ছিলেন। পারমাণবিক বোমা আবিষ্কার এবং হিরোশিমা ও নাগাসাকির উপর তার ভয়াবহ প্রয়োগের পর সে যুগের অবসান হয়েছে। আইনস্টাইন আবিষ্কৃত আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রমাণ করেছে, পৃথিবীতে অনন্য নির্ভরতা বলে কোনো বস্তু নেই। কোনো সত্যই

এককভাবে পরম ও চরম সত্য নয়। তাই এ' যুগে মানব-জাতির সার্বিক কল্যাণের বাস্তব এবং ব্যাপক কর্মসূচীর মধ্যেই ব্যৈক্তিক এবং জাতীয় বিকাশের পথ ও পদ্ধতি খুঁজতে হবে। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেই লক্ষ্য সাধনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আজকের দিনে ইলিয়ডের বীরত্ব অথবা নেপোলিয়ন, গ্যারিবল্ডি, ম্যাৎসিনি, হিটলার, মুসোলিনি প্রমুখেরও স্বদেশপ্রেম কোনো সুস্থ-মস্তিষ্ক মানুষের কাম্য হতে পারে না।

মানুষের সর্বাধুনিক চিন্তার সংগে অতীত চিন্তার যোগসূত্র খুঁজে বের করা সম্ভব। তাই মৌলিক বলবো না, বলবো আমি আমার ঐ বিশেষ উপলব্ধির আলোকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সামাজিক জীবন বুঝতে চেষ্টা করেছি। এ-চেষ্টা আমাকে একটি সত্য নির্ণয়ে সহায়তা করেছে। আমি বুঝতে পেরেছি যে সুপ্রাচীন, এমন কি বহু প্রশংসিত যে-কোনো প্রথা-রীতির দাসত্ব হতে মুক্ত হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব। প্রয়োজন শুধু প্রবর্তনা এবং সুদৃঢ় ইচ্ছা। মানব-মস্তিষ্কপ্রসূত সত্য এবং মিথ্যা যুগে যুগে স্থান পরিবর্তন করেছে। আচম্বিতে ঘটলে অনভ্যস্তের জন্য সেটা অস্বস্তিকর হয়, কিন্তু সেজন্য পরিবর্তন বসে থাকে না। পুরুষ-পুরুষানুক্রমিক অভ্যাস-বশে মানুষ সামাজিক প্রথা ও পদ্ধতিকে জীবন-প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চায় না। জুজুর অস্তিত্ব নেই, কিন্তু নিয়ন্ত্রিত প্রতি-বর্তীক্রিয়ার ফলে বালক বালিকাদের মস্তিষ্কে জুজু ভয়াবহ সত্য। প্রাপ্তবয়স্কদের মস্তিষ্কে প্রথা-পদ্ধতিও এক ধরণের জুজু—পুরুষানু-ক্রমে লব্ধ নিয়ন্ত্রিত প্রতিবর্তীক্রিয়ার ফল। বালক-বালিকারা বয়ঃবৃদ্ধির সংগে সংগে ক্রমে ক্রমে জুজুর ভয়মুক্ত হয়। বাস্তব জীবন তাকে প্রকৃত সত্যের মুখোমুখী করে। পরিবর্তিত অবস্থার চাপে দীর্ঘকালব্যাপী প্রচলিত এবং পবিত্রজ্ঞানে পালিত প্রথা-পদ্ধতি তার ঐতিহাসিক প্রয়োজন হারায়। বৃক্ষ তার জীর্ণ বল্কল এবং শুষ্ক পত্র পরিত্যাগ করে। সর্পের জন্য তার নির্মোক বর্জন অপরিহার্য হয়ে ওঠে। শীত গ্রীষ্মের প্রয়োজনে

মানুষ পোষাক পরিবর্তন করে। জীবনকে সততঃ প্রবহমান রাখার জন্য জন্ম-মৃত্যু দুইই আবশ্যক। মৃত্যুহীন জন্মের ভার বহন করা ক্ষুদ্র পৃথিবীর পক্ষে সম্ভব হতো না। মানবজীবনকে অর্থবহ এবং সুন্দর হতে সুন্দরতর করার জন্য প্রাচীন প্রথা ও পদ্ধতি বর্জন এবং নতুন প্রথা ও পদ্ধতি গ্রহণও তেমনি আবশ্যক ও অনিবার্য। নদনদীর পথ পরিবর্তন দেখে আমরা বিস্মিত হই না। প্রয়োজন তাকে ধারা পরিবর্তনে বাধ্য করে। নিসর্গের বিধিবিধানের সংগে জীবনের বিধিবিধানের সামঞ্জস্য আদৌ নেই এমন কথা বলা যায় না। গুরুতর নৈসর্গিক পরিবর্তন বহু বহু রকমের জীবন লোপ করেছে, আবার বহু রকমের জীবনের উদ্ভব ঘটিয়েছে। উদ্ভাবন-কালের সামাজিক প্রথা-পদ্ধতিই শিল্প, সংস্কৃতি এবং সভ্যতা। যখন সেটা সর্বগ্রাসী হয়ে মানব-মস্তিষ্কের উদ্ভাবন-শক্তি হরণ করে, তখন সেটা দাসত্ব।

সোভিয়েত ইউনিয়নে আমি এ-সত্যটি উপলব্ধি করলাম। সে-দেশের মানুষ একটি নতুন প্রথা ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। ব্যাপকতা এবং সমগ্রতায় এ নতুন জীবনবোধ সম্পূর্ণ হতে চলেছে। প্রাচীন নির্মোক ওরা বর্জন করেছে। নতুন ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে মানব-জীবন। গ্রহণীয় এবং বর্জনীয় বলেই উদ্ভাবিত সামাজিক প্রথা-পদ্ধতি মাত্রেই জন্মগত মানবিক গুণাবলী হতে পৃথক বস্তু। প্রথা পদ্ধতি রদ-বদলের অর্থ তাই জন্মলব্ধ মানবিক গুণাবলীর রদবদল নয়। এই বিশেষ ক্ষেত্রে সোভিয়েত দেশের মানুষ এবং আমরা একই সমতলে অবস্থান করছি। আমূল-পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক প্রশাসনিক পদ্ধতির মধ্যে জীবনযাপনকারী রুশী মানুষের হৃদয় এবং আমার দেশের মানুষের হৃদয় অভিন্ন। কতকগুলো বিশেষ ক্ষেত্রে হৃদয়-ধর্ম অভিন্ন। মানুষের সংবেদনশীলতা এবং অন্তরের মানবিক আবেদনের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ কঠিন কাজ। রুশী সমাজ বদলেছে। জাতীয় বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু বহিরাবরণের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি বিশেষ জায়গায়—এবং সেটিই মানব জাতির মৌলিক

বৈশিষ্ট্য ক্ষেত্র—মানুষের অন্তর এক অবিচ্ছেদ্য ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ। সে ক্ষেত্রটি সেতুবন্ধ, অগণিত দ্বীপের সমষ্টি নয়। সেটি এক অবিচ্ছিন্ন আর্দ্র সবুজ সমতল। তার দিগন্ত নেই, আকাশের ন্যায় অন্তহীন তার প্রসারতা। যথাস্থানে দৃষ্টান্ত দিয়ে সেই বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছি।

দুই

প্রাচীনে নতুনে মিলিয়ে আশি লক্ষ লোকের বিশাল শহর রাজধানী মস্কো। আছে বিশ-পঁচিশ তলা অত্যাধুনিক নকশার বড় বড় অট্টালিকা। আছে ক্রেমলিন এবং তৎসংলগ্ন পুরনো শহরের অপ্রশস্ত সড়ক, পার্শ্বগলি, সেকেলে ভবন এবং সোনালী সবুজ-শোভিত সুদৃশ্য গির্জা। আছে সুপ্রশস্ত বুলেভার, নীচে মেট্রো এবং উপরে ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি প্রভৃতি যানবাহন।

শহর দেখছিলাম। বেলা প্রায় দুপুর। বেশ রোদ। মস্কো নদীর সান-বাঁধানো তীরে সহসা চোখে পড়লো দু'জন বড়শিয়াল। দুপুর রোদে ওঁরা বড়শি ফেলেছেন। একজন পাথর-বাঁধানো পাড়ে পদ্মাসনে বসে ছিপ ধরে আছেন, অপরজন দাঁড়িয়ে। আমাদের দেশের বড়শিয়ালদের কথা মনে পড়লো। ছোটবেলায় নদীতীরে বসে, দাঁড়িয়ে আমরাও ঐ ভাবেই বড়শিতে মাছ ধরেছি। বিশাল এ শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত এ নদীর পানি পরিচ্ছন্ন নয়। কলকারখানা থেকে নিঃসরিত নানা রাসায়নিক বর্জ্য এবং তৈল বহন করে নিয়ে চলেছে তার স্রোত। দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওঁরা মাছ পাবেন কি? পেলে কি মাছ পাবেন? মাছেরাও জীবনের নিরাপত্তা খোঁজে। এখানেতো মাছ থাকার কথা নয়। দোভাষী তার হাতের আঙ্গুল দেখিয়ে হেসে বললেন, সারাদিনে এ-রকম বড় দু'চারটে পেতেও পারেন। বড়শিতে মাছ ধরার বেশ বড় সমাবেশ দেখেছিলাম বিমানবন্দর থেকে শহরে আসা-যাওয়ার পথেও। সেখানে নদীর পানি পরিচ্ছন্ন, পাড় বাঁধানো নয়—পাড় ভাঙ্গাচোরা, কাদাও আছে, শক্ত মাটি ও আছে। খুব একটা গভীর মনে হলো না। পুলের দু'দিকে

দেখলাম অসংখ্য লোক নদীতে বড়শি ফেলেছে। মাছ ধরার উৎসাহ-উদ্দীপনা আমাদের দেশেরই মতো। কি মাছ ধরা পড়ে জানি না। হোটেলে ভোজনকারীদের কাছে ছোট্ট ভাঙ্গনা (বাটা) মাছের মতো এক জাতীয় মাছের ভাজা খুব প্রিয় মনে হলো। আমার জিহবায়ও বেশ সুস্বাদু লেগেছিল। নদীতে ঐ ছোট মাছ ধরা পড়ে কি না জানি না।

প্রাচীনে নতুনে মিলিয়ে বিশাল হলেও মস্কো অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন শহর। ধূমপায়ীদের জন্য ফুটপাতের স্থানে স্থানে পাকা চোঙ্গা আছে। ঐ চোঙ্গাতে পোড়া সিগারেটের অবশেষ, দেশলাইর কাঠি, কাগজের টুকরো প্রভৃতি আবর্জনা ফেলেন ওঁরা। মানুষও শৃঙ্খলা মেনে চলে। জেব্রা ক্রসিং অথবা সুড়ঙ্গ পথ ব্যতীত অন্য কোনো স্থান দিয়ে সড়ক পারাপার হওয়ার চেষ্টা কেউ ভুলেও করে না। একদিনও বড় রকমের ট্রাফিক জ্যাম চোখে পড়েনি। যে কোনো প্রয়োজনে ওঁরা নিমিষের মধ্যে কিউতে দাঁড়ান।

বিকেল পাঁচটা। তখনও কিছু কিছু রৌদ্রালোক আছে। সেদিনও শহর দেখতে বেরিয়েছি। সহসা দু'জন লোক দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সমবয়সী এবং চল্লিশোর্ধ নয়। পোশাক-পরিচ্ছদে মনে হলো শ্রমিক এবং সম্ভবতঃ একটু আগে কর্মস্থল ত্যাগ করেছে। সন্ধ্যার পাখীর মতো নীড়ে ফেরার যেন কোনো তাগিদ নেই। একটি সাবেকী দালানের দেয়ালে ঠেস দিয়ে হাঁটু তুলে বসে আছে দুই বন্ধু; এবং দিব্যি আরামে সিগারেট টানছে। ওখানে পোড়া সিগারেট ফেলার চোঙ্গা নেই। আমি যেন আমার দেশের খেত-খামারের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি মনে হলো। খেতমজুরেরা পার্শ্ববর্তী গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে, গাছ না থাকলে আইলে বসে জিরোয় এবং তামাক টানে। ঐ ভাবে হাঁটু চিবুকে ঠেকিয়ে ওরাও বসে। মনে পড়লো জন স্টেন বেকের টরটিলা ফ্লাট নামক বিখ্যাত উপন্যাসের তিন বন্ধুর কথাও। মদ ছাড়া অন্য প্রায় সবকিছুর প্রতি নিরাসক্ত ঐ তিন বন্ধুর ঘরে যখন আগুন জ্বলছিল তখনও তারা মদের নেশায় গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল।

দু'জন সোভিয়েত নাগরিকও ঐ রকম চালচুলোহীন বেপরোয়া ? হয়তো নয়, কেননা সোভিয়েত ইউনিয়নে কোথাও টরটিলা ফ্ল্যাটের নিঃসহায় নিরাবলম্বন মানুষ নেই। কিন্তু মানব মন বোঝা কঠিন। মনের দিক থেকে জন্ম যাযাবর মানুষ পৃথিবীতে বিরল নয়। লেখক-শিল্পী মাত্রেই মনের দিক থেকে যাযাবর। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার রাজধানী জনবহুল মস্কোর দ্রুত প্রবহমান জীবনস্রোতের মধ্যে অকস্মাৎ চোখে পড়া ঐ দৃশ্য আমার চিত্তকে দোলা দিল। মনে হলো দালানের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে ওভাবে বিশ্রাম করা এবং নির্বিকার ঔদাস্যে সিগারেট টানার মধ্যে এমন এক ধরনের অনাবিল সুখ আছে যা পারিবারিক জীবনের কোলাহলে পাওয়া যায় না।

পরে লেনিনগ্রাদের পথে বিমানে, লেনিনগ্রাদে এবং মধ্য এশিয়ায়ও অনুরূপ না হলেও একই ধরনের দৃশ্য দেখেছি। মানবিক স্বভাবের অন্তর্লীন একাত্মতা লক্ষ্য করে চমৎকৃত হয়েছি। প্রাসংগিক বিধায় এখানেই তার উল্লেখ করছি।

মস্কো থেকে লেনিনগ্রাদ যাচ্ছি। বিমানে এক ঘন্টার পথ। আমাদের ডানের দু' সীটে এক দম্পতি বসলেন, বয়সে তরুণ-তরুণী। শহুরে সফিসটিকেশন নেই। স্বামীর হাতে আমাদের বাজারের ঝোলার মতো একটি পলিথিলিনের ঝোলা। তার মধ্যে শিশুর ফিডিং বোতল, দুধের টিন, ফ্লাস্ক, কাপড়-চোপড় এবং নানা টুকিটাকি জিনিস। স্ত্রীর কোলে সাত আট মাসের সুশ্রী স্বাস্থ্যবান শিশু। তার মুখে রবারের চুষনি। বিমান উড়ছে, সন্ধ্যা অতিক্রান্ত। নীচে কিছু দূর পর পর আলো ঝলমল দৃশ্য। সম্ভবতঃ বিদ্যুতালোকিত পল্লী অথবা ছোটখাটো শহর কিংবা কল-কারখানা। বোধ করি আধাআধি পথ অতিক্রম করেছি। শিশু চঞ্চল হয়ে উঠলো। কৃত্রিম চুষনিতে সে সন্তুষ্ট নয়। ওটা সে বারবার মুখ থেকে ফেলে দেয়। প্রথমে নড়াচড়া এবং পরে সে রীতিমতো কান্না জুড়ে দিল। আমাদের দেশের মায়েদের মতো ঐ মা'ও তার শিশুকে আসনের সংকীর্ণ পরিসরে দোলা দিতে

লাগলেন। কিন্তু তিনি যত "না না" বলে শিশুকে আদর সোহাগ করেন, শিশু ততো মা'য়ের বুকে প্রকৃত সান্ত্বনা ও সাশ্রয় খোঁজে। অবশেষে বিমানের আসনেই মা যতটা সম্ভব ঘুরে বসলেন। আর তাকাই নি। শিশুর কান্না বন্ধ হলো। বুঝলাম, মা তাঁর বুক খুলে দিয়েছেন। আমাদের দেশের মায়েদের কথা মনে পড়লো। ট্রেন-স্টীমারযাত্রী মা'য়েরাও ঐভাবে নিজেদের আড়াল করেই বিদ্রোহী শিশু সন্তানকে সন্তুষ্ট করেন। মা পৃথিবীর সর্বত্রই সর্বাবস্থায় মা।

লেনিনগ্রাদের রৌদ্রকরোজ্জ্বল সুন্দর সকাল। হোটেলের দোতলায়, কক্ষের বিশাল কাচের জানালার পর্দা সরিয়ে নীচের দিকে চেয়ে আছি। বেলা বোধ করি ন'টা। নীচে কলকারখানা এবং অফিস যাত্রীদের জনস্রোত। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে হন্যে হয়ে ছুটছে। লক্ষ্য কর্মস্থল। পোশাক পরিচ্ছদে সবাই, আমাদের ভাষায়, সাহেব মেম। সড়কের বিপরীত সারির একটি পাঁচতলা দালানের ছাদের কার্ণিসে দাঁড়িয়ে একজন লোক বিদ্যুতের তার টানাটানি করছিল— রাতে ছাদটাকে আলোকিত করার প্রয়োজন ছিল হয়তো। ছিপলে ছাপলা তরুণ ঐ লোকটির মধ্যে একজন দক্ষ শ্রমিকের সমস্ত গুণাগুণ লক্ষ্য করছিলাম। কিন্তু পাঁচতলা দালানের কার্ণিসে তাঁর ঐভাবে বিচরণ আমাকে শঙ্কিত করছিল। সহসা ঐ ফুটপাতেই এক অপ্রত্যাশিত দৃশ্য চোখে পড়লো। সাহেব মেমদের ঐ ভিড়ের মধ্যে এক সাহেব পিতা তাঁর চার-পাঁচ বছর বয়সের বালক পুত্রকে কাঁধে বসিয়ে হাঁটছেন। পুত্রের দু' ঠ্যাং পিতার দু' কাঁধ ছাড়িয়ে কোমর অবধি ঝুলে পড়েছে। পিতার মাথার উপরে পুত্রের দু' হাত। ভদ্রলোকের স্ত্রী ছ'সাত বছরের কন্যার হাত ধরে পাশাপাশি চলছেন। ভিড়ের চাপে কখনও পিছিয়ে পড়ছেন। স্বামী স্ত্রী কারো মুখে দ্বিধা সংকোচের চিহ্নমাত্র নেই। ওঁরা স্বাভাবিকভাবে পথ চলছিলেন। মস্কো প্রাচীন শহর। সেখানে বহু নৃগোষ্ঠীভুক্ত মানুষের সংমিশ্রন ঘটেছে। লেনিনগ্রাদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং খাঁটি ইয়োরোপীয়

শহর। এ শহরে এমন একটি দৃশ্য দেখার চিন্তাও কখনো মনে স্থান দিই নি। আমার হৃদয় আলোড়িত হলো। মনে পড়লো ষাট পয়ষট্টি বছর আগের পল্লীবাংলার বাল্যজীবনের স্মৃতি। বাবা, কাকা (ফুফাও) এবং মামাদের পরিবারে আমি পিতার উনপঞ্চাশ বৎসর বয়সের প্রথম সন্তান। আদরের সীমা নেই। মেজাজ খারাপ হলে আমি নাকি খুব জোরে চিৎকার করতাম। সে চিৎকার দূর-দিগন্তকে বুঝিবা সংক্রমিত করতো। একদিনের ঘটনা এখনও মনে আছে। বাবা মাঠের জমিতে কাজে নিযুক্ত লোকদের কাজ তদারক করছিলেন। বাড়ীর পশ্চিমের সারিবদ্ধ আম্রকুঞ্জের বাধা অতিক্রম করে আমার চিৎকার ধ্বনি বোধকরি তাঁর কানে প্রবেশ করেছিল। তিনি কাজ ফেলে ছুটে এসেছিলেন আমাকে সামলাতে। সাত মাইল দূরে মামা, ফুফু এবং জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর অনেকের বাড়ী। সেকালে দশ পনর দিন পরপর আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে যাতায়াত সামাজিক প্রথা ছিল। বাবা কাকা, মামারা আমাকে সংগে নিতেন। কিছু পথ হাঁটতেই আমার বায়না শুরু হতো। রাজা বাদশাদের ঐতিহাসিক কাহিনী, দারা-সিকান্দরনামার গল্প, দেও-দেওনী জিনপরীর ভয় প্রভৃতি কিছুই আমাকে থামাতে পারতো না। তখন ওরা আমাকে কাঁধে নিতেন। আমি আমার দু'পা মুরুব্বীদের বুকের উপর ঝুলিয়ে দিতাম। মুরুব্বীদের মায়া-মমতা কিছুটা বেশী করেই আদায় করেছি। তাই বলে ওঁদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ হারাই নি। লেলিনগ্রাদের ঐ ছেলেটিও তার পিতার বুকের উপর দু' ঠ্যাং ঝুলিয়ে দিয়ে দিব্যি আরামে পথ অতিক্রম করছিল। পিতা ঐ বোঝাকে বোঝা মনে করে নিঃ কোনো দেশের কোনো পিতাই করে না। পিতামাতার কাছে শিশু পুত্র-কন্যার বোঝা জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ—সব-চেয়ে বড় পাওনা। শিশু হেসেখেলে কোলে-কাঁখে চড়ে পিতামাতার দেনা শোধ করে দেয়। তার পরেও যারা পুত্রকন্যার কাছে তাদের পাওনা দাবী করে তারা অতি লোভী। পরিণত বয়স্ক পুত্র-কন্যা

অন্য ব্যক্তি। আমূল পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পদ্ধতির মধ্যে জীবন যাপন করছে রুশী মানুষ। সে দেশের পিতামাতাকে পুত্র-কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবতে হয় না। তাদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় বিধানে নিশ্চিত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পরিণত বয়সে যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মের সংস্থান করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। রুশী সমাজে অবাঞ্ছিত শিশু নেই। শিশু মাত্রেই সেখানে বাঞ্ছিত এবং তার সব দায়িত্ব সরকারের। এই আমূল পরিবর্তিত সামাজিক জীবনেও রুশী মানুষ এবং আমার দেশী মানুষের হৃদয় একটি বিশেষ ক্ষেত্রে অভিন্ন। সেটি হচ্ছে মায়া-মমতা স্নেহ ও প্রেমের ক্ষেত্র। এই বিশেষ ক্ষেত্র থেকেই মানবকল্যাণের বৃহত্তর বোধ ও বোধির উদ্ভব ও বিস্তার। সংবেদনশীলতা ও মানবিক অবদানের মৌল চেতনা সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। দাস-প্রথা এবং সামন্ত-তান্ত্রিক যুগে ঐ চেতনা ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবনের বাইরে বিকশিত হতে পারে নি। ক্রীতদাস মানুষরূপে গণ্য ছিল না। ভূমিদাস ছিল ভূমির সংগে বিক্রয়যোগ্য পণ্য। ধনবাদী যুগে ব্যক্তি স্বাধীনতার বিস্তার ঘটে। সাথে সাথে মানুষের মৌল মানবিক চেতনাও বৃহত্তর সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ধনবাদী সমাজের মৌল মানবিক চেতনা শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সংকীর্ণতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ঃ সে চেতনার নাম ফিলানথ্রফি। রবার্ট আওয়েনের মতো রোমান্টিক মানব-কল্যাণ-কামীগণ এ যুগের লোক। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে স্বপ্নবিলাস প্রশংসিত কিন্ত কার্যকর নয়। শ্রেণী-কল্যাণ চিন্তা মানব-কল্যাণ চিন্তার পুরোপুরি বিকাশের পথে বড় বাধা। শ্রেণীহীন সমাজ যুগপৎ মানব-কল্যাণ সাধনের পথ এবং গন্তব্যস্থল।

ছোটখাটো আরো অনেক দৃশ্য চোখে পড়েছে। উজবেকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে শত শত মাইল ঘুরেছি। মস্কো থেকে তলস্তয়ের বাসস্থান ইয়াজনিয়া পলিয়ানায় গিয়েছি। প্রখর রোদে কার্পাস খেতে শ্বেতশুভ্র তুলো ফুল চয়ন করতে দেখেছি অগণিত নর-নারীকে। আবার রাস্তার ধারের তৃণভূমিতে দড়ি ধরে দুধেল গাভী চরাতেও দেখেছি

গৃহস্থকে। দেখেছি, গোধূলি লগ্নে গৃহপালিত পশুর জন্য বস্তাভর্তি সবুজ তৃণের বোঝা মাথায় নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন-রত মানুষ। পল্লীর প্রায় চলৎশক্তিহীন বৃদ্ধারা লাঠি হাতে বাড়ীর সম্মুখে এক পা দু'পা হাঁটছেন। অনেকে টুলে বসে সুখ-দুঃখের কথা বলছেন। জীবন প্রদীপ নিবুনিবু। মনে পড়ছে আমার গ্রামের কয়েকজন দরিদ্র পরিবারের বৃদ্ধার কথা। কর্মশক্তি হারাবার পর পুত্রের সংসারে গুরুভার। তাই যষ্ঠিভর দিয়ে ঝুলনা হাতে রোজ ভিক্ষা করতে বের হতে হয়। কোনো বাড়ীর রোয়াকে বিশ্রাম করার সময় বলে, "মাইল্লা" মালেকুল মওতও আমাকে চোখে দেখে না। সোভিয়েত ইউনিয়নে কোথাও এরকম দৃশ্য চোখে পড়ে নি। বাড়ীর আশে-পাশে এবং স্কুলের মরুতুল্য তপ্ত মাঠে-ময়দানে দু'পুর রোদে জুতো জামা খুলে ছোট বালক-বালিকাদের খেলাধুলো, ছুটোছুটি, ঢিল ছোড়াছুড়ি করতেও দেখেছি। কিন্তু কারো চুপসে যাওয়া নিরন্ন মুখ দেখিনি। দেখিনি কোন একটি উলঙ্গ অথবা অর্ধোলঙ্গ বালক-বালিকা। হাত পাততেও দেখিনি কাউকে।

তাই বলছিলাম, স্বাস্থ্যবান সমাজের স্বাভাবিক স্বভাবের সবকিছুই সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষের মধ্যে আছে। অভিনব বা অস্বাভাবিক আচরণ একটিও দেখি নি। নতুন-পুরাতনে মিলিয়ে মানব জীবন। মানুষ স্নেহ, মায়া-মমতাকামী। এগুলো দেয়া-নেয়া তার ধর্ম। মানুষ কর্মী। সে আপন অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার জন্য কাজ করে। কাজ করে উন্নততর জীবনের জন্যও। মানুষ অবসরকামী। সে কাজের ফাঁকে অবসর চায়। সে চিত্তবিনোদনে অবসর সময় কাটায়। প্রকৃতপক্ষে প্রথা-পদ্ধতি নয়, কিন্তু এগুলোকে কেন্দ্র করে স্থানকালোপযোগী প্রথা-পদ্ধতি গড়ে ওঠে। ইরানী কবি বর্ণিত রহস্যময় পুঁথির প্রথম অবলুপ্ত পাতার পরবর্তী অভিযাত্রায় এগুলো মানবজাতির মহান সঞ্চয়। অলঙ্কার এবং নানা স্থূল ও সূক্ষ্ম কর্মকাণ্ডের বাইরে মানব-জাতির প্রকৃত ধর্মও তাই। এ সঞ্চয় সংরক্ষণ এবং মানব-ধর্ম পালনের জন্য শঙ্কা ও বিপন্মুক্ত

সামাজিক জীবন অপরিহার্য। এটাকেই বলে শান্তি। শঙ্কামুক্ত পাখী প্রাতঃকালে গান গায়। দ্বিপ্রহরের ক্লান্ত নীরবতায় ঘুঘু পাখী উদাস-মধুর ডাকে। গোধূলি লগ্নে হংসবলাকারা ঝাঁক বেঁধে ওড়ে। অনিশ্চয়তা এবং শঙ্কামুক্ত মানুষই শুধু সকাল সন্ধ্যার মধুর সংগীত শোনে। প্রাণ ভরে গাইতে বাজাতে এবং নৃত্য করতে পারে জীবন সৌন্দর্যে অভিভূত নিঃশঙ্ক মানুষই। যে প্রথা ও পদ্ধতি শ্রেণী বিদ্বেষ জাগ্রত করে, অনিবার্য করে তোলে সংঘর্ষ কি আবশ্যক ও-রকম প্রথা পদ্ধতির? যে প্রথা ও পদ্ধতি মানব-জীবনকে কখনও প্রহসন কখনও বিড়ম্বনায় পরিণত করে সেটা নির্দ্বিধায় বর্জনীয়। বৈষম্য, অভাব, অভিযোগ, হতাশা প্রভৃতি যুগপৎ যুদ্ধ, মারামারি, কাটাকাটি প্রভৃতি যাবতীয় বিড়ম্বনার উৎস। পাঁচ হাজার বৎসরের মানবেতিহাস তাই প্রমাণ করছে। শান্তির মূল অন্তরায় বৈষম্য। আর বৈষম্যই মানবজাতির প্রধান শত্রু।

তিন

বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ার সামাজিক জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। সেকালের রাশিয়ার ধারাবাহিক রাজনৈতিক ইতিহাস পাঠ করিনি। প্রয়োজন ছিল না, এখনও নেই। তা'ছাড়া, তার সামাজিক অবস্থার প্রকৃত বিবরণ সেকালের সাধারণ রাজনৈতিক ইতিহাসে থাকারও কথা নয়। হারজেন, লেনিন, স্তালিন, প্লেখানভ, লুনাচারস্কি প্রমুখ তাত্ত্বিক পণ্ডিত ও রাজনীতিকদের রচনাও আমরা সকলে পাঠ করিনি। ও'দের তত্ত্বীয় আলোচনা সাধারণ পাঠকের জন্য সহজবোধ্য নয়। কিন্তু আমরা অনেকে তলস্তয়, গগোল, শেকভ, দস্তয়ভস্কি, গোর্কী প্রমুখ রচিত গ্রন্থাবলী পাঠ করেছি। ও'রা ঊনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের লেখক। গোর্কী বাদে অন্যেরা কেউ কমিউনিস্ট ছিলেন না। গোর্কীও কমিউনিস্ট হন সাহিত্য রচনা শুরু করার অনেক পরে। ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে রাশিয়ার মানুষ একটি সুপ্রাচীন আর্থ-সামাজিক প্রথা-পদ্ধতি বর্জন করলো। একটি বিশাল প্রাচীন ইমারত সহসা বিকট শব্দে ধসে পড়লো। তার ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে ছড়িয়ে পড়লো সমগ্র বিশ্বে। কেন কি কারণে সহসা এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলো? বিস্তারিত বিবরণ সমেত এ প্রশ্নের উত্তর উক্ত রুশ সাহিত্যিকগণ রেখে গেছেন। বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ার আর্থ-সামাজিক জীবন সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানার্জনের জন্য তৎকালীন রুশ সাহিত্যই যথেষ্ট। সেখানে পাওয়া যায় রুশী ভূমিদাস, মুজিক, কারখানার শ্রমিক, এবং নিম্ন-বেতনভোগী সাধারণ সরকারী কর্মচারীদের জীবনের পরিচয়। তার পাশাপাশি জারতন্ত্রের সুযোগ-সুবিধাভোগী রুশ শাসক, জমিদার,

তালুকদার, কুলাক, শিল্পপতি, পুরোহিত, বণিক প্রভৃতি ধনী-শ্রেণীর দৈনন্দিন জীবনের বিরণও শৈল্পিক কুশলতার সংগে লিপিবদ্ধ আছে ঐ সাহিত্যে। ভূমিদাসদের নিয়ে রচিত হয়েছে 'ডেড্ সোলস'। ভূমিদাস মরে গেছে কিন্ত তার পণ্যমূল্য আছে। মরেও ওদের মুক্তি নেই। রুশ শাসকশ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণতার কৌতুকপ্রদ বিবরণ পাই 'ইন্সপেক্টর জেনারেল' গ্রন্থে। তলস্তয়ের গল্প-উপন্যাসে ভূমিদাস এবং মুজিকদের দুর্বিসহ জীবনালেখ্যের পাশাপাশি দেখতে পাই জার, জারিনা, মন্ত্রী, সভাসদ, সেনাপতি, এবং জমিদার-জমিদারনীদের বিলাস-বহুল ব্যাভিচারী জীবনের চিত্রও। গগোলের 'ক্লোক' (কোট) গল্পে পাই স্বল্প বেতনভুক সরকারী কেরানীর জীবনচিত্রের আলেখ্য। ভূমিদাস, মুজিক, কারখানা-শ্রমিক অর্থাৎ যারা ধন উৎপাদন করছে তারা অনাহার অর্ধাহারে জীবন কাটাচ্ছে। শীতবস্ত্র নেই। বরফ-শীতে ঝুপড়ির নীচে খড়ের গাদায় শয়ন এবং নগ্নপদে অথবা বৃক্ষপত্র ও বল্কলে পদযুগল আবৃত করে বিচরণ ওদের নিয়তি। যক্ষ্মায় ভুগলেও ওদের দ্বারে চিকিৎসক উপস্থিত হয় না। নিরক্ষরতা ওদের বিধিলিপি। ওরা বিনা সংবাদে জন্মগ্রহণ করে এবং মরে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "যুগযুগান্তর হতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে, জীবনে মরণে ওরা চিরকাল, টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল, ওরা মাঠে মাঠে, বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে, ওরা কাজ করে, নগরে প্রান্তরে।" কিন্তু যে "বিপুল জনতা" "নানা পথে নানা দলে দলে" "যুগযুগান্তর হতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে জীবনে মরণে" সেকালের রাশিয়ায় কাজ করতো কি পেতো তারা তার বিনিময়ে? শোষণ এবং উৎপীড়ন-প্লাবিত জীবনে একমাত্র সান্ত্বনা ছিল সরাইখানার কড়া ভোদকা এবং ঘরে ফিরে বউঝি পুত্র-কন্যার সংগে ঝগড়া ও মারামারি। পথেঘাটে মৃত্যু ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। তবু মুনীবকে নিয়ে তুষার-ঝড়ের মধ্যেও ঘোড়ার গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছে গাড়োয়ান।

গোর্কী তাঁর বাল্যজীবনের কাহিনী নিজেই লিখেছেন। তাঁর নানা-নানী এবং মামা-মামীদের ঘরসংসারের কাহিনী বিশ্বসাহিত্যের

সম্পদ সন্দেহ নেই। কিন্তু শৈল্পিক কুশলতায় অনবদ্য সে বিবরণে মানবজীবনের যে বর্ণনা আছে তার সংগে পশুশালার পার্থক্য নেই। যৌবনে তিনি প্রায় সমগ্র রাশিয়া ঘুরেছেন। কি ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে সাগর সৈকতে শিশুর জন্ম হতো, কেমন ছিল ধীবর এবং একদা যারা মানুষ ছিল সেই শ্রমিকদের জীবন তার বাস্তব বিবরণ তিনি রেখে গেছেন। লঞ্চ-স্টীমার যাত্রী, ঘাটের কুলি, কারখানার শ্রমিক প্রভৃতি কেউ তার সাহিত্যে বাদ পড়েনি। বিচারের নামে প্রহসন অভিনয়েরও অভাব নেই সেকালের রুশ সাহিত্যে।

এ চিত্রের পাশাপাশি আছে রুশ অভিজাত এবং শাসকশ্রেণীর জীবনালেখ্য। সামরিক-বেসামরিক নির্বিশেষে সকল রকমের উঁচু সরকারী পদ ওদের জন্য সংরক্ষিত। ওরা সারারাত খানাপীনা, জুয়া খেলা এবং নৃত্যগীত করে। ওরা ফরাসী ভাষায় কথা বলে, ফরাসী আদব-কায়দা পালন করে এবং পুত্রকন্যাদের জন্য ফরাসী, জার্মান শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী রাখে। জুয়া ও মদে সম্পত্তি হারিয়ে অভিজাত যুবক ধনী পরিবারের সুন্দরী কন্যা বিয়ে করে অথবা সেনাবিভাগে কমিশন পায়। দাসদাসী পরিবৃত হয়ে ওরা জমিদারিতে বসবাস করে। রাজধানীতে বিলাসবহুল হোটেলে রাত্রি কাটায়। ওরা যখন তখন ইয়োরোপ ঘোরে। রক্ষিতা পোষে। ব্যভিচার ওদের কাছে আভিজাত্যের প্রতীক। ওরা সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন, রাজনীতি, নন্দনতত্ব প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করে। ভূমিদাস, সেবাদাস-দাসী, মুজিক, শ্রমিক প্রভৃতি নিয়ে গঠিত বৃহত্তর রুশ মানব-সমাজ ওদের কাছে মহাকাব্যের উপেক্ষিতা। ওরা প্রেমে পড়ে, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব এবং দ্বৈত আনুগত্যের টানা-পোড়েনে ভোগে এবং তার পীড়নে তলস্তয়ের নাতাশারা আত্মহত্যা করে। ওরা পরিচারিকা, হোটেল ওয়েট্রেস, মুজিক, ভূমিদাসের যুবতী স্ত্রী-কন্যাকে ফুসলিয়ে শয্যাসংগিনী করে, রাজী না হলে ধর্ষণ করে এবং গর্ভবতী হলে ছেঁড়া পাদুকার মতো পরিত্যাগ করে। পোশাক পরিচ্ছদ গৃহসজ্জা প্রভৃতিতে ওরা বিপুল অর্থ ব্যয় করে। ওদের ঘরে সারারাত শতশিখায় ঝাড়বাতি

জলে। ওরা অসংখ্য লোক-লস্কর এবং গাড়ীঘোড়া নিয়ে পথ চলে। শীত গ্রীষ্মে ওরা বায়ু পরিবর্তন করে। জারপত্নী দু'তিন কোটি টাকা দামের মণিমাণিক্য খচিত জুতো পরে।

সাধারণ নিরক্ষর লোকদের নিয়ে গঠিত রুশ সেনাবাহিনী যখন যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দলে দলে ফ্রন্ট ত্যাগ করে রুশ অভিজাত শ্রেণী তখনও মস্কো-লেনিনগ্রাদে পান-ভোজন, জুয়া, নৃত্যগীত এবং ব্যভিচারে রাত কাটায়। ওরা আনোপার্জিত ধন ভোগ এবং অপচয় করে। বিদগ্ধজনেরা যখন মহিলাদের সংগীত জলসায় রাত কাটায়, বস্তির বাসিন্দারা তখন শীতে কাঁপে।

ব্রিটেনকে গণতন্ত্রের মাতৃভূমি বলা হয়। মাগনাকার্টা ব্রিটেনের অবদান। কয়েক শতাব্দী আগে ক্রমওয়েল একটি বিপ্লব করেছিলেন। কার্ল মার্কসের জন্মের প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে সেদেশে জন্মগ্রহণ করেন মনীষী রবার্ট আওয়েন। সমবায় আন্দোলনের জনক তিনি। ১৮৩৪ সালে তিনি দশ লক্ষ সদস্যের এক বিশাল ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করেন। প্রচলিত আর্থ-সামাজিক পদ্ধতি বিলোপ করে তার জায়গায় শ্রমিকদের স্বার্থে একটি নতুন পদ্ধতি প্রচলন ছিল তাঁর লক্ষ্য। সাধারণ ধর্মঘট উক্ত লক্ষ্য সাধনের উপায়রূপে গৃহীত হয় তাঁর সময়ে। তাই তাঁকে ব্রিটেনে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার জন্মদাতা বলা যায়। আওয়েন তাঁর রচিত ও প্রচারিত অসংখ্য প্রচারপত্রের একটিতে প্রতিষ্ঠিত ধর্মকে মানবজাতির উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায় রূপে অভিহিত করেন। তাঁর মতে মানব চরিত্রের সমস্ত দোষের জন্য তার পরিবেশ-প্রতিবেশ দায়ী—কিন্তু ধর্ম বলে, ব্যক্তি-মানুষই তার পাপের জন্য দায়ী। বৈষম্য-বিরোধী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে চার্টিস্ট আন্দোলনও ব্রিটিশ ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ব্রিটেনের পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র বেশ প্রাচীন। দীর্ঘকাল ধরে ধাপে ধাপে তার বিকাশ ঘটেছে। রাজতন্ত্র থাকলেও রাজা এখন সেদেশে একটি ব্যয়বহুল অলঙ্কার মাত্র। "সমাজতন্ত্রে আস্থাবান"

ব্রিটিশ শ্রমিকদল প্রথম মহাযুদ্ধের পর কয়েকবার সরকার গঠন করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে শ্রেণী বৈষম্য হ্রাস অথবা দূর করার জন্য নানা পরিকল্পনাও রচিত হয়েছে। বিভারিজ পরিকল্পনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সব ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং উদ্যোগের পরেও ব্রিটিশ সমাজের বৈষম্য কি দূর হয়েছে? সকল শ্রেণীর লোক কি তার যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রমাণের সমান সুযোগ পাচ্ছে? পাচ্ছে না। সকল মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তি সমান হয়তো নয়। কিন্তু সকলের জন্য সমান সুযোগের ব্যবস্থা থাকলেই শুধু বৈষম্য নির্বাসিত হতে পারে। গণতন্ত্রের মাতৃভূমি ব্রিটেনে সে সুযোগ এখনও অনুপস্থিত। ১৯৫১-৫৬ সালের ব্রিটেনে সেদেশের মোট জাতীয় পুঁজির (capital) শতকরা ৪২ ভাগ ছিল মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র একভাগ লোকের দখলে। শতকরা পাঁচভাগ লোক ব্রিটেনের জাতীয় মূলধনের শতকরা ৬৭'৫ ভাগের মালিক ছিল। তারপর আরো পঁচিশ বৎসর অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তীকালের বৈষম্য বিদূরণ সদিচ্ছা যেমন বাস্তব ফলাফলদানে ব্যর্থ হয়, পরবর্তী পঁচিশ বৎসর কালের মধ্যেও সেটা তেমনি ব্যর্থ হয়েছে। ব্রিটেন এখন কট্টর পুঁজিবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লায়েন্ট অর্থাৎ অধমর্ণ রাষ্ট্র। তাই সেখানকার সামাজিক বৈষম্য সম্ভবতঃ ১৯৫৬ সাল অপেক্ষাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রিটেনে একটানা মুদ্রাস্ফীতি চলছে। মুদ্রাস্ফীতি ধনীকে আরো ধনী করে এবং নিম্নবিত্তকে করে আরো বেশী দরিদ্র। ব্রিটেনে এখন বিপুল সংখ্যক লোক বেকার। এখনো সেদেশের উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা শিক্ষালাভের সমান সুযোগ সুবিধা পায় না। উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য বিশেষ ধরণের ব্যয়-বহুল স্কুল-কলেজ একটি বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা। তা'ছাড়াও বাধা আছে। শ্রমিক ও নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েকে আর্থিক কারণে বাধ্য হয়ে উচ্চ শিক্ষা শেষ করার আগেই কাজের সন্ধান করতে হয়। পুঁজিবাদী বিশ্বে ১৯৮০ সালে বেকারের

সংখ্যা ছিল দু'কোটি। এই বেকারত্ব সাধারণভাবে পুঁজিবাদী বিশ্বের অথবা বিশেষভাবে কোনো পুঁজিবাদী দেশের অসচ্ছলতা বা দারিদ্র্যের প্রমাণ নয়। বৈষম্য সৃষ্টিকারী সামাজিক সংগঠন এই বেকারত্বের একমাত্র কারণ। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য যে দীর্ঘ সময় আবশ্যক উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা সেটা নিশ্চিন্তে ব্যয় করতে পারে। পরিণামে তারাই হয় সমাজপতি, ধনপতি এবং শাসক। বিরল ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েরা হয় পিতা-মাতার মতো কারখানা শ্রমিক। বৈষম্য যেন একটি স্বাভাবিক জৈবধর্ম। ব্রিটিশ সমাজের এটাই ধারণা। ব্রিটেনে মহিলারা ভোটাধিকার লাভ করেন বর্তমানে শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। পশ্চিম ইয়োরোপ এবং মার্কিন সমাজে প্রাথাসিদ্ধ বিবাহের বাইরে ব্যাপক যৌনজীবন গোপন ব্যাপার নয়। সমাজ ব্যাপারটা ভালোভাবেই জানে। তা সত্ত্বেও ঐসব দেশে "অবৈধ" সন্তান আছে এবং অবৈধ ভ্রূণ হত্যাও চলে। এই "অবৈধতাকে" বৈধ করার কোনো পন্থা ওরা উদ্ভাবন করে নি। উদ্ভাবনে অক্ষম মনে করলে পুঁজিবাদী বিশ্বের বুদ্ধিবিবেচনাকে খাটো করে দেখা হয়।

পুঁজিবাদী মানবসমাজের পাশাপাশি বিদ্যমান সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজ। এ সমাজ আজ থেকে ৬৪ বছর আগে একটি প্রাচীন আর্থ-সামাজিক পদ্ধতি বিসর্জন দিয়েছে। কোনো কোনো অংগরাজ্য তার দশ বছর পরে ইউনিয়নভুক্ত হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে সোভিয়েত রাশিয়ার আর্থ-সামাজিক প্রশাসনিক পদ্ধতি সম্পূর্ণ নতুন। সমাজতন্ত্র ছিল ইউটোপিয়া—স্বপ্নবিলাস। সোভিয়েত রাশিয়ায় তার বাস্তবায়ন চলছে। শুরুতে এ প্রক্রিয়া সমাজকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল বলেই এটাকে বিপ্লব বলা হয়। কিন্তু চেয়ে দেখলাম, অন্য যে কোনো দেশের মানুষের মতো সে দেশের মানুষ স্বাভাবিক মানুষই রয়ে গেছে। মস্কো, লেনিনগ্রাদ, তাসখন্দ, সমরকন্দ, বাকু প্রভৃতি বড় বড় শহরের জনস্রোতে মিশে হেঁটেছি, পল্লীগ্রামে গিয়েছি, শহর ও পল্লীর মসজিদে প্রবেশ করেছি, নামাজ পড়েছি ও পড়তে দেখেছি, কথা বলেছি অনেকের সংগে, স্কুল পরিদর্শন করেছি, পাঠরত ছেলেমেয়েদের ক্লাসে ঢুকেছি, ওদের এবং শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের সংগে কথাবার্তা বলেছি, কোথাও অস্বাভাবিকতার চিহ্ন দেখতে পাইনি। সে দেশের ছেলেমেয়েরাও খেলাধুলো করে, ছবি আঁকে, গায়ক গান করে, বাজিয়ে বাজায়, নৃত্যশিল্পী নৃত্য করে। সেদেশেও সার্কাস, সিনেমা, থিয়েটার, ব্যালেতে প্রচণ্ড ভিড় হয়, টিকেট করতে লাইনে দাঁড়াতে হয়। সে দেশের মানুষও দোকানে যায়, কেনাকাটা করে; স্ত্রী কাঁচা বাজারে দামদস্তুর করে তরিতরকারী ফলমূল প্রভৃতি জিনিষ কেনে, ট্রাম, বাস, মেট্রো, ট্যাক্সিতে চলে, এমন কি চলতে চলতে এটা ওটা

খায়ও। সমাজতন্ত্র ওদের স্বাভাবিক মানবিক আচরণে বাধা দেয় না ঃ মানবিক আচরণের পথে কোথাও ইয়েস-নো সাইনবোর্ড নেই। প্রকৃতি আগের মতোই ঋতু পরিবর্তন করে ঃ বসন্তে গ্রীষ্মে বৃক্ষ শাখায় পত্রোদ্গম হয়, ফুল ফোটে, ফল ধরে, পাকে, বনশীর্ষে শোঁ শোঁ বাতাস বয়, পাখী গান গায়, হংসবলাকারা বিলে ঝিলে বিচরণ করে। শীতে তুষার পড়ে, বরফ জমে, বৃক্ষ পত্রশূন্য হয়, শ্বেতশুভ্র হয়ে যায় পৃথিবী ঃ গৃহে গৃহে মানুষ আগুন পোহায়। কখনো ইলশেগুড়িতে কখনো বা অবিরত ধারায় বৃষ্টি পড়ে। বিচিত্র বর্ণালী সৃষ্টি করে চন্দ্র সূর্য নক্ষত্রাদি উদয় হয় এবং অস্ত যায়। স্রোতোস্বিনীর স্রোত বয়ে চলে। জলযান যাত্রী নিয়ে চলে। এই নৈসর্গিকতার ভেতরে জীবন অত্যন্ত স্বাভাবিকতার মধ্যে প্রবহমান।

তা'হলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে ঃ ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে এমন কি অসাধারণ ঘটনা ঘটলো যার প্রভাবে দু'টি শিবিরে বিভক্ত হলো বিশ্বের মানবসমাজ ? বিভক্ত মানবসমাজের একাংশ কি ঐ ঘটনার মধ্যে সত্যি সত্যিই ইতিপূর্বে অনাস্বাদিত এবং অনুপলব্ধ এক আশ্চর্য নবজীবনের সম্ভাবনা দেখতে পেলো এবং উদ্বুদ্ধ হলো সে সম্ভাবনাকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠার ইতিবাচক কার্যে ? এবং অপর অংশ কি তার মধ্যে দেখতে পেলো মহাপ্রলয়ের অশনিসংকেত ? দেখতে পেলো কি কল্পিত ভয়ঙ্কর দৈত্যের ব্যাদত্ত আগ্রাসী মুখ ? পেছনের দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি এবং সতত বিলীয়মানকে ছেড়ে আসা অতীতের আলোকে বুঝতে চাই তখন ১৯১৭ সালের বিপ্লবের মধ্যে মানব সমাজ দু'টি বিবদমান শিবিরে বিভক্ত হওয়ার কোনো সংগত কারণ খুঁজে পাই না। গ্রীক দার্শনিক প্রোটাগোরাস বলেছিলেন, "Man is the measure of all things"—মানুষ সব কিছুর পরিমাপক। দ্যাকার্তে বলেছিলেন, "I think, therefore I am"। হেগেলের সোয়া দু'হাজার বছর আগে হেরাক্লিটাস বলেছিলেন, "It is the opposite which is good for us"।

আমাদের দেশের কবি বলে গেছেন, "শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই।" এমনকি কট্টর ভাববাদী দার্শনিকগণও ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করার দায়ে পড়ে ইহলোক-বাসী মানুষকে তার কর্মের স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়েছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী মনীষী হেলভেটিয়াসও কমিউনিস্ট ছিলেন না! তিনি বলে গেছেন, "Principal instructors of adolescence are the forms of goverment and the consequent manners and customs. Man are born ignorant, not stupid, they are made stupid by education." তাঁর মতে বিশুদ্ধ শিক্ষা বিশুদ্ধ মানুষ তৈরী করতে সক্ষম। উদ্ধৃত উক্তিগুলোর সারার্থঃ সজীব ও সজ্ঞান মানুষমাত্রেই চিন্তা করে, চিন্তা করে বলেই সে মানুষ। অপর-দিকে সজীব এবং সজ্ঞান অবস্থান ব্যতিরেকে চিন্তা করা যায় না। অবস্থানের দুটি দিক ঃ একটি ব্যৈক্তিক, অপরটি সামাজিক। একটি থেকে অপরটিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না বটে, কিন্তু ব্যাপক বিধায় সামাজিক অবস্থান ব্যৈক্তিক অবস্থানকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষ নিজেই তার উভয় অবস্থান নির্ণয় করে এবং প্রয়োজনবোধে পুরাতন অবস্থান বর্জন করে। সে স্থাবর নয়। জঙ্গমতা মানব জীবনের বৃহত্তর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। পুরনো অবস্থান বর্জন করার প্রকৃত তাৎপর্য ভিন্নধর্মী নতুন অবস্থান গ্রহণ ঃ পশ্চাতে প্রত্যাগমন নয়। জাত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের জন্যই অবস্থান হতে অবস্থানান্তরে গমন আবশ্যক হয়। ইহজগতে সবার উপরে মানুষকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ তার জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করার জন্যই যুগে যুগে, কালে কালে opposite অর্থাৎ বিপরীতকে গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। প্রচলিতের বিপরীতকে গ্রহণের এ নিয়ম অনুসরণ করেই মানবজাতি তার ইতিহাস রচনা করে চলেছে। তার কর্মই প্রমাণ করেছে যে, মানব মস্তিষ্কপ্রসূত কোনো মতবাদ অথবা প্রথা-পদ্ধতি sacrosanct অর্থাৎ অলঙ্ঘ্য অতি পবিত্র নয়। জীবন-মৃত্যু-নবজীবন এক অলঙ্ঘ্যনীয় চক্র। তেমনি

মস্তিষ্কপ্রসূত সকল প্রকার চিন্তাভাবনা, সংগঠন, প্রথা-পদ্ধতিরও জন্ম-মৃত্যু এবং নবজন্ম আছে। পিতৃ-ওরসে এবং মাতৃজঠরে জন্ম সত্ত্বেও নবাগত কখনও তার পিতা-মাতা নয়—সে স্বতন্ত্র মানুষ। তার চিন্তা ও জগৎ অন্য চিন্তা ও অন্য জগৎ। কিন্তু পুরুষানুক্রমিক জীবনস্রোত সততঃ প্রবহমান। এটা শুধু স্বাভাবিক নয়, এটাই মানবজাতির একমাত্র অলঙ্ঘ্য নিয়তি।

মনে করুন ইতিহাসের এক বিশেষ বিন্দুতে এসে দেখা গেলো, স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহ সোল্লাসে মহামানবের সাগরে পতিত হওয়ার মুখে পড়েছে পলিমাটির এক বিশাল চর। স্রোত কখনো বাধা মানে না। পর্বতও স্রোতের গতিরোধ করতে অক্ষম। সে গিরীশ্রেণী বিদীর্ণ করে প্রচণ্ড বেগে এগিয়ে যায়। গিরিখাত (গর্জ) তার সাক্ষী। জারশাসিত রাশিয়ায় শাশ্বত সে জীবনপ্রবাহ অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সামন্ততন্ত্র এবং সামন্ততন্ত্র-প্রতিপালিত পুরোহিততন্ত্র ছিল স্বেচ্ছাচারী রুশ রাজতন্ত্রের সামাজিক ভিতভূমি। ঐ ভিতভূমিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল একটি বিশেষ ধরণের আর্থ-সামাজিক প্রশাসনিক পদ্ধতি। ঐ পদ্ধতিতে "সবার উপরে মানুষ সত্য"—স্বীকৃত ছিল না। প্রথা-পদ্ধতিটাই ছিল সবার উপরে সত্য। শিল্প-বিপ্লবোত্তর বিবর্তনধর্মী ইয়োরোপীয় জীবনবোধ প্রবেশের দ্বারও রুদ্ধ ছিল বিশাল সে দেশে। জার প্রযুক্ত সেনসর সাহিত্য ও সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ করতো। সংস্কারবাদী আন্দোলনকেও সন্দেহের চোখে দেখা হতো। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব এবং তার পরের শিল্প বিপ্লবের চাপে ইয়োরোপ হতে ভূমিদাস প্রথা উঠে গিয়েছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিকাল পর্যন্ত রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। ঐ শতাব্দীর সত্তরের দশকে রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথা বিলোপের আইন প্রণীত হয়। কিন্তু বিশাল ভূমিদাস শ্রেণীকে অন্য কাজে নিয়োগ করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয় নি। কাজের তালাশে শহর-বন্দরে এসে ব্যর্থ হয়ে ওদের অনেকে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে। মোট কথা ওদের দুর্দশা ও দুর্গতি আগের চেয়েও বেড়ে যায়।

লুথার, ক্যালভিন এবং আরো অনেকের প্রতিবাদী আন্দোলন ইয়োরোপে আধুনিক পুঁজিবাদ এবং তার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম ল্যাজে ফেয়ারী গণতন্ত্র প্রভৃতির উত্থান এবং প্রতিষ্ঠাকে সহায়তা করেছে। কিন্তু জারতন্ত্রের ছত্রছায়ায় লালিত পালিত বর্ধিত রুশ পুরোহিততন্ত্র ঈশ্বরে নিবেদিত প্রাণ খাঁটি খ্রীশ্চান তলস্তয়কে excommunicate অর্থাৎ ক্রিশ্চানিটি থেকে খারিজ করে দেয়। তলস্তয় ১৯১০ সালে পরলোকগমন করেন। কোনো খৃস্টান পুরোহিত তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেন নি। ভাগ্য-বিড়ম্বিত বুভুক্ষু রুশ জনসাধারণ যখন রাজ পথে ভিক্ষা মাগছে পানাহারপুষ্ট রুশ পুরোহিততন্ত্র তখন ওদের কাছে ত্যাগ-তিতিক্ষার মহিমা প্রচার করছে। মাক্সিম গোর্কী নাকি আজার-বাইজানের বাকু শহরটিকে ভূপৃষ্ঠের নরক নাম দিয়েছিলেন। গোর্কী ১৯৩০ সালেরও পরে পরলোকগমন করেন।

এক সময়ে তুরস্কের সুলতানকে sick-man of Europe বলা হতো। সুলতান এবং তার অমাত্যবর্গের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ভালোই ছিল। তার রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতিটাই ছিল প্রকৃতপক্ষে রুগ্ন। তাই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে তুরস্ক আত্মরক্ষা এবং আক্রমণ উভয় প্রকার যুদ্ধে পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করতে থাকে। অবশেষে ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে চূড়ান্ত পরাজয়ের মধ্যে সুলতান তাঁর পদ এবং সাম্রাজ্য দুই-ই হারান। ইয়োরোপে তুর্কী অধিকার ইস্তাম্বুলে এবং তৎসন্নিকটবর্তী সামান্য ভূভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়। ধর্মোন্মাদনাও ঐ বিপর্যয় রোধ করতে পারে নি। মধ্যপ্রাচ্যে এখনও সে বিপর্যয় চলছে। রুগ্নতার সুযোগ নিয়ে বিপর্যয় সাধন করছে অভিশপ্তরূপে চিহ্নিত বনী ইস্রাইল এবং তার সহায়তাকারী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।

বিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছার আগেই রুশ জার ইয়োরোপের দ্বিতীয় রুগ্ন ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলো। জার, তার উজির-নাজির, সভাসদ, জমিদার এবং পুরোহিতগণ খেয়ে-পরে বেশ

ভালোই ছিলেন। ব্যাধি কিছু থাকলেও সেটা ছিল অতিভোজন এবং অতিবিলাসিতাজনিত ব্যধি। সুলতানী তুরস্কের ন্যায় রাশিয়ায়ও দু' রকমের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল। সুলতানী আমলের তুরস্কে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এবং অভিজাত শাসকশ্রেণীর সন্তানদের জন্য উঁচু মানের আলাদা বিদ্যালয় ছিল। সাধারণ লোকের জন্য অর্থ না বুঝে কোরান পাঠই ছিল বিদ্যাশিক্ষার সীমা। মসজিদ ছিল এ শিক্ষার কেন্দ্র। নিরক্ষরতা ছিল ব্যাপক। আপামর জনসাধারণকে দরিদ্র এবং নিরক্ষর রেখে যে জাতীয় স্বার্থ এমন কি জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না প্রথম মহাযুদ্ধসহ অসংখ্য যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তুরস্ক তার প্রমাণ দিয়েছে। এখন প্রমাণ দিচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য। জারশাসিত রাশিয়ায়ও অভিজাত শাসকশ্রেণীর জন্য উঁচু মানের শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল। অনেকে পুত্র-কন্যাদের জন্য বিদেশী গৃহশিক্ষক রাখতেন। ১৯১৭ সালের আগে জারশাসিত ইয়োরোপীয় অংশেও সাক্ষরতার শতকরা হার ১৫ জনের বেশী ছিল না। জার-আশ্রিত সামন্ত নৃপতিদের দ্বারা শাসিত মুসলিম প্রধান বিশাল এশীয় ভূভাগে সাক্ষরতার হার ছিল প্রায় শূন্যের কোঠায়—কোথাও ০.৩ শতাংশ, কোথাও এক-দু'শতাংশ। রুশ চাষী-মজুর শ্রেণীর দুঃসহ জীবন এবং তার পাশাপাশি অভিজাত শাসকশ্রেণীর বিলাস বহুল জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণ রুশ সাহিত্যে আছে, যার উল্লেখ আগেই করেছি।

মানুষ পারিবারিক জীবনযাপন করে। তাই স্বভাবে সে রক্ষণশীল। সামাজিক জীবন ধীরে সুস্থে এগিয়ে চলার এটাই কারণ। এ ভাবে এগিয়ে চলাকে আমরা বিবর্তন বলি। বৈষম্য বিরোধ সৃষ্টি করে। বিবর্তন বৈষম্যকে ক্রমে ক্রমে হ্রাস করে। এই স্বাভাবিক বিবর্তন ঠেকিয়ে রাখতে চাইলে সংবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে। এরূপ ঘটনাকে আমরা বিপ্লব বলি। পরিবর্তনের আকস্মিকতা ব্যতীত বিপ্লবের মধ্যে অন্য কোনরূপ অস্বাভাবিকতা নেই। জারতন্ত্র বিবর্তন বিরোধী ছিল।

আর্থ-সামাজিক বিপ্লবের আগে ঘটে সাংস্কৃতিক বিপ্লব। বিশ্বনন্দিত রুশ শিল্পী সাহিত্যিক কবিগণ সাংস্কৃতিক ভিতভূমি তৈরী করেছিলেন। তলস্তয়, গগোল, শেকভ, দস্তয়ভস্কি, গোর্কী, পুশকিন, মায়াকভস্কি প্রমুখ সহ আরো অসংখ্য শিল্পী সাহিত্যিক তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে ওঁদের নামোল্লেখ করেছি। অপর দিকে হারজেন, প্লেখানভ, লেনিন, লুনাচারস্কি সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোর জন্য প্রয়োজনীয় ভিতভূমি নির্মাণ করেছিলেন। মার্কস, এ্যাঙ্গেলস দিয়ে গিয়েছিলেন তত্ত্ব। অতঃপর একদিন মাহেন্দ্র মুহূর্ত উপস্থিত হলো। প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত রুশ সেনা-বাহিনী পলায়নপর ঃ রুশ ইকনমি বিধ্বস্ত, জারের মন্ত্রিসভা কিং-কর্তব্যবিমূঢ়। শাসকশ্রেণী জাতিকে নেতৃত্ব দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। সে সময়ে প্রাচীন প্রথা-পদ্ধতির মধ্যে অবস্থান করে হতাশ জাতিকে নেতৃত্বদান সম্ভব ছিল না। তত্ত্বীয় জ্ঞান এবং বাস্তবতাবোধে লেনিন পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তি। তিনি ঐ মাহেন্দ্র মুহূর্তটি চিহ্নিত করতে সক্ষম হন। তাঁর মহান নেতৃত্বে রুশ জনসাধারণ মধ্যযুগীয় অমানবিক আর্থ-সামাজিক প্রথা-পদ্ধতি বিসর্জনের জন্য সক্রিয় হয়ে উঠলো। তার ধ্বনি ছড়িয়ে পড়লো সারা বিশ্বে। আমাদের কবি কাজী নজরুল ইসলামও সে ধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে রচনা করলেন সাম্যের গান।

কিন্তু জার এবং জারতন্ত্রকে যত সহজে অপসারিত করা সম্ভব হয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোটিকে ততো সহজে উৎখাত করা সম্ভব হয় নি। আগেই উল্লেখ করেছি মানবসমাজ কমবেশী রক্ষণশীল। তার শেকড় নানা স্থানে অদৃশ্যভাবে ছড়িয়ে থাকে। মানুষ পারস্পরিক বন্ধনসূত্রে বাঁধা। বন্ধনটা মূলতঃ অর্থ-নৈতিক। প্রায় নিঃস্ব ব্যক্তিও বিকল্প ব্যবস্থার মধ্যে তার জৈব অস্তিত্বের অধিকতর নিরাপত্তার সম্ভাবনা স্পষ্ট দেখতে না পেলে প্রাচীন প্রথা-পদ্ধতি হতে সরে আসতে ইতস্ততঃ করে। দীর্ঘকালব্যাপী কায়েমী স্বার্থভোগী শ্রেণীর প্রতিরোধও আবার খুবই স্বাভাবিক। বিপ্লবের

পথে এসব বাধা ব্যতিরেকেও আরো অনেক অতিরিক্ত বাধা পথ রোধ করে দাঁড়ালো। সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের বীজমন্ত্র ছড়িয়ে পড়ে পুঁজীবাদী বিশ্বের কায়েমী স্বার্থের সর্বনাশ সাধন করবে আশঙ্কায় ভীতসন্ত্রস্ত আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ঐকবদ্ধ-ভাবে রুশ সামন্ততন্ত্রের সহায়তায় এগিয়ে গেল। গৃহযুদ্ধ বাধলো। মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন মুসলিম প্রধান অঞ্চলের আমীর এবং বাচমাক লুটেরাদের বিরুদ্ধে ঐ অঞ্চলের জনগণকে দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাতে হয়েছে। মধ্য এশিয়ার সর্বত্র সমাজতান্ত্রিক গণপ্রজাতন্ত্র পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হতে অনেক সময় লেগেছে। ১৯২৭-২৮ সালের দিকে এসে শেষ হয়েছে সে প্রক্রিয়া। এ বিষয়ে পরে যথাস্থানে আরো কিছু বলবো।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী অপপ্রচার এখনও থামেনি। ওরা নানা প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে বিশ্ববাসীকে বোঝাতে চায় যে, মধ্য এশিয়ার মুসলিম অধিবাসীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই। একই কথা বলে ওরা খৃস্টান রুশদের সম্বন্ধেও। অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের বিশাল প্রচার মাধ্যমগুলোর উপর প্রায় সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। পক্ষপাতমুক্ত সংবাদ সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। আর্থিক অন্তরায় আছে। অপর অন্তরায় আধা-সামন্তবাদী আধা-পুঁজিবাদী দেশীয় শাসকশ্রেণী। শুধু পক্ষপাতমুক্ত বৈদেশিক সংবাদ নয়, বিষয়মুখী দেশীয় সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনের পথেও ওরা পর্বত-প্রমাণ বাধা। ওরা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করার চক্রান্তে সততঃ লিপ্ত। ধর্ম ওদের কাছে পারলৌকিক মুক্তির সনদ নয়, ইহলোকে ক্ষমতার রাজনীতির পুঁজি। গণতন্ত্র ওদের কাছে একটি মহৎ জীবনবোধ নয়। ধর্ম ও গণতন্ত্র উভয়ই ওদের কাছে শোষণ ও উৎপীড়নের হাতিয়ার। শতকরা ৮০ জন দেশবাসী নিরক্ষর এবং হাড্ডিসার নেংটিসার দরিদ্র। ফলে ওরা সামাজিক অবক্ষয় এবং জাতীয় সংকট সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারনা করতে অক্ষম। ঔপনিবেশিক আমলের অপশিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত শ্রেণীর জীবন

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নানা বদভ্যাস এবং কুসংস্কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। হেলভেটিয়াসের মতের প্রতিধ্বনি করে বলা যায়, গণকল্যাণবিরোধী সরকার পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত হওয়ার ফলে ওদের একাংশ সজ্ঞানে কায়েমী স্বার্থের সহযোগী এবং অপরাংশ স্টুপিড। এ অবস্থায় প্রায় সকল শ্রেণীর দেশবাসী অবিরাম অসত্য ও অর্ধসত্য প্রচারণাজাত প্রতিবর্তীক্রিয়ার প্রভাবাধীন। এই অনুকূল ক্ষেত্রে কায়েমী স্বার্থ মৃগয়ায় অবতীর্ণ। আমরা অনেকেই জানিনা, ১৯১৭ সালের অক্টোবর হতে ক্রমে ক্রমে প্রবর্তিত সোভিয়েত রাশিয়ার বর্তমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পদ্ধতিটি প্রকৃতপক্ষে কি বস্তু।

পাঁচ

••

প্রায় একমাস সোভিয়েত রাশিয়ায় ছিলাম। সেদেশের লেখক সমিতি বাংলাদেশের একজন লেখকরূপে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। সেখানে পৌঁছে জানতে পারি, নিছক রাশিয়া ভ্রমণ ছাড়াও অন্য একটি বিশেষ সুযোগ আমার জন্য অপেক্ষা করছে। হিজরি পঞ্চদশ শতাব্দীর আগমনকে শান্তির শতকরূপে স্বাগত জানাবার জন্য উজবেকিস্তান সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী তাসখন্দে একটি আন্তর্জাতিক মুসলিম মহাসম্মেলন হচ্ছে। রুশ লেখক সমিতি আমাকে ঐ সুযোগের সদ্ব্যবহার করার ব্যবস্থা করে দিল। ১৯৮০ সালের ২৯শে আগস্ট সকালে মস্কো পৌঁছে-ছিলাম। ৮ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় তাসখন্দ পৌঁছি। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার বিমান পথে আমার সহযাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের আরবী ভাষাভাষী মুসলমান। ফিনল্যাণ্ড, জাপান, পশ্চিম জার্মানি, বুলগেরিয়া, তুরস্ক সাইপ্রাস, প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণও বিমানে ছিলেন। ৯ থেকে ১২ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সম্মেলন। বহুতলা 'উজবেকিস্তান হোটেল' নিমন্ত্রিতদের অস্থায়ী বাসস্থান। এটিই নাকি তাসখন্দের বৃহত্তম আধুনিক হোটেল। ৯ই সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায় উজবেক কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের বিশাল অট্টালিকার সাংস্কৃতিক মিলনায়-তনে সম্মেলন শুরু হলো। সম্মেলনের উদ্যোক্তা মধ্য এশিয়া এবং উজবেকিস্তানের মুসলিম ধর্মীয় বোর্ড। প্রতিষ্ঠানের চেয়ার-ম্যান মুফতী জিয়াযুদ্দীন ইবনে ইশান বাবা খান। ইশান জার-আমলের মধ্য এশিয়ার মওলানাদের উপাধি। বুঝলাম, মুফতী জিয়া-যুদ্দীনের পিতা বাবা খান ছিলেন বোখারার আমীরের আমলের এক

জন ইশান মুফতী জিয়ায়ুদ্দীন আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান আলেম। ধর্মীয় বিধি-বিধান বিষয়ে সর্বোচ্চ ফতোয়াদাতা। আরবী ভাষায় তিনি বেশ কিছু সংখ্যক ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন। মুসলিম ধর্মীয় বোর্ড এগুলোর প্রকাশক। 'সোভিয়েত প্রাচ্য' নামে আরবী, উজবেক, ইংরাজী, ফরাসী এবং ফার্সী ভাষায় একটি মাসিক পত্রিকাও উক্ত বোর্ড নিয়মিত প্রকাশ করে। পত্রিকাটির মান অত্যন্ত উন্নত এবং ছাপাও অত্যন্ত সুন্দর। মুফতী জিয়ায়ুদ্দীনের বয়স এখন প্রায় ৭৩।

বিশাল সোভিয়েত রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের তিন শত আলেম, মুফতী, মসজিদের ইমাম এবং ধর্মীয় সমিতির প্রতিনিধিগণ সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু আলেম, মুফতী, মুসলিম অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি নানা পেশার নিমন্ত্রিত মানুষও সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। কয়েকজন খৃস্টান ধর্মযাজককেও দেখলাম। যতদূর মনে পড়ছে, আফ্রিকার ঘানা, আলজিরিয়া, সেনেগাল, তানজানিয়া, টোগো, উগাণ্ডা, নাইজেরিয়া, সুদান, লিবিয়া, মরিশাস, বেনিন, ইথিওপিয়া, মালি প্রভৃতি দেশ; এশিয়ার জাপান, ইয়েমেন, কুয়েত, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, আফগানিস্তান, মঙ্গোলিয়া, তুরস্ক, সাইপ্রাস, শ্রীলঙ্কা, লেবানন এবং ইয়োরোপের পূর্ব এবং পশ্চিম জার্মানি, বুলগেরিয়া, ফিনল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া প্রভৃতিসহ আরো বেশ কিছু দেশের মুসলিম সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। একটি ইরানী দম্পতিকেও দেখেছিলাম বলে মনে পড়ছে। ইরানী মহিলার মুখ ছাড়া সর্বাঙ্গ বোরকাজাতীয় আচ্ছাদনে আবৃত ছিল। তার সংগী স্বামীর পোশাক ছিল ইয়োরোপীয়। আফ্রিকা এবং মধ্য প্রাচ্যের আরবী ভাষা-ভাষী অতিথিগণের পরণে যার যার দেশের জাতীয় পোশাক ছিল। কেউ কেউ ইয়োরোপীয় পোশাকও পরে-

ছিলেন। তবে শেষোক্তরা ছিলেন সংখ্যায় অল্প। সোভিয়েত রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত প্রায় সকল ধর্মনেতা এবং মসজিদের ইমামের গায়ে চোগা এবং মাথায় পাগড়ি ছিল। ফিনল্যাণ্ডের তরুণ ইমাম একটি চমৎকার উঁচু টুপি পরেছিলেন। সাধারণভাবে আফ্রিকার এবং বিশেষভাবে ঘানার মেহমানদের সাদার উপর জড়োয়া ঢিলেঢালা পদপ্রান্ত পর্যন্ত লম্বা পোশাক দেখে চমৎকৃত হয়েছি। আমাদের পরিচিত চোগার চেয়ে অনেক সুন্দর লাগলো। অপূর্ব কোরান আবৃত্তি দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়। ফিনল্যাণ্ডের তরুণ ঈমামের কেরাত শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম। ফিনল্যাণ্ডের প্রতিনিধিদের মধ্যে দু'জনের সংগে আলাপ জমেছিল। ওঁরা ইংরেজি এবং আরবী উভয় ভাষা বেশ ভালো জানেন। ওঁদের মধ্যে একজন ব্যবসায়ী, অপর জন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা বিভাগে ডক্‌টরেটের জন্য গবেষণা করছেন। ওঁদের কাছে জানতে পারলাম, ফিনল্যাণ্ডে মুসলমানের সংখ্যা বারোশ'র মতো। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক শিক্ষাদানের জন্য ওঁদের নিজস্ব ব্যবস্থা আছে। প্রতিটি মুসলিম বালক-বালিকাকে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়। ওঁরা আদিতে ছিলেন তুর্কী মানবগোষ্ঠীর লোক। ফিনল্যাণ্ডবাসী মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল। দু'টি মসজিদ আছে সে দেশে। ইচ্ছে ও উদ্যোগের সংগে জাতীয় চেতনা থাকলে বর্ণবাদ ও ধর্মান্ধতা-মুক্ত দেশে সংখ্যালঘিষ্ঠতা কোনো সম্প্রদায়ের আত্মিক বিকাশের পথে বাধা নয়। ওঁদের সংগে আলোচনা করে এ সত্য বুঝতে পারলাম। ব্যবসায়ী ব্যক্তি খাঁটি মুসলমান, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ফিনল্যাণ্ডের জাতীয় সেনাবাহিনীতে একজন যুদ্ধরত সৈনিক ছিলেন এবং আহত হয়েছিলেন।

উদ্বোধনী অধিবেশনে সম্মেলনের সাফল্য কামনা এবং অভ্যাগত-দের স্বাগত জানিয়ে বক্তৃতা করেন সোভিয়েত রাশিয়ার ধর্মবিষয়ক কাউন্সিলের প্রথম ভাইস-চেয়ারম্যান এম· রহমানকুলভ এবং তাসখন্দ সিটি সোভিয়েতের চেয়ারম্যান ভি· কাজিমভ। চার-

দিনব্যাপী সম্মেলনে সমস্ত কাজকর্মের মাধ্যম ছিল আরবী ভাষা। জামাল আব্দুল নাসেরের জীবৎকালে কখনো কখনো কায়রো বেতার ধরেছি। শুনেছি আরবী গান। কিন্তু মঞ্চে দণ্ডায়মান বক্তার অলিখিত তাৎক্ষণিক আরবী বক্তৃতা ঐ সম্মেলনেই প্রথম শুনলাম। কারো কারো বাগ্মিতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। সিরিয়ার ওয়াকফ মন্ত্রী মোহাম্মদ আল খাতিবের ভাষণ শুনে আমার মনে পড়ছিল শেরে বাংলা ফজলুল হক সাহেবকে। খুব সম্ভব ১৯৪২-৪৩ সালের ঘটনা। তৎকালীন বঙ্গীয় আইন সভায় মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের উপর বিতর্ক চলছিল। বিরোধীদলীয় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ন্যায় জাঁদরেল বক্তারা জোরালো বক্তৃতা রেখেছিলেন। উত্তর দিতে উঠলেন প্রধানমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় এ. কে. ফজলুল হক। তখন তাঁর বয়স ৬৯ বছর। ফজলুল হক সাহেব তাঁর দেড়ঘন্টাব্যাপী অবিস্মরণীয় ইংরেজী বক্তৃতায় প্রতি মিনিটে গড়ে ১৮০টি শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন। তাঁর ভাষাতেও ছিল সাহিত্য মাধুর্য। প্রেস গ্যালারিতে বসে স্তব্ধ বিস্ময়ে ঐ বক্তৃতা শুনেছিলাম। মোহাম্মদ আল খাতিবের শব্দোচ্চারণ গতি হয়তো ততোটা ছিল না, কিন্তু জোর ছিল হক সাহেবের সেই বক্তৃতার মতোই।

সম্মেলনের মোটো বিষয়ে আগেই বলেছি ঃ "হিজরি পঞ্চদশ শতক আন্তর্জাতিক শান্তি ও বন্ধুত্বের শতাব্দী হোক"। এ বিষয়ের উপর বক্তাগণ বক্তৃতা করলেন। ইংরেজী ও ফরাসীসহ মোট পাঁচটি কি ছ'টি ভাষায় যুগপৎ অনুবাদের ব্যবস্থা ছিল। সাধারণভাবে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে পৃথিবীর সমস্ত নিপীড়িত মজলুম মানুষের এবং বিশেষভাবে অনগ্রসর মুসলিমপ্রধান দেশসমূহের মানুষের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আত্মিক উন্নতির জন্য বিশ্বশান্তি অপরিহার্য। বক্তাগণের প্রায় সকলেই মুসলিম-প্রধান মধ্যপ্রাচ্যের বিস্ফোরণোন্মুখ অবস্থার উল্লেখ করলেন। পবিত্র কোরান ও হাদিস থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ওঁরা প্রমাণ করলেন যে,

ইসলাম শান্তি ও সহ-অবস্থানের ধর্ম। মানবকল্যাণ তার মূল লক্ষ্য। মার্কিনী নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার মুসলিমপ্রধান অঞ্চলে স্থায়ী অশান্তি সৃষ্টি করে রেখেছে। ইসরাইল সাম্রাজ্যবাদের স্থানীয় প্রতিনিধি। সে বিশ লক্ষের বেশী প্যালেস্টাইনী অধিবাসীকে বিগত ৩২ বছর ধরে গৃহহারা করে রেখেছে। দেশ থাকতেও ওরা আজ রিফ্যুজি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলের অভিভাবক। ঐ অভিভাবকের সহায়তায় ইসরাইল জাতিসংঘের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে চলেছে। জাতিসংঘ নির্ধারিত চৌহদ্দি ডিঙ্গিয়ে সে বিশাল আরবভূমি জবরদখল করে রেখেছে। সর্বশেষ হামলা করেছে সে মুসলমানদের প্রথম কাবা বায়তুল মোকাদ্দেসের ওপর। ইসরাইল সম্পূর্ণ জেরুজালেম গ্রাস করেছে। হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে ওঁরা বললেন, সমগ্র বিশ্বের মুসলমান একটি বিশাল ইমারত সদৃশ। সুতরাং মুসলিম জগতের এ দুর্দিনে জাতি ও রাষ্ট্র নির্বিশেষে বিশ্ব মুসলিমের ঐক্য ও সংহতি আবশ্যক। বক্তাগণ রসুলাল্লাহ (দঃ) এবং পরবর্তী চার খলিফার শাসনামলকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করে বললেন, ইসলাম ধর্মের মূল লক্ষ্যাদর্শ সাম্য ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা। এই মহান লক্ষার্জনের পথে যা কিছু অন্তরায় সেগুলো অপসারণের জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া উচিত।

সম্মেলন সর্বসম্মতিক্রমে তিনটি ঘোষণা প্রকাশ করে। প্রথমটি "সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের প্রতি একটি আবেদন।" দ্বিতীয়টি "জেরুজালেম সম্পর্কিত বিবৃতি।" তৃতীয়টিতে আছে, "ইসরাইলী আগ্রাসনের শিকার প্যালেস্টাইন এবং লেবাননী জনগণের সংগে একাত্মতা ঘোষণা"। উক্ত দলিলে হিজরি পঞ্চদশ শতাব্দীকে শান্তি, বন্ধুত্ব এবং সামাজিক উন্নতির শতাব্দীতে পরিণত করার লক্ষ্যে শান্তিকামী সকল শক্তির সংগে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য বিশ্বের সকল মুসলমানের প্রতি আহবান জানানো হয়। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ,

ইহুদীবাদ, আধিপত্যবাদ প্রভৃতিকে বিশ্বশান্তির শত্রুরূপে চিহ্নিত করে তার তীব্র নিন্দা করা হয়। সম্মেলন, সাধারণভাবে মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কিত সকল পক্ষপাতমূলক পৃথক পৃথক চুক্তি এবং বিশেষভাবে মার্কিনী অভিভাবকত্বে সম্পাদিত মিসর-ইসরাইল ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করে। জেরুজালেমসহ ইসরাইল-অধিকৃত সমগ্র আরবভূমি পুনরুদ্ধার এবং স্বদেশে স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য পি.এল.ও'র নেতৃত্বে প্যালেস্টাইনীগণ যে ন্যায় সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে তার প্রতি সক্রিয়- সমর্থনদানের জন্যে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের প্রতি এক উদাত্ত আহবান জানানো হয় সম্মেলন থেকে।

সম্মেলনে যোগদানকারী মেহমানদের মধ্যএশিয়া এবং কাজাখস্তানের মুসলিম ধর্মীয় বোর্ড এক নৈশভোজে প্রথম সংবর্ধনা জানান। সংবর্ধনা সভায় বোর্ডের চেয়ারম্যান মুফতী জিয়ায়ুদ্দীন বাবা খান একটি অতি চমৎকার বক্তৃতা দেন। তার বুলন্দ কণ্ঠস্বর, বাগ্মিতা এবং ব্যক্তিত্ব শ্রোতাদের বিশেষভাবে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করে। পরে দেখেছি ঐ অঞ্চলের মুসলমানদের কাছে তিনি প্রায় পীরের মতো ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্র, সরকারী মহলেও তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার ব্যক্তি। শরিয়তের একটি জটিল প্রশ্নের উপর প্রদত্ত তাঁর ফতোয়া বোর্ড থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকায় পড়ে বুঝলাম, কোরান, হাদিস ও ফেকাহ শাস্ত্রে মুফতী জিয়ায়ুদ্দীনের পাণ্ডিত্য কতো গভীর। সোভিয়েত ইউনিয়নের সমগ্র মুসলিম প্রধান অঞ্চলে মুফতী প্রথা এখনও বিদ্যমান। নিঃসন্দেহে এটি আমির শাসনামলের উত্তরাধিকার। ছোট বেলার অনেক কথা মনে পড়লো। সরকারীভাবে না থাকলেও সেকালে আমাদের দেশেও মুফতী প্রথা ছিল। ছোট-বড় মুফতীরা ছিলেন। ধর্মীয় বিধিবিধানের ব্যাখ্যা নিয়ে জটিল সমস্যা দেখা দিলে বিষয়টি প্রশ্নের আকারে স্থানীয় ছোট মুফতীর কাছে উপস্থিত করা হতো। প্রশ্ন শুরু হতো কতকটা এ ভাবে: 'নিম্নোক্ত প্রশ্নে ওলামায়ে দ্বীনের রায় কি?' স্থানীয় মুফতীর রায় সম্বন্ধে সন্দেহ জাগলে

আরো উপরের দরোজার আলেমের কাছে পাঠানো হতো। চূড়ান্ত রায় দিতেন শাইফুল হিন্দ। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন সাধারণতঃ দেওবন্দ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিখ্যাত আলেম। দেওবন্দ মাদ্রাসার আলেমগণ প্রায় সকলেই ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী। এখনও তাঁরা ঐ ভূমিকা পালন করছেন। দেওবন্দ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা শায়ফুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসান ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের সুবিখ্যাত মুফতী। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলভির আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক দর্শন তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। সাম্রাজ্যবাদ এবং তার স্থানীয় এজেণ্টদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সততঃ সংগ্রামরত সৈনিক। মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী, মুফতী কেফায়েতুল্লাহ, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখ আলেম ছিলেন দেওবন্দের রাজনৈতিক দর্শনের ভাবশিষ্য। বিভাগপূর্ব এবং বিভাগোত্তর ভারত উপমহাদেশের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে দেওবন্দী আলেমদের অবদান স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়ার দাবী রাখে। আলিগড় কলেজের (পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়) অবদান নিছক ইংরেজী ভাষা প্রচার এবং সেই সাথে ইংরেজী শিক্ষিতদের মধ্যে উচ্চমন্যতাবোধ সৃষ্টির মধ্যেই প্রধানতঃ সীমিত। ব্যতিক্রমীদের সংখ্যা নগণ্য।

পূর্ণ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠাই ছিল ইসলাম ধর্মের মূল লক্ষ্য। এই মহান লক্ষ্যে আস্থাবান আলেম মুফতী জিয়ায়ুদ্দীন বাবা খান। এযুগে সাম্রাজ্যবাদ সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক সাম্যের মূল শত্রু। তাই মুফতী জিয়ায়ুদ্দীন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী। সমাজতন্ত্র আর্থ-সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার একমাত্র পদ্ধতি, ধর্মের সংগে সমাজতন্ত্রের কোনো বিরোধ নেই। মুফতী জিয়ায়ুদ্দিন বাবা খান সমাজতন্ত্রকে এ যুগের স্বাভাবিক সমাজ ব্যবস্থারূপে গ্রহণ করেছেন। আমাদের দেশে মুফতী প্রথা নেই। তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। কিন্তু শাহ ওয়ালীউল্লাহ মোহাদ্দেসের ন্যায় পূর্ণ আর্থ-

সামাজিক সাম্য, মৈত্রী এবং ভ্রাতৃত্ব স্থাপনে বিশ্বাসী দেওবন্দপন্থী প্রকৃত আলেমের দরকার ছিল। আজ ওঁরা বিরল ব্যতিক্রমের মধ্যে নীরব। ভণ্ড মোনাফিকেরা আলেমের বেশে বিচরণ করছে। তাই দেখতে পাই, আবুজর গিফারিকে বিস্মৃত হয়ে আমাদের তথাকথিত আলেমগণ জালেম শাসকশ্রেণী এবং তাদের সহায়তাকারী সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক।

দ্বিতীয় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন উজবেকিস্তান সরকার। ঐ নৈশভোজের বিশালতা এবং রকমারি খানাদানার কথা কখনো ভোলবার মতো নয়। স্থানীয় এবং আমাদের পরিচিত মোগলাই খানার এমন কোনো আইটেম নেই যা টেবিলে ছিল না। বিভিন্ন ফল-ফলারিসহ আইটেমের সংখ্যা বোধকরি পঁচিশের কম ছিল না। ঐ খানা দেখে আমার মনে হলো, বিরিয়ানি, বিভিন্ন রকমের কাবাব, কোফতা, মোরগ মুসল্লম, রোস্ট, কোরমা, পোলাও, ফলের রস প্রভৃতি যেসব খাদ্য ও পানীয়কে আমরা নিতান্ত আপন বলে জানি সেগুলো প্রকৃতপক্ষে মোগল-পাঠানদের সাথে মধ্যএশিয়া থেকে এসেছে। মংগোল এবং তুর্ক-আফগানেরা বহু খুনখারাবি করেছে ঃ দেশবিদেশে অভিযান চালিয়ে ছারখার করেছে অসংখ্য জনপদ। লাইব্রেরীও পুড়িয়েছে ওরা। এগুলো সত্যি কথা। কিন্তু বিপরীত সত্যিও আছে। সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ এবং অগ্রগতিতে ওরা স্থায়ী অবদান রেখেছে।

তাসখন্দের এক প্রেক্ষাগৃহে আমাদের জন্য একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শিল্পীরা কণ্ঠসংগীত, যন্ত্র-সংগীত শুনিয়েছিলেন। নৃত্যও দেখেছি। সংগীতের ভাষা বুঝিনি কিন্তু হিন্দুস্থানী সংগীতের তাল-লয়-রাগ-রাগিনীর এবং বাদ্যযন্ত্রের সংগে বহু ক্ষেত্রে সাদৃশ্য থাকায় আমার মধ্যে ভাবাবেগের সঞ্চার হয়েছিল। মনে হচ্ছিল আমি যেন আমার বহুকালের পরিচিত জগতেই আছি। প্রকৃতই যা সুন্দর তা সর্বত্রই সুন্দর। পরিবেশ পরিবেশনা এবং তাল-লয়-সুরের বৈশিষ্ট্যে

সত্ত্বেও প্রকৃতই যা সুন্দর ও মনোহার তা-ই পৃথিবীর সকল মানুষের অন্তরে আবেদন সৃষ্টি করে। তাই ইয়োরোপীয় হওয়া সত্ত্বেও নাইনথ সিম্ফনি শুনে আমারা মুগ্ধ হই। দু'জন শিল্পীর কণ্ঠসংগীত আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। তবলা নেই, তার বদলে আছে একটি মৃদঙ্গজাতীয় গোলাকার বাদ্যযন্ত্র। বেশ বড় একটি গোল চাকার মধ্যে জয়ঢাকের চামড়ার মতো চামড়া দিয়ে বানানো। আমাদের ভাষায় বোধকরি খোল বলা যায়। নির্মাণ কৌশলে কিছু কিছু পার্থক্য সত্ত্বেও তাদের বাদ্যযন্ত্রগুলোর সাথে আমাদের দেশের সেতার, এস্রাজ, তানপুরা, একতারা, দোতারা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। অনুষ্ঠানশেষে আমার মনে হলো, হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সংগীত এবং যন্ত্র-সংগীতের শৈল্পিক ক্রমোন্নতি এবং উৎকর্ষে মধ্যএশীয় অবদান হয়তো অকিঞ্চিৎকর নয়। বিপরীত ব্যাপারও হতে পারে। যা-হোক, প্রাচীন হিন্দুস্থানী সংগীত এবং সংস্কৃতির সংগে মধ্যএশীয় সংগীত এবং সংস্কৃতির যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ার ঐতিহাসিক কারণ আছে। বিশেষজ্ঞেরা এ বিষয়ে চূড়ান্ত মতামত প্রকাশ করতে পারেন। সালওয়ার, লম্বা কোর্তা, কামিজ, পাজামা, সদরিয়া, চোগা, পাগড়ি, টুপি প্রভৃতি যেসব পোশাক-পরিচ্ছদকে আমরা ইসলামী পোশাক মনে করি প্রকৃতপক্ষে তার কোনটারই উৎসভূমি হজরত মোহাম্মদের (দঃ) সমকালীন আরব নয়, এগুলোর উৎস প্রাচীন সুমার, বেবিলন হতে শুরু করে মধ্যএশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল অঞ্চল। হজরত মোহাম্মদের (দঃ) আমলে আরবের সাধারণ পোষাক ছিল সেলাইহীন লুংগি, গায়ের চাদর এবং মাথার রুমাল। প্রথমোক্ত দু'টি গ্রেকো-রোমান। ধুতি, শাড়ি মধ্যএশিয়ায় দেখি নি। এ দু'টি পোশাক খাঁটি ভারতীয়। তবে প্রাচীন দ্রাবিড় এবং মহেঞ্জোদারো সভ্যতার অবদান অথবা মিডিয়ান নামে পরিচিত জনগোষ্ঠী দক্ষিণ রাশিয়া হতে কৃষ্ণসাগর এবং কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী পার্বত্যভূমির মধ্য দিয়ে ইরান হয়ে ভারতে প্রবেশ করার পরবর্তীকালের আবিষ্কার কিনা বলা কঠিন।

অনেকের মতে, মিডিয়ানগণ একালে ইন্দো-ইয়োরোপীয় অথবা আর্য নামে পরিচিত জনগোষ্ঠীর পূর্ব পুরুষ।

মধ্যএশিয়ার শহর-বন্দরে সোনালী, রূপালী ব্রোকেডের সদরিয়া চোগা, হাতের কাজ করা সুন্দর চারকোণ টুপি-পাগড়ি, লাল রুমাল, মহিলাদের রঙীন কোর্তা, সালোয়ার ঘাগরা দেখে বাল্যকালের বহু দৃশ্য মনে পড়লো। সেকালে আমাদের দেশের রয়িস ব্যক্তি এবং আলেমগণ ওসব পোশাক পরতেন। বালিকারা রঙিন ঘাগরা পরতো। পাখতুনিস্তান, বেলুচিস্তান অঞ্চলে আজও এগুলোই বহুল ব্যবহৃত পোশাক। ভ্রমণকালে নিজের চোখেও দেখেছি। জড়োয়া নাগরা জুতোর উৎপত্তি কোন্ দেশে জানি না, কিন্তু আজারবাইজানে এখনও ঐ ধরনের জড়োয়া চটি তৈরী হয়। দু'জোড়া উপহার পেয়েছিলাম। মধ্যএশিয়াবাসীরা মুসলমান হওয়ার আগেও সম্ভবত ওসব বা ঐ ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ পরতো। পরবর্তীকালে ধনৈশ্বর্য বৃদ্ধির সংগে সংগে ওসবের সোনালী রূপালী কারুকার্য এবং জৌলুস বৃদ্ধি পেয়ে থাকবে। মোট কথা, পোশাক-পরিচ্ছদের হ্রস্বতা-দীর্ঘতা, কাট-ছাট, রকম প্রভৃতির সাথে বিশেষ কোনো ধর্ম অথবা ধর্মনিষ্ঠার আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। দাড়ি, চুল, চৈতন প্রভৃতিও ধর্ম এবং ধর্মনিষ্ঠার সংগে সম্পর্কহীন। পোশাক-পরিচ্ছদ, শিরাবরণ, অক্ষর, ভাষা প্রভৃতি সবকিছুই প্যাগানিজমের অবদান। জলবায়ুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সেগুলো তৈরী হয়েছে। ধনৈশ্বর্যের বৃদ্ধি সেগুলোর শৈল্পিক বিকাশে সহায়তা করেছে। পরিবর্তিত উৎপাদন পদ্ধতির সংগেও সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হয়েছে পোশাক-পরিচ্ছদকে। বড় বড় কলকারখানার শ্রমিক এবং ঝড়-বৃষ্টি ও রোদের মধ্যে মাঠে হাল-চাষ-করা বাংলার গরীব চাষীর পোশাক এক হতে পারে না। ভাষায় ব্যবহৃত বহু শব্দ আমরা একালে যে অর্থে ব্যবহার করি প্রাচীন কালে তা অন্য অর্থে ব্যবহৃত হতো। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আরবী

শামস শব্দটির উল্লেখ করা যেতে পারে। একালে এটির অর্থ সূর্য। সুমেরীয়দের সূর্যদেবতার নাম ছিল শামস। সিপার এবং লারসা শহরে সূর্যদেবের মন্দির ছিল।

জমকালো দামী পোশাকের একটি অব্যাখ্যাত পটভূমিও অবশ্য আছে। অপ্রচলিত দুর্বোধ্য শব্দসম্ভার এবং অন্তঃসারহীন শৈলীর মাধ্যমে রচনাকে অলঙ্কৃত করে 'পণ্ডিত' এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করার রীতি বহুকাল থেকে প্রচলিত। সাধারণ মানুষকে প্রকৃত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত রাখার এর চেয়ে উত্তম পথ দ্বিতীয়টি নেই। জমকালো পোশাক-পরিচ্ছদ, মুকুট, শিরাবরণ প্রভৃতিও অলঙ্কৃত ভাষার মতো মানুষে মানুষে পার্থক্য সৃষ্টি এবং সেই পার্থক্যকে ক্রমে ক্রমে 'স্বাভাবিক' করে তোলার একটি মোক্ষম অস্ত্র। যুদ্ধাস্ত্রের চেয়ে এ অস্ত্র কম তীক্ষ্ণধার নয়। রাজা হাম্মুরাবী, মিশরী ঈশ্বর ফেরাউন এবং ইহুদী রাজা সোলেমানের পোশাক-পরিচ্ছদ, হেরেম প্রভৃতির যে পরিচয় আমরা আধুনিক গবেষক পণ্ডিতদের গ্রন্থে পাই তা' এটাই প্রমাণ করে যে, অস্বাভাবিক রকমের জমকালো শোশাক-পরিচ্ছদ, উচ্চাসন প্রভৃতি প্রকৃতপক্ষে শোষক এবং শোষিতের শ্রেণীভেদ চিহ্নিত করে। এক শ্রেণীর তথাকথিত ধার্মিকের বহিরাবরণও তা-ই। পাপী এবং পুণ্যবানের প্রমাণ পোশাকের পার্থক্য নয়। আমাদের পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তৎকালীন আরবে প্রচলিত সাধারণ পোশাক পরতেন। তিনি নাকি জীবনে একবার মাত্র সেলাই করা পোশাক পরেছিলেন। সেটি নাকি তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন সুলেমান ফারসী নামক তাঁর ভক্ত জনৈক নবদীক্ষিত ইরানী মুসলমান। কিন্তু সম্ভবতঃ অনভ্যস্ত বিধায় তিনি সেটি নিয়মিত ব্যবহার করেন নি। বর্তমানকালেও হজ্বের সময় হাজী যে পোশাক পরেন রসুলাল্লাহ্‌র আমলে কতকটা ঐ রকম পোশাকই সম্ভবতঃ ছিল তৎকালীন আরববাসী সাধারণ লোকের পোশাক। কল্পনাকে বেশী দূরে প্রসারিত না করেও আমরা বুঝতে পারি

যে, মুক্ত স্বাধীন এবং সাম্যে বিশ্বাসী সমাজে পোশাক-পরিচ্ছদের বিশেষ পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে না। যুদ্ধাস্ত্রের মতো, জাঁক-জমকপূর্ণ দামী পোশাকও প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষের ভয়ভীতি, এবং ঐশ্বরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা সৃষ্টির একটি আপাতঃদৃষ্টিতে নির্দোষ উপায়।

সাম্য এবং স্বাধীনতায় বিশ্বাসী জাতির পোশাক-পরিচ্ছদ খাদ্যাখাদ্য প্রভৃতিও অভিন্ন। আনন্দ উৎসব করার উপাদান এবং পদ্ধতিতেও পার্থক্য অনুপস্থিত। সংস্কৃতি ও সভ্যতার রূপান্তর আছে, আছে বিবর্তন। সমগ্র জাতিকে সাথে নিয়ে হলে সাংস্কৃতিক রূপান্তর জাতির চারিত্রিক রূপান্তর ঘটায়। সেটাই স্বাভাবিক। পোশাক-পরিচ্ছদ, খানাপীনা, আরাম-আয়েশ, শয়ন-শায়ন প্রভৃতিতে গুরুতর পার্থক্য প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীতে শ্রেণীতে বৈষম্য বোঝায়। শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভেদ বৈষম্যের অর্থ আইন শৃঙ্খলা, বিশ্বাস, আনুগত্য, স্বার্থ প্রভৃতি সামাজিক জীবনের সব কিছুতে বিভেদ। এ বিভেদ খাড়ায় এবং আড়ে দু'ভাবেই পরিদৃষ্ট। নানা স্তরাকীর্ণ এ জাতীয় সমাজের স্তরগুলোও আবার কখনো কখনো খাড়ায় বিভক্ত। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আমার বাল্যকালে কলু, ধাই, বাজুইনা, নিকিরি প্রভৃতি পেশাভিত্তিতে চিহ্নিত জনগোষ্ঠীর সাথে বিয়ে-শাদী নিষিদ্ধ তো ছিলই, এমনকি ওদের বাড়ীতে পান-পানিও গ্রহণ করা হতো না। অথচ ওরা মুসলমান। গরীব মুসলমান চাষী এবং ওরা অভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণীভুক্ত। তা সত্ত্বেও ওরা তখন ছিলেন মুসলিম সমাজের অস্পৃশ্য পারিয়া। আমাদের দেশে এখনো এ প্রবচনটি প্রচলিত ঃ 'সাউ একটা জাত, এক সাউয়ে খায় না অপর সাউয়ের ভাত।'

নানা কারুকার্যমণ্ডিত বিশাল প্রাসাদ, দুর্ভেদ্য প্রশস্ত প্রাচীর প্রভৃতিও শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষিত, শাসিত, নিপীড়িত জন-সাধারণের মনে বিহবলতা সৃষ্টির একটি উপায়। আজানুলম্বিত

মণিমুক্তাখচিত আঁটসাঁট নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর অস্বাভাবিক পোশাক-পরিচ্ছদ, অস্বাভাবিক বাড়ীঘর প্রভৃতি সবকিছুই অসম সমাজে ক্ষমতার প্রতীক চিহ্ন। কিছু লোককে অতিমানুষরূপে গণ্য করানোর ফন্দি এগুলো। সুফী, সন্ন্যাসী, সাধু, পুরোহিত যখন বিশেষ ধরনের পোশাক ধরেন তখন বুঝি যে, তাঁরা সমাজে আলাদা অবস্থান চিহ্নিত করছেন। ধর্মনিষ্ঠার চেয়ে তখন ওঁরা অশিক্ষিত সমাজে ওদের 'আধ্যাত্মিক' আধিপত্য বিস্তারে বেশী সক্রিয়। নেংটা সাধুর আখড়ায়ও অনায়াসলব্ধ আহার্যের অভাব হয় না। জননেন্দ্রিয়ের দাবী পূরণের জন্য মন্দিরে সেবাদাসী এবং পোশাকধারী সুফী-সাধকের হেরেমে বিবাহিতা এবং খরিদা মহিলারা আগেও ছিলেন, একালেও বহু দেশে আছেন। ধর্মনিষ্ঠা, জ্ঞানবত্তা, এবং পেশা প্রভৃতির প্রতীকরূপে বিশেষ ধরনের পোশাক পরার ব্যাপারটা আমার কাছে অত্যন্ত বিসদৃশ মনে হয়। জ্ঞানীর একমাত্র প্রতীকচিহ্ন তার জ্ঞান। জ্ঞান প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম ভাষা এবং সম্পাদিত কর্ম। প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি এ-দুটি মাধ্যমই ব্যবহার করেন। শেখ সাদীর ভ্রমণবৃত্তান্তে জীর্ণ মলিন বস্ত্রে রাজদরবারে যাত্রা এবং সেখান থেকে রাজখেলাত গায়ে প্রত্যাবর্তনকালে তাঁর প্রতি প্রদর্শিত জনৈক ধনী ব্যক্তির আতিথেয়তার যে তারতম্য আমরা দেখতে পাই, শ্রেণী বিভক্ত সমাজে এরূপ স্থূলতা স্বাভাবিক। সভ্য মানুষ বস্ত্র ব্যবহার করে। কিন্তু একই সাথে এ-সত্যটাও স্মরণ রাখা দরকার যে, বিবস্ত্র হওয়া মাত্র সব মানুষই এক রকম। কিন্তু এই রূঢ় নিরস সত্যটি আমরা ভুলে যাই। পোশাকের নীচে জ্ঞান এবং পুণ্য বসবাস করে না। আরো স্মরণ রাখা দরকার যে, সবস্ত্র-বিবস্ত্র, ধনী-নির্ধন, পাপী-তাপী, পীর-পয়গম্বর, সুফী-দরবেশ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্ম, পরিবৃদ্ধি, মৃত্যু প্রভৃতি ক্রিয়া অভিন্ন। তাই পোশাক-পরিচ্ছদ, দাড়ি-টিকি প্রভৃতি যুগপৎ সংস্কৃতি ও সভ্যতার নিদর্শন এবং দুর্বৃত্তপনা। এ সবই পাশ-বিকতা, ইতরতা, অজ্ঞানতা, বর্বরতা প্রভৃতি যাবতীয় অমান-

বিকতা ঢেকে রাখারও উপাদান। প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেব-দেবীর কাদামাটির পদযুগল বেরিয়ে পড়ে। বৃহত্তর মানব-কল্যাণের জন্য সামাজিক পরিবর্তন যখন অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে তখন পোশাকী সভ্যতার মুখোশ উন্মোচিত হয় এবং তার ভিতরের ইতরতাটা আমরা দেখতে পাই। ১৯৪৩ সালের দুভিক্ষের সময় আমরা পোশাকী মানুষদের হিংস্রতা এবং ইতরতা এই বাংলাদেশেই দেখেছি।

পোশাক-পরিচ্ছদের কথা বলতে গিয়ে অনেক কথা বলে ফেলেছি। মধ্যএশিয়ার বিশাল মালভূমি উপত্যকা-অধিত্যকায় চেঙ্গিস, হালাকু, কুবলাই, তৈমুরলঙ্গ প্রমুখ বিশ্বত্রাস খুনী রাজা বাদশাদের জন্ম। ইসলাম ধর্ম প্রবেশের বহু আগেই ঐ অঞ্চলে শাসক-শাসিত এবং শোষক-শোষিতের বৈষম্যপূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। ইসলাম ধর্মের প্রাথমিক প্রবেশস্থান ইরাক, সিরিয়ায় জন্ম নিল ইসলামের মূলনীতি অনুমোদিত সাম্যবাদী খেলাফত নয়, সম্রাটশাসিত মধ্যযুগীয় সাম্রাজ্য। অপরদিকে ইসলাম তৈমুরলঙ্গের চরিত্র সংশোধন করতে পারে নি। শান্তির বারী ঢেলে নিবারণ করতে পারেনি সুলতান মাহমুদ, নাদির শাহ, আহমদশা আবদালী প্রমুখের রক্তপিপাসা। খৃস্ট ধর্ম বন্ধ করতে পারেনি খৃস্টান ইয়োরোপের শত শত বৎসর-ব্যাপী জিঘাংসাবৃত্তি। অথচ ইসলাম এবং ক্রিশ্চানিটি উভয় ধর্মের লক্ষ্য বিশ্বে আল্লাহর রাজত্ব এবং মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা। পোশাকী ধার্মিক ব্যক্তিগণ শান্তিকালে শান্তির কথা বলেও আসছেন। অশান্তিকালে ওঁদের প্রায় সবাইকে দানবীয় মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায়। পাইকারী নরহত্যা, নারী ধর্ষণ, লুটপাট, জনপদ ভস্মীভূত করা প্রভৃতি তখন ওঁদের কাছে পুণ্যকর্ম, জাতীয়তাবোধ এবং ধর্মবোধে রূপান্তরিত হয়।

প্রাচীনকালে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র দাস, ভূমিদাস প্রভৃতি প্রথা বিদ্যমান ছিল। কলকব্জার অভাবে ওটাই ছিল সামাজিক ধন

উৎপাদন ও আহরণের একমাত্র পন্থা। জীবন্ত মানুষকেই নিষ্প্রাণ কলকব্জারূপে ব্যবহার করা হতো। সেকালের মানবজাতির ক্ষীয়মান ঐতিহ্যরূপেই আজকের দুনিয়ায় রাজরাজড়া, মোল্লা-মুফতী এবং ইয়াহুদী, খৃস্টান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, ধর্মযাজকদের বিশেষ ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ আমরা দেখতে পাই। জনগণের মধ্যে অপ্রচলিত বিশেষ ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদের ভূমিকা সেকালে যা ছিল একালেও তার বিশেষ ব্যতিক্রম হয়নি।

সোভিয়েত ইউনিয়নে উপার্জনের ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা এবং তার প্রকৃতি অনুযায়ী অল্পবিস্তর তারতম্য আছে, কিন্তু মানুষ জন্মসূত্রে বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণী এবং লেইটি, জেনটিলিটি-নবিলিটিতে বিভক্ত নয়। সর্ব্বোচ্চ রাজনৈতিক-সামাজিক সম্মান ও পদ লাভের অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা সকলের জন্য সেদেশে সমান। উত্তরাধিকারসূত্রে ধামিক, ঐশ্বর্যবান অথবা সিংহাসন লাভের সুযোগ সোভিয়েত ইউনিয়নে একেবারেই নেই। মধ্য-এশিয়ার সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলোতেও এখন একই অবস্থা। কিন্তু হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকাররূপে চলে-আসা পোশাক-পরিচ্ছদের বিভিন্নতা এখনো অল্পবিস্তর দেখা যায়। গায়কের বাদ্যযন্ত্র, পটুয়ার তুলি এবং ধীবরের জালের মতো পোশাকের পার্থক্য কখনও কখনও পেশা চিহ্নিত করে। পল্লী-বাসীদের বৃহদাংশ বিশেষভাবে মহিলারা এখনো সেকেলে পোশাক পরেন। সালোয়ার, কোর্তা, শিরাবরণরূপে বড় রুমাল, চারকোণ টুপি, পাগড়ি এবং সদরিয়া ওড়না প্রভৃতি সচরাচরই চোখে পড়ে। শহরবাসী যুবক-যুবতীরা আধুনিক ইয়োরোপীয় পোশাক গ্রহণ করছে। মঞ্চে অবতীর্ণ তরুণ গায়ককেও ইয়োরোপীয় পোশাকে দেখলাম। মোল্লা মুফতীদের মজলিসী পোশাক-ট্রাউজার-কোর্তা-সার্ট এবং তার উপরে সদরিয়া, চোগা এবং মাথায় পাগড়ী। ওঁরা কমবেশী দাড়ি রাখেন এবং সুগন্ধি যেমন আতর-গোলাপ প্রভৃতিও মাখেন। কোট-প্যাণ্ট-টাইয়ের উপরে চোগা-চাপানো দাড়ি-কামানো মসজিদের ইমামও দেখেছি। মনে হলো, চোগাটাই ইমাম মুফতীর

প্রতীক চিহ্ন। ওঁদের প্রায় কেউই এক বর্ণ ইংরেজী জানেন না, কিন্তু প্রায় মাতৃভাষার মতো সচ্ছন্দে আরবী বলেন। আমার দোভাষী হিসেবে জনৈক আরবী-জানা যুবক ইমামকে পেয়েছিলাম। তিনি সম্ভবতঃ দশ পনেরটি ইংরেজী শব্দ জানেন। আমার আরবী জ্ঞান একেবারে সীমিত, তার উপর আবার পঞ্চাশ বছরের অচর্চায় প্রায় ভুলেই গেছি। ঝালাই করতে চেষ্টা করেও আমি আমার দোভাষীকে পেটের পীড়ার বিষয়টা বোঝাতে পারি নি। ভ্রাম্যমান মেডিক্যাল টিমেও ইংরেজি-জানা কেউ ছিলেন না। দেখালাম পেট। ওঁরা দিলেন ইঞ্জেকশন। মনে হয়, ওঁরা আমাশা ধরে নিয়েছিলেন। হোটেলে ফিরে জনৈক ইংরেজী-জানা এক ভদ্রলোককে খুঁজে পাওয়ার পর পেটের অসুখের বড়ি পেয়েছিলাম। পেটের পীড়াগ্রস্ত রোগী আমার জন্য মহিলা ডাক্তার নিজে তদারক করে হোটেল-রন্ধনশালা থেকে সকালের পথ্য আনলেন গোটা চারেক মাখন টোস্ট, দু'টি কোয়ার্টার-বয়েল ডিম, সবজি সালাদ, দই, চা প্রভৃতি। মনে মনে প্রমাদ গুণেছিলাম। কিন্তু আল্লাহর নাম নিয়ে বিনা প্রতিবাদে খেলাম। প্রতিবাদ করলেও বা বোঝাতাম কেমন করে?

এটা বুঝতে কষ্ট হলো না যে, সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটছে। পোশাক-পরিচ্ছদ এখন পবিত্রতা ও ক্ষমতার প্রতীক নয়। ক্ষেত্র-বিশেষে বড়জোর পেশা চিহ্নিত করে। ওঁরা আরবী শিখছেন একটি আধুনিক জীবন্ত ভাষারূপে—ভাষাবিশেষের উপরে পবিত্রতার প্রলেপ মাখছেন না। মহিলারা অন্দরের বাইরে এসেছেন। ওঁরা রৌদ্রতপ্ত বিশাল মাঠে পুষ্পিত তুলো চয়নের কাজও করেন, আবার ডাক্তারি, নার্সগিরি, স্কুল-মাদ্রাসা-কলেজের শিক্ষকতাও করেন। কলকারখানার শ্রমিকরূপেও মহিলাদেরকে কাজ করতে দেখেছি। কাজের অভাব নেই। যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের বরাদ্দ। কিন্তু সেদেশে কোনো কাজ ঘৃণ্য নয়। কাজের প্রকৃতি মানুষকে অভিজাত অথবা অস্পৃশ্য দু'টোর কোনো-টাই করে না।

ছয়

....

সম্মেলনের কথা এখানেই শেষ করছি। এবার আমার ভ্রমণ অভিজ্ঞতা বিষয়ে কিছু কথা বলছি। গোড়াতেই বলে রাখছি, অল্প কয়েক দিনে একটি বিশাল দেশ দূরের কথা তার অঞ্চল-বিশেষের পূর্ণ পরিচয় লাভ করাও সম্ভব নয়। স্বদেশেরইবা কতটুকু আমরা জানি। যে অদৃশ্য ধারা প্রতিটি মানুষের অন্তরকে বৃহত্তর মানবজাতির অন্তর্সমুদ্রের সংগে যুক্ত করছে, যেখানে মানুষে মানুষে কোনো বিভেদ নেই—সবাই মহাবিশ্বের দুর্লঙ্ঘ্য আইন-কানুনের অধীন, তার ভিতরে প্রবেশ করার যে আনন্দ, সেই অনাবিল আনন্দে আমাদের কতজন অবগাহন করতে পারি। মানবজীবন বিচিত্র এবং জটিল। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য তার একটি দিক মাত্র। মানবতাবোধ নামক এক অদৃশ্য বস্তু এ বিশিষ্টতাকে অগ্রাহ্য বা অতিক্রম করে সমগ্র মানবসমাজকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে রেখেছে। সমাজবদ্ধ দৈনন্দিন মানবজীবন মানবতার সাংগঠনিক রূপ। এ জীবন যুগপৎ শ্রম এবং সংস্কৃতির জীবন। বৈষম্য সাংস্কৃতিক জীবনকে বিভক্ত করে। সংস্কৃতি ও সভ্যতা তখন একটি মহৎ নাটকের পার্শ্বচরিত্রের ন্যায় একঘরে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। চতুঃসীমাবদ্ধ সংকীর্ণ পরিমণ্ডল হয় তখন তার স্থান। সংকীর্ণ বৃত্তের মধ্যে দেখা সাংস্কৃতিক বিকাশ তার পূর্ণাঙ্গ রূপ নয়। সমগ্র মানবসমাজের মধ্যে সংস্কৃতি ও সভ্যতা ছড়িয়ে দেয়া কর্ষিত ভূমিতে সবুজ শস্যের বীজ ছড়ানোর মতো মহৎ কাজ। যে সমাজ এই মানবিক দায়িত্ব গ্রহণ করে সেটাই পূর্ণাঙ্গ এবং সুসংগঠিত সমাজের মর্যাদা দাবী করতে পারে। আংশিক সাফল্য যে অসাফল্যেরই নামান্তর তার প্রমাণ বিশ্বের ইতিহাসে বিধৃত।

বৈষম্যপীড়িত সমাজের বিশেষ একটি শ্রেণীবৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ প্রাচীন মিশরীয়, গ্রীক, রোমান, মুসলিম প্রভৃতি সংস্কৃতি ও সভ্যতা অবক্ষয়, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে বিলুপ্তি হতেও আত্মরক্ষা করতে পারেনি। ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথাই ধরা যাক। আকাশ ও পৃথিবীর মালিক আল্লাহ; মানুষ তাঁর প্রতিনিধি। ইসলামের এই মূলনীতি অনুযায়ী বিশ্বের উপর সকল মানুষের অধিকার সমান। সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের এ নীতি মুসলিম শাসকশ্রেণী মেনে চলেনি। জ্ঞান ও বুদ্ধির চর্চাকে সীমার মধ্যে আবদ্ধ করলো তারা। একদিকে বৈষম্যপীড়িত সমাজ, অপরদিকে বুদ্ধিবৃত্তি পিঞ্জরাবদ্ধ। ফলে ইয়োরোপে শিল্পবিপ্লব এবং মুক্ত স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ হওয়ার সংগে সংগে বৈষম্যজর্জরিত মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইমারতটি ধসে পড়লো। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে প্রায় সমগ্র মুসলিম জগৎ ইয়োরোপের দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হলো। এখনও সে অবস্থার অবসান হয়নি। তৃতীয় বিশ্বের স্বাধীনতা একটি অন্তঃসারহীন নাম মাত্র। বৈষম্য অব্যাহত রেখে উন্নতি করা যায় না। তার প্রমাণ বাংলাদেশসহ বিশ্বের যাবতীয় মুসলিমপ্রধান দেশ। অপরদিকে, অত্যন্ত উঁচু মানের হওয়া সত্ত্বেও শিল্প-বিপ্লবোত্তর পশ্চিম ইয়োরোপীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা পৃথিবীকে দিয়েছে দু'দু'টি মহাযুদ্ধ। তারপরেও সংকট, উত্তেজনা, সংঘর্ষ প্রভৃতির বিরাম নেই। বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৈষম্য-বিভক্ত সমাজজীবনই এ অশান্তির মূল কারণ। তাই সংস্কৃতি ও সভ্যতার সবুজ শস্যবীজ পেশা, বর্ণ, ধর্ম, জাতি, নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার উপযোগী সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির প্রয়াসকে আমি পৃথিবীতে "ঈশ্বরের রাজত্ব" কায়েমের একমাত্র পথ মনে করি। লক্ষ্য ও পথ এখানে এক জায়গায় মিশে গেছে। কেননা, ঈশ্বরের কাছে মানুষের শ্রেণী-বর্ণ, ধনী-নির্ধন ভেদ নেই। তাঁর কাছে জাতি, ধর্ম-পেশা-আকৃতি-প্রকৃতি নির্বিশেষে সকল মানুষের একমাত্র পরিচয় তারা আদম সন্তান।

তাই ব্যক্তি স্বাধীনতাকে আমি আর্থ-সামাজিক বৈষম্যমুক্ত

সামাজিক স্বাধীনতা থেকে পৃথক করে দেখি না। আমার দৃষ্টিতে ব্যক্তি স্বাধীনতা একটি ভাবাবেগ বা রঙীন স্বপ্ন নয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপলব্ধির সাথে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। শেষোক্ত বস্তুগুলোর অভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রকৃতপক্ষে "স্বাধীনভাবে" মরা অথবা "স্বাধীনভাবে" দাসত্ব করার সনদ হয়ে দাঁড়ায়। দিন-রাত্রির একটি নির্দিষ্ট সময়সীমায় মধ্যে সাধ্যায়ত্ত শ্রম প্রয়োগের বিনিময়ে উক্ত বস্তুগুলোর প্রাপ্যতা যখন প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার হয়ে দাঁড়ায় তখনই শুধু মানুষ উঁচু তত্ত্বীয় চিন্তায় মনোযোগ দিতে পারে। নিয়মিত অভুক্ত, নিরক্ষর, নিরাশ্রয় এবং ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি তত্ত্বীয় চিন্তা করে না। নিয়মিত অভুক্ত ব্যক্তির কাছে আপ্তবাণী আসার দৃষ্টান্তও নেই। অভুক্ত, ভুখানাঙ্গা কোন ব্যক্তির পয়গম্বর বা অবতার হওয়ার কোনো কাহিনী আমরা ইতিহাসে পাঠ করি না। ইয়াহুদী পয়গম্বরদের প্রায় সকলেই ছিলেন রাজা অথবা উপজাতীয় প্রধান। তাই আমার দৃষ্টিতে মানব ধর্মের মধ্যেই বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ধর্মের অবস্থান। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'—বাংগালী কবির এ উক্তি সর্বকালে সর্ব-সমাজে সত্য। যে সমাজে মানবতার মর্যাদা রক্ষিত নয় সেখানে আনুষ্ঠানিক ধর্ম শুধু অর্থহীন যান্ত্রিক ক্রিয়া মাত্র, শ্রেণী-বৈষম্য, অত্যাচার, উৎপীড়ন প্রভৃতি অব্যাহত রাখার অস্ত্র। সমগ্র বিশ্বে মানবতা প্রতিষ্ঠা মানবসমাজের মহত্তম লক্ষ্য হওয়া উচিত। এ লক্ষ্য সাধনের পথে মানব সমাজ এগিয়ে যাচ্ছে কিনা মানুষের দ্বারা উদ্ভাবিত সমস্ত তন্ত্রমন্ত্র তার নিরিখেই পরীক্ষা করে দেখতে হবে। আমি সোভিয়েত মানবসমাজকে এ দৃষ্টিকোণ থেকেই লক্ষ্য করেছি।

সাত

১৯৮০ সালের ২৮শে আগস্ট বিকেলে ঢাকা ছেড়েছিলাম। কলকাতা বোম্বাই এবং তেহরান হয়ে পথ। তেহরান বিমান বন্দর ত্যাগ করার অল্পক্ষণ পরেই এক অপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়লো। বিমান উত্তর দিকে উড়ছে। ডান দিকের জানালা-সংলগ্ন সীটে বসে চেয়ে দেখি আকাশে সোনালী বর্ণচ্ছটা। তখনো সূর্যোদয় হয়নি। কিন্তু দিগ্বলয়ে সহস্র 'স্বর্ণউজলকিরণ তীর' নিক্ষেপ করতে করতে সে তার অগ্নিরথযাত্রাকে ক্রমে ক্রমে অধিক হতে অধিকতর প্রদীপ্ত করে তুলছিল। আমাদের নীচে কখনো পর্বতশৃঙ্গ, কখনো বা অবরোধকারী ঘন মেঘরাশি। অরুণালোকের মধ্যে অপূর্ব বিভায় দৃষ্টিগোচর হলো পর্বতচূড়া এবং মেঘের স্তূপ। মনে হলো শীতের সকালে আগুন পোহাচ্ছেন প্রকৃতি। সাদা মেঘের এমন অপরূপ বর্ণছটা আর কখনো দেখিনি। বিমানে বসে সূর্যোদয় দেখার অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম। সূর্যোদয়ের প্রত্যাসন্ন আগমন সংবাদ দিয়েছিল উজ্জ্বল একটি নক্ষত্র, সম্ভবতঃ শুকতারা। জানি না গ্রীকরা কেন তার নাম দিয়েছিল ভেনাস। ভেনাসের সৌন্দর্যই কি পরবর্তীকালে মূর্তিরূপ পেয়েছিল ভাস্করের হাতে। মনে হচ্ছিল, খুব কাছে থেকে ঝুলন্ত ঐ নক্ষত্রটি বুঝিবা আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

এ সময়ে রসভঙ্গ করলেন বিমানবালারা। ওঁরা তেহরান হতে সংগৃহীত ইরানী খানা পরিবেশন করলেন। ইরানী পরটা, মোরগ মুসল্লম, পোলাও প্রভৃতি ছাড়াও আরো নানা রকমের

উপাদেয় খাদ্য। কলকাতা ত্যাগের পরেও খানা দেয়া হয়েছিল। তুলনায় ইরানী খানা অনেক বেশী সুস্বাদু এবং খাদ্যগুণে সমৃদ্ধ। ঐ সাত সকালে কেন ও রকম উপাদেয় খানা খাওয়ানো হলো ভেবে পেলাম না। ও সময়ে আমরা নাস্তা খেতেও অভ্যস্ত নই। ভূরিভোজানটা আগাম হয়ে গেল।

মস্কো পৌঁছার আধ ঘন্টা মতো আগে বিমান তার স্বাভাবিক উচ্চতা (৪০/৪৫ হাজার ফুট) ছেড়ে ধীরে ধীরে নীচে নামতে লাগলো। আর একটি মনোরম দৃশ্য চোখে পড়লো। বরফাবৃত অবিচ্ছিন্ন গিরিশ্রেণীর মতো দেখাচ্ছিল নীচের ঘন মেঘ। কে বলে, শূন্য মানে নিছক শূন্যতা? পার্থিব অস্তিত্বের চেয়ে আকাশী অস্তিত্ব কম সত্য ও সুন্দর নয়। সূর্য তখন মেঘে ঢাকা পড়েছে। কিন্তু আকাশে আলো ছিল। সহসা ঘন মেঘের বিশাল স্তূপ প্রবল ঝাঁকুনিতে ভেদ করে বিমান নীচের স্তরে নেমে আসলো। সংগে সংগে সব কিছু পরিস্কার—সদ্যস্নাতা রূপসীর মতো নীচে আমাদের পরিচিত নিসর্গ। বাংলাদেশের মতোই অবিচ্ছিন্ন সবুজের মেলা। স্থানে স্থানে নদী-নালা খাল-বিল। তখনো গ্রামে বিজলী বাতি জ্বলছে। একে একে পল্লীর ঘর-বাড়ী এবং পরে শহরতলিও নজরে এলো। মস্কো সময় সকাল ৬টা ৫ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় ৯টা ৫) মস্কোর একটি বিমানবন্দরে অবতরণ করলো আমাদের বিমান। আমরা যে কোন উন্নত দেশের সংগে তুলনীয় নই তার প্রথম প্রমাণ পেলাম বিমানবন্দরেই। কলকাতা, বোম্বাই, তেহরান প্রভৃতি বিমান বন্দরের কোনটিতে পাঁচ সাতটির বেশী অপেক্ষমান বিমান দেখিনি। মস্কোর ঐ বিমান বন্দরে আমি অসংখ্য যাত্রিবাহী বিমান অপেক্ষমান দেখতে পেলাম। আমাদের দেশে এত অসংখ্য ট্যাক্সিও এক সংগে অপেক্ষমান কোথাও দেখা যায় না। এ্যারোফ্লোত যে পৃথিবীর বৃহত্তম এয়ারলাইন বিমানবন্দরে অপেক্ষমান অগণিত বিমান বুঝিবা তারই সাক্ষ্য দিচ্ছিল। ড্যাকোটার যুগ থেকে বিমানে চড়ছি।

প্রায় ১৫ ঘন্টার মধ্যে ১১ ঘন্টার বেশী বিমানে ছিলাম। সেদিনের মতো সচ্ছন্দ ওড়া আর কখনও উড়েছি বলে মনে হয় না। যতটুকু প্রয়োজন বিমানে ঘুমিয়েছিলাম। রুশ বিমান চালকদের এটাও এক কৃতিত্ব।

ঢাকা থেকে আমার সহযাত্রী ছিলেন অধ্যাপক কবীর চৌধুরী। দমদমে উঠেছিলেন কবি সুভাস মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী। ওঁরা তিন জনই মস্কো হয়ে মঙ্গোলিয়ায় যাচ্ছিলেন। মস্কো বিমান বন্দরে ঐ সাত-সকালে বেশী ভিড় ছিল না। দরজা পেরিয়ে স্টেশন ঘরে স্যুটকেসের জন্য অপেক্ষা করছি, এমন সময় চেয়ে দেখি, নিরাপত্তা-সীমার বাইরে অপেক্ষা করছেন আমাদের দূতাবাসের শিক্ষা-দপ্তর প্রধান প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক ডক্টর আলাউদ্দীন আল আজাদ। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে একজন রুশী মহিলা। নিরাপত্তা বিভাগের সামান্য ফর্মালিটি সেরে ওঁদের সংগে মিলিত হলাম। ওঁরা উভয়ে আমাদের স্বাগত জানাতে এসেছেন। ২৯শে আগস্ট আমাদের দেশে রীতিমতো গরম। মস্কোর উপকণ্ঠে, এখানে কনকনে শীত। জোরে বাতাস বইছে। উভয়ের গায়ে ওভারকোট। ডক্টর আজাদ পুরনো বন্ধু। তিনি সম্ভবতঃ রুশ সূত্রেই আমাদের আগমন সংবাদ পেয়েছিলেন এবং নিজে থেকেই এসেছিলেন। মহিলাকে পাঠিয়ে ছিল সোভিয়েত লেখক সংঘ। মহিলা আমাকেই খুঁজছিলেন। কবীর চৌধুরী, সুভাস মুখার্জি, আলাউদ্দীন আল আজাদের সংগে মহিলার পরিচয় ছিল। ওঁরা পরিচয় করিয়ে দিলেন। মহিলার নাম নাতাশা গ্লাম্বোৎস্কায়া—সংক্ষেপে নাতাশা—অবিবাহিতা, বয়স সাতাশ-আটাশ, মস্কো রেডিয়োর জন্য বাংলা স্ক্রিপট লেখেন, লেখক সংঘের দাওয়াতে আগত বাংগালী অতিথিদের দোভাষীর কাজ করেন এবং ইনস্টিটিউটে অনুন্নত দেশের অর্থনীতি বিষয়ে পড়াশোনা করেন। নাতাশা মোটামুটি ভালো বাংলা বলেন। ইংরেজীও বলতে পারেন। হিন্দীর কাজও চালাতে পারেন। মস্কো-লেনিনগ্রাদে নাতাশা আমার দোভাষীর কাজে নিযুক্ত

ছিলেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম, বুড়োরা তরুণ-তরুণীর জন্য আপদ—ইংরেজীতে যাকে বলে 'বোর' তাই। বুড়োরা সাধারণতঃ নিজের কথা বলতেই ভালোবাসে, নিজে কথা শুনতে চায় না। বাংলা ভাষায় একটা জুতসই জবাব দিতে না পেরে সে মাথার এক গাদা ইষৎ-সোনালী চুল ঝাঁকিয়ে হেসে বলেছিল, না না। পরে দেখেছি, আমার মতো বৃদ্ধের সান্নিধ্য তাকে খুব একটা বিরক্ত করে নি। আমার প্রতি সে সযত্ন দৃষ্টি রেখেছে। কন্যার বয়সী নাতাশাকে আমি তুমি বলতাম। সে আমাকে আপনি বলতো।

ওঁরা আমাকে প্রথমে ওঠালেন পিকিং হোটেলে। আমি হোটেলের ঐ নাম দেখে হেসে মন্তব্য করেছিলাম, পিকিং-মস্কো সম্পর্কতো এখন প্রায় আদা-কাঁচকলার মতো, এখনও ঐ নাম। সে বললো, ওটা ঐতিহাসিক নাম হয়ে গেছে। আমি মনে মনে ভাবলাম, মানবজীবনের মতো রাষ্ট্রীয় জীবনেও কোনো কিছুই ফাইনাল নয়। হয়তো কোনো সময়ে মস্কো-পিকিং সম্পর্ক আবার স্বাভাবিক এবং বন্ধুত্বপূর্ণ হবে ঃ যে বিপ্লবে মস্কোর আগাগোড়া সক্রিয় সহযোগিতা ছিল, পিকিং হোটেল নামের মধ্যে থাকলোই বা তার স্মৃতি। কিন্তু এ-হোটেলের গরম পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় গোলযোগ দেখা দিল। তাই একদিন পরেই আমার বাসস্থান হলো ইউক্রেন হোটেল। ওটাতে বিদেশী টুরিস্ট এবং অভ্যাগতদের প্রচণ্ড ভিড়। জাপানী বিমানবালাদেরও দেখলাম ওটাতে। স্থানটিও চমৎকার। হোটেলের সামনে রাস্তার ওপাশে সুন্দর বাগান। নানা জাতের ফুটন্ত পুষ্পশোভিত ঐ ছোট পার্কটির সামনে মস্কো নদী। বাগান ঘেঁষে ডানদিকে নদীর উপরে ডবল ডেকার পুল। উপর দিয়েও যানবাহন চলে, নীচে দিয়েও চলে। হোটেলের রোয়াকে দাঁড়িয়ে নদীতে ভাসমান লঞ্চ-স্টীমার দেখা যায়। ওপারে কোনো এক মিনিস্ট্রির বহুতল বাড়ী। নদীর উভয় পাড়ই বাঁধানো। পুরনো

স্মৃতি মনে পড়লো। কৈশোরে ঢাকায় পড়াশোনা করেছি। সেকালে বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরও ওরকম সুন্দরভাবে বাঁধানো ছিল। আমরা এবং আমাদের শিক্ষক ও উকিল মোক্তারগণ বাকল্যাণ্ড বাঁধ নামে পরিচিত ঐ বাঁধে সকালসন্ধ্যায় বেড়াতাম। নদীতে ভাসমান অগণিত বজরা এবং গহনার নৌকো, ওপারে জিঞ্জিরার বাজার। বাঁধ ঘেঁষে মস্ত বড় করোনেশন পার্ক এবং বিশ্রামাগার। এই প্যার্কে সমবেত বিশাল জনতাকে উদ্দেশ করে বক্তৃতা দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বজরায় বাস করেছিলেন তিনি। এখনও মনে পড়ে সিম্পসন রোড এবং ওয়াইজঘাট রোডের বাঁধানো ঘাট দু'টির কথা, বর্ষার স্বচ্ছতোয়া বুড়ীগঙ্গায় অগণিত নারী-পুরুষ সকালে স্নান করতেন। আমিও সাঁতার কাটতাম। সেকালের একটি অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার কথা এখনো মনে পড়ে। সাঁতার কেটে ওয়াইজঘাটের বাঁধানো ঘাটে উঠেছি। পরনে অল্প দামী লুংগী, কাঁধে গামছা, উদোম গা বেয়ে বারিবিন্দু ঝরছে। সূর্য উঠছে। সহসা এক অপরিচিত উড়ে শ্রমিক আমার পায়ের বুড়ো আঙ্গুল থেকে এক ফোটা জল নিয়ে পান করলো। আমি কি করো কি করো বলে তাকে বাধা দিলাম। সে ভক্তিগদগদ কণ্ঠে এক গাল হেসে বললো, আপনি ব্রাহ্মণ আছেন। আমার গলায় পইতা ছিল না। নিঃসন্দেহে সে ভুল করেছিল। তার ভুল ভাঙ্গালে হয়তো তাকে গুরুতর রকমের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, তাই কথা না বাড়িয়ে বাসায় ফিরলাম। আজ পরিণত বয়সে ভাবছি, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হতাশ মানুষ পুণ্যলোভে কি না করতে পারে। নরহত্যা হতে নরপূজা পর্যন্ত সবকিছুই, সবকিছুই তার কাছে মোক্ষলাভের পাথেয়। আজ স্বভাবকবি গোবিন্দ দাসের স্মৃতিসহ শত স্মৃতি বিজড়িত বাকল্যাণ্ড বাঁধ কাঁচা মালের বাজার।

মস্কো নদীর সানবাঁধানো তীরে স্নানঘাট আছে কিনা

জানিনা। আশি লাখ লোক এবং অগণিত কল-কারখানার শহর মস্কো। একালে হয়তো কেউ ঐ নদীতে স্নান করতে নামে না। কেননা আগেই বলেছি জল ঘোলা এবং তৈলাক্ত। কিন্তু অন্য কোনো আবর্জনা ভাসমান দেখিনি। জনস্রোত প্রবহমান সত্ত্বেও মস্কোর সড়ক অত্যন্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। নদীতে চলমান লঞ্চ-স্টীমার চোঙ্গা বাজিয়ে তার শান্তি ভঙ্গ করে না। সড়কেও ভেঁপু বাজায় না মোটর গাড়ী।

হোটেলের বিশাল ভোজনালয়ে খাওয়ার সময় বিচিত্র রং এবং বিচিত্রবেশী ও ভাষাভাষী নরনারী দেখেছি। মঙ্গোলীয়, জাপানী, আফ্রিকান হাবশী সকল রকমের মানুষ এক জায়গায় বসে খাচ্ছেন। বিভিন্ন দেশ ও জাতির ছাত্রছাত্রী, ডেলিগেশন, খৃস্টান ধর্মযাজক, মাথায় রুমাল বাঁধা আরব প্রভৃতি নানা রকম ও বয়সের বিদেশী নরনারীর সাথে একত্রে এক টেবিলে বসে খাচেছন রুশী মানুষ। আফ্রিকার স্থূলওষ্ঠ কোঁকড়া চুল আবলুস-কালো হাবশী এবং দীর্ঘকায় সুশ্রী শ্বেতবর্ণ ফিন-ল্যাণ্ডবাসীর মর্যাদা রুশ নাগরিকের কাছে সমান। সকলের একটি মাত্র পরিচয়, তারা মানুষ। আমার দোভাষী মেয়েটি বিয়েলো-রুশীয়। সে এবং আমি টেবিলের একদিকে। বিপরীত দিকে বসেছেন এক বৃদ্ধ রুশ দম্পতি, ওঁরা ওঁদের রুচি অনুযায়ী খাদ্য বেছে নিয়েছেন। আমরা আমাদের পছন্দমতো আহার্য নিয়েছি। আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলছি। ওঁরা ওঁদের মাতৃভাষায় কথা বলছেন। আল মাগরিবের অধিবাসীরা আরবী ভাষায় কথা বলছেন। অনেকের মুখে আঞ্চলিক ভাষাও শুনেছি। বিশাল ডাইনিং হল মুখর। কিন্তু কেউ বিরক্ত নয়। কৌতুকের সংগে লক্ষ্য করলাম, বুড়োটা বুড়ীর পাত থেকে এটা ওটা নিজের কাঁটায় উঠিয়ে আপন মুখে পুরছেন। বুড়ী কিন্তু বুড়োর বাসন থেকে কিছুই নিচেছন না। দৃশ্যটি বেশ লাগলো। আমাদের দেশে স্বামীর এঁটো খাওয়ার রেওয়াজ ছিল, এখনো বোধ হয় আছে। কিন্তু সেটা

প্রেমের ব্যাপার নয়। দাসীর আনুগত্য। ঐ দম্পতিকে দেখে মনে হলো বৃদ্ধ বয়সেও ওঁরা প্রেমিক-প্রেমিকা। একজন আফ্রিকান মহিলাকে দেখেছিলাম। যুবতী, বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। ঘনকৃষ্ণ চুল শিরশীর্ষে চূড়ো করে বাঁধা। তাম্রকালো রং। বেশ লম্বা, প্রায় ছ'ফুটের কাছাকাছি। চমৎকার স্বাস্থ্য ও মুখশ্রী। 'কালোর মধ্যে আলোর নাচন' ঐ মহিলার মধ্যে লক্ষ্য করলাম। এমন সুন্দরী মহিলা আমি খুব কম দেখেছি। শ্বেতবর্ণ ইয়োরোপীয়ান কোন্ ছার। মনে পড়লো কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত পদটি, 'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যারে আলোর নাচন।' মহিলা সম্ভবতঃ ভারতীয় এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের ন্যায় সংকর-জাতির মানুষ। আরব-হাবশী কিংবা ইয়োরো-আফ্রিকীয় মিশ্রণও হতে পারে। একদিন কয়েকজন অতি হ্রস্বকায় তরুণ-তরুণী দেখেছিলাম, সম্ভবতঃ ছাত্রছাত্রী। ওরা শোরগোল করে ঢুকলো। বেশ চটপটে। রাশিয়ায় এসেছে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য। ওরাই কি আফ্রিকার বামন মানুষ? প্রশ্নটা মনেই রয়ে গেল। সুদান, ঘানা, মালি প্রভৃতি দেশের কারো কারো সংগে আলাপ হলো। ওঁরা আরবী বলেন, কেউ কেউ অল্পবিস্তর ইংরেজী জানেন। আমাদের মতো অগ্রসরতা-অনগ্রসরতা প্রভৃতি নানা দোষগুণে মিলিয়ে মানুষ। একদল জাপানী তরুণ-তরুণীর চালচলন দেখে মনে হলো ওরা খুবই অগ্রসর। তবে কিনা মানুষের অগ্রসরতা-অনগ্রসরতার প্রমাণ তার পোশাক এবং বোল-চাল নয়, তার মন।

বয়স সত্তুর। মস্কোতে আছি। দেশে বসে এ্দেশের ক্লিনিকের নাম শুনেছি। স্বাস্থ্যটা পরীক্ষা করিয়ে নেয়ার ইচ্ছে হলো। বলতেই ওরা রাজী হলেন। কিন্তু এটাও জানালেন যে, পরীক্ষায় গলদ ধরা পড়লে সরাসরি হাসপাতাল অথবা সুদূরের কোন স্বাস্থ্যনিবাসে স্থান নিতে হবে। কম পক্ষে তিন সপ্তাহ বা মাসখানিকের ব্যাপার। তা'হলে স্বাস্থ্যোদ্ধার হয়তো হবে, কিন্তু দেশ দেখা হবে না। একে বৃদ্ধ বয়স, তার উপর শীত-

প্রধান দেশের উপযোগী পরিধেয় বস্ত্র আমার ছিল না। ভ্রমণের ধকলটা সইবে কি না দেখে নেয়া দরকার। সাতপাঁচ ভেবে সম্মত হলাম। লেখক সংঘের সদস্য সংখ্যা কয়েক হাজার। তাদের জন্য একটি আলাদা ক্লিনিক আছে। মস্কো পৌঁছার তৃতীয় কি চতুর্থ দিনে ঐ ক্লিনিকে গেলাম। গাছপালা ঘেরা লেখক সংঘের অনাড়ম্বর একতলা অফিস বাড়ীর মতো ক্লিনিকটিও সবুজে ঘেরা। বেসমেন্টসহ তিনতলা বাড়ী। বেশ বড়। একটি ছোটখাটো হাসপাতাল বলা যায়। ডাক্তার বসেন বেসমেন্টর উপর একতলায়। অধিকাংশ কর্মী ও টেকনিসিয়ান মহিলা। ডাক্তার একজন সদাহাসিমুখ যুবক। বয়স পঁয়ত্রিশের মতো। ইংরেজি এক বর্ণও জানেন না। গোঁফ রাখেন, চশমা পরেন। ছোট্ট ঘর। একদিকে রোগী পরীক্ষার শয্যা। টেবিলে দু'টি টেলিফোন। অবিরত বাজছে। একটা ছাড়েন, অন্যটা ধরেন। আমাকে প্রাথমিক পরীক্ষার কাজ করার মধ্যেও কয়েকবার বাজলো। বেশ রসিক লোক ডাক্তার। ফোনের ক্রিং ক্রিং আওয়াজ তাকে বিরক্ত করে না। ক্লিনিকের বিভিন্ন শাখার উপর নির্দেশাত্মক ছাপানো ফরমের প্রয়োজনীয় স্থানে টিক দিচ্ছিলেন এবং সই করছিলেন। তার মধ্যেও টেলিফোন বাজে। আমার দিকে চেয়ে হেসেই ফেললেন। আমাদের দেশে ফোন ধরার জন্য সম্ভবতঃ আলাদা লোক থাকতো, থাকতো তার জন্য আলাদা ঘর। সেদেশে এরকম আমীরানা ব্যবস্থা, এমন কি পিয়ন চাপরাশিও দেখলাম না। প্রয়োজনের সময় ডাক্তার নিজেই সীট ছেড়ে উঠে যাচ্ছেন অন্য কামরায়।

রক্ত, মলমূত্র, কার্ডিয়োগ্রাফ, পেটের এক্সরে প্রভৃতি নানা পরীক্ষায় দিন তিনেক কাটলো। ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে চূড়ান্ত রিপোর্ট পাওয়া গেল। ডাক্তার সহাস্যে রুশ ভাষায় অল ক্লিয়ার জানালেন। বললেন, সত্তুর বছর বয়সে আপনি যতটা ভালো আছেন ও বয়সে এ দেশের লোকও তার চেয়ে বেশী ভালো থাকে না। আশ্চর্য ব্যাপার, জলবায়ুর প্রভাবেই কিনা জানি

না, পরীক্ষায় দেখা গেল আমার ডায়াবেটিসের প্রকোপও যেন কিছুটা কমেছে। নাস্তার আগে দেশে রক্তে শর্করার ভাগ ছিল ১৩০-এর মতো, এখন দেখলাম ১০৫। শর্করা জাতীয় খাদ্য কম গ্রহণ করার জন্যও এটা হতে পারে। রুশী ডাক্তারও আমাকে প্রতিদিন ডায়াবিনিস বড়ি খেতে বললেন, বন্ধ করলেন না। পি.জি-র ডাইরেক্টর ডক্টর নুরুল ইসলাম আমাকে পরীক্ষা করে বলেছিলেন, আপনার হৃদরোগ দেখছি না। কিন্তু ডায়াবেটিস এমন একটি ব্যাধি যা থেকে হৃদরোগসহ আরো বহু রোগ হতে পারে। তখন আমি প্রায়ই বুকের চিনচিনানি বেদনায় ভুগতাম। ডক্টর নুরুল ইসলাম রোজ এক বড়ি ডায়াবিনিসের দুই-তৃতীয়াংশ খেয়ে রক্তে শর্করার ভাগ ৮০-৮৫তে নামাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। একই মত প্রকাশ করেছিলেন ব্রিটেনে কনসালটান্ট ফিজিশিয়ান আমার পুত্র ডাক্তার নুরুজ্জামান। মস্কোর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলও ওঁদের সিদ্ধান্তকেই বহাল রাখলো, কিন্তু দেশের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ব্রিগেডিয়ার মালেকসহ আরো দু'একজন খ্যাতনামা ডাক্তার আমাকে দীর্ঘদিন ধরে পার্সেন্টিন, সেডা পার্সিনন্টিন, সিগোনন্টিন, ইণ্ডেরাল প্রভৃতি ঔষধ প্রচুর খাইয়ে ছিলেন। হতে পারে আমি তখন প্রকৃতই হৃদরোগে ভুগছিলাম। কিন্তু আমার আত্মীয় ডাক্তার ডবল এম.আর সি.পি, নুরুজ্জামান জানিয়েছিলেন, আমাদের দেশে নাকি প্রকৃত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ নেই। বিশেষজ্ঞ হতে নাকি এম.আর.সি.পি. করার পরেও বিলেতী ডাক্তারকে কমপক্ষে পাঁচ বছর ট্রেনিং নিতে হয়।

ক্লিনিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফাঁকে ফাঁকে মস্কো শহর এবং শহরতলি ঘুরে ফিরে দেখছিলাম। অসংখ্য ছোটখাটো পাহাড় এবং তার নীচের সমতলভূমি নিয়ে বিশাল মস্কো শহর। প্রাচীন হলেও নতুন পরিকল্পনায় শহরটিকে সুদৃশ্য ও সুন্দর করে তোলা হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর রুশ সাহিত্যে মস্কোর রাস্তাঘাট এবং জীবন-যাত্রার যে বিবরণ পাই আজকের মস্কো তা নয়। সেকালের মস্কোবাসীরা যদি কোনো ঐন্দ্রজালিক শক্তি বলে পুনরায় সশরীরে

উপস্থিত হতে পারতেন তা'হলে তাঁরাও হয়তো আজকের মস্কো দেখে বিস্মিত হতেন। পুরনো শহরও আছে—কিন্তু কতটুক আছে তার। ক্রেমলিন অঞ্চল এবং অন্যত্রও পুরনো মস্কোর যতটুকু দেখেছি তার মধ্যে অপ্রশস্ত গলি আছে, আছে ওয়ানওয়ে সড়কও, কিন্তু অপরিচ্ছন্নতা নেই, নেই ভাঙ্গাচোরা খানাখন্দ, গর্ত এবং দুর্গন্ধময় আবর্জনাস্তূপ। নতুন পরিকল্পনায় তৈরী প্রশস্ত বুলেভার বহু। ওঁরা শহরের গাছপালা কাটেন বলে মনে হলো না। কাটলেও পরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন চারা লাগান। বাগান ও গাছপালাশোভিত অসংখ্য সুদৃশ্য পার্ক শহরে। শহরতলির নতুন বহুতলা আবাসবাটি ঘিরেও বাগান। ওঁরা ফুল ফল দু'টোই ভালোবাসেন, ফুলের তোড়ার অসম্ভব চাহিদা। আমাদের ঢাকার বন্ধু অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা কর্ম উপলক্ষ্যে মস্কো-বাসী, তার সংগে ফ্রী মার্কেটে গিয়েছিলাম। একটি ফুলের তোড়া সাত রুবলও বিক্রি হতে দেখেছি। তরমুজ ওদের খুবই প্রিয়। অনেককে দু'তিনটি করেও কিনে নিয়ে যেতে দেখলাম। ফ্রী মার্কেটে আমাদের দেশের মতো দামদস্তুর চলে। বেগুন, শসা, টমাটো, বাঁধাকপি, ডাল, আলু, সীম, কাঁচা লঙ্কা প্রভৃতি আমাদের অতি পরিচিত জিনিসও দেখলাম। সরকারী দোকানে সব কিছুর দাম নির্দিষ্ট এবং অনেক কম। সরকারী দোকানে প্রচণ্ড ভিড়, কিউ প্রায় লেগেই থাকে। ফ্রী মার্কেটেও কোনো কোনো জিনিষের জন্য—বিশেষ করে ফুলের জন্যে কিউ লাগাতে হয়! বুঝলাম মস্কোবাসীদের হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ আছে। ফ্রী মার্কেটের বিক্রেতারা দূরদূরান্তের গ্রাম থেকে পণ্যসম্ভার নিয়ে আসে। এক বুড়োর চেহারা দেখে মনে হলো তিনি মধ্য-এশিয়াবাসী।

মস্কোর যানবাহনের মধ্যেও সোভিয়েত ইউনিয়নের সমৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়। ট্রাক, বাস, ট্রলি, ট্যাক্সি, ভূগর্ভস্থ মেট্রো (রেলগাড়ী) প্রভৃতি সব রকমের পাব্লিক ট্রান্সপোর্ট আছে। নেই শুধু আমাদের অতি পরিচিত গায়ের জোরে চালানো রিকশা। বোধ

করি মানুষ কর্তৃক মানুষ বহনের এ প্রথাটাকে তাঁরা সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনিবার্য অবিচ্ছেদ্য অংশ জ্ঞান করেন না। প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির গর্বে গর্বিত আমাদের সব দেশ থেকে এ প্রথাটা রপ্তানি করে ইয়োরোপীয় মানুষকে ধর্ম-কর্ম ও আধ্যাত্মিকতায় দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা কেন এখনো হচ্ছে না, তাই ভাবছিলাম।

মস্কোর যানবাহনে ভাড়া লাগে নাম মাত্র। মেট্রোর ভাড়া অবিশ্বাস্য রকমের কম। পাঁচ কোপেকে বহুদূর যাওয়া যায়। ট্যাক্সি ছাড়া অন্য কোন যানবাহনে পয়সাকড়ি নেয়ার লোক নেই। একটা বাক্স থাকে। ওটার ছিদ্রমুখে পয়সাটা ফেলে দেয় যাত্রী। মেট্রো স্টেশনেও এ ব্যবস্থা। গাড়ীতে চড়ার দরোজায় বাক্সটি রাখা। পয়সা ফেলুন এবং চড়ুন। মস্কোর মেট্রো সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলার আগ্রহ দমন করতে পারছি না। ভূগর্ভস্থ মেট্রো স্টেশনগুলোর নির্মাণকৌশল এবং সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। ফ্রেসকো পেন্টিং থেকে শুরু করে শ্বেত ও কালো মর্মর পাথর এবং পিতল তামা কাঁসা প্রভৃতি ধাতব পদার্থে উৎকীর্ণ ভাস্কর্যের আশ্চর্য নিপুণ সমাবেশে সুন্দর প্রতিটি মেট্রো স্টেশন। সে এক অন্য জগৎ। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাধীনেই সম্ভবতঃ ভূগর্ভস্থ ক্ষণিকের বিশ্রামা-গারকে এরূপ স্বর্গতুল্য করে গড়া সম্ভব। ভারতের কোন্ মুসলিম বাদশাহ যেন তাঁর কোন্ কীর্তিকে (নাকি কাশ্মীরকে!) ভূস্বর্গ বলেছিলেন। মস্কোর মেট্রো দেখলে তিনি অবশ্যই সেটাকে পাতাল স্বর্গ বলতেন। কিন্তু কোনো একটি মেট্রো স্টেশনের বিচিত্রন এবং অলঙ্করণ অন্য কোনটির অবিকল অনুকরণ নয়। সমাজতন্ত্র কর্মান্তে শ্রান্ত-ক্লান্ত সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের চিত্তবিনোদনের জন্য তার দৈনন্দিন চলার পথের বিরাম স্থানগুলোকে এরকম মনোরম করে গড়ে তুলেছে। যৌবনে কার্ল মার্কসের থিওরি-অব-সারপ্লাস ভ্যালু পাঠ করেছিলাম। উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব খণ্ডন অথবা তার মারাত্মক

ভুলত্রুটি দেখানোর চেষ্টা 'ডাস ক্যাপিটাল' প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই চলছে। এ বিষয়ে বইয়ের অভাব নেই। বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের বক্তব্য বোঝার চেষ্টাও করেছি। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল না। মস্কো মেট্রো সিস্টেম দেখার পর কার্ল মার্কাসের থিওরি অব্ সারপ্লাস ভ্যালুর মৌলিক সারবত্তা প্রথম উপলব্ধি করলাম। কৃষক-শ্রমিকগণ কর্তৃক উৎপাদিত উদ্বৃত্ত মূল্য তছরূপ করে জার-জারিনা, কাউণ্ট-কাউণ্টেস, পারিষদ-সভাসদ এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা বিলাস-ব্যসনে অতিভোজনে পানে ব্যভিচার-অনাচারে জীবন যাপন করতেন। কিন্তু দেশের রাস্তাঘাট ছিল কর্দমাক্ত, জনজীবন ছিল দুর্বিসহ দারিদ্র্যপীড়িত। ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব ঐ বৈষম্যমূলক পদ্ধতির অবসান ঘটিয়েছে। তিন চার বৎসরব্যাপী গৃহযুদ্ধের সময়টা বাদ দিলে মাত্র ষাট বছর। মাত্র ষাট বছরের মধ্যে মস্কোর সাধারণ মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত উত্তম বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। নান্দনিক তৃষ্ণা নিবারণ এবং অবসর সময়ে চিত্তবিনোদনের জন্য ভূপৃষ্ঠে অসংখ্য বাগান পার্ক বুলেভার প্রভৃতি রচনা ছাড়াও ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ পথে ভ্রমণের সময়টাকে আনন্দময় করে তোলার জন্য কি যত্নই না নেয়া হয়েছে। সম্রাট শাজাহান তাঁর পত্নীর স্মৃতিকে অক্ষয় করার জন্য জনসাধারণের কষ্টার্জিত অর্থে তাজমহল তৈরী করেছিলেন। আকবর তাঁর নিজের খেয়ালখুশি চরিতার্থ করার জন্যে তৈরী করেছিলেন ফতেপুর সিক্রি। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্যক্তিবিশেষের স্মৃতি অম্লান অথবা কারো খেয়ালখুশি চরিতার্থ করার জন্য জনগণ কর্তৃক উৎপাদিত সম্পদের অপব্যবহার করেনি। সে জনগণ কর্তৃক উৎপাদিত উদ্বৃত্ত মূল্য সমগ্র সমাজের কল্যাণ ও সুখের জন্য ব্যয় করছে। সারপ্লাস ভ্যালু সমগ্র সমাজের কল্যাণের জন্য নিয়োগ করলে দেশের কোন একটি ব্যক্তিও যে তার ফললাভ থেকে বঞ্চিত হয় না মস্কোর মেট্রো এ সত্যও প্রথম আমার কাছে দৃষ্টান্তরূপে প্রমাণ করলো। সুড়ঙ্গপথে চলাচলের এই অপূর্ব ব্যবস্থার পরেও

ভূপৃষ্ঠে হাজার হাজার ধাবমান প্রাইভেট কার, ট্যাক্সি এবং অন্যান্য যানবাহন আমাকে আমার অজানিতেই যেন জানিয়ে দিল, সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষ এখন অভাব অনটন মুক্ত। ওরা সুখী জীবন যাপন করছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষ এখন এ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটির অন্তর্ভূক্ত। হয়তো এখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারে নি। কিন্তু তুলনার সময় এ সত্যটি স্মরণ রাখতে হবে যে, পুঁজিবাদী পশ্চিমী বিশ্ব কমপক্ষে দু'শ বছর এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আফ্রিকা এই তিন তিনটি মহাদেশের উপর আধিপত্য এবং শোষণ চালিয়েছে। তারপরেও সকল মানুষ পুঁজিবাদী এ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটির বেনিফিশিয়ারি নয়। পর্বতপ্রমাণ বৈষম্য ছাড়াও রয়েছে বেকার সমস্যা এবং অর্থনৈতিক জীবনে তেজিভাব ও মন্দার শনিচক্র।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজজীবনেও কাজের প্রকৃতি, কর্মীর যোগ্যতা এবং গুণাগুণ অনুযায়ী আয়-ব্যয়ের তারতম্য আছে। কিন্তু গুণ ও যোগ্যতা অর্জনের মৌলিক সুবিধা সকল মানুষের জন্য সমান। পশ্চিমী পুঁজিবাদী বিশ্বে অধিক অর্থ উপার্জনকারী বিত্তবান শ্রেণীর পুত্রকন্যাদের শিক্ষাদীক্ষা, চিকিৎসার আলাদা বেসরকারী এবং ব্যয়বহুল সরকারী ব্যবস্থা আছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা নেই। অবশ্য আদিকালের কম্যুনিজম সেদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। ওরা কম্যুনে বারোয়ারি খানা খায় না। ওরা পারিবারিক জীবনযাপন করে এবং যার যার বাসস্থানে আহার করে এবং নিদ্রা যায়। বড়-ছোট, অভিজাত-অনভিজাত নির্বিশেষে সব হোটেল-রেস্তোরাঁয় মৌলিক আহার্য দ্রব্য, যেমন রুটি, মাখন, ডিম, দুধ, মাংস, বিয়ার, মিনারেল ওয়াটার (ঝরনার পানি) প্রভৃতির দাম সমান। সুতরাং অদক্ষ সাধারণ শ্রমিকও যেকোনো হোটেলে খেতে পারে, কোনো দিক থেকেই বাধা নেই।

ওরা সমাজতন্ত্রের মৌলিক মানবিক লক্ষ্যাবলী পূরণ করেছে।

অনাহারী, বিবস্ত্র এবং ভিক্ষুক মানুষ সেদেশে নেই, নেই নিরক্ষর লোকও। অধিক উপার্জনকারী গুণী ব্যক্তিগণ উপার্জিত অর্থ পারিবারিক বিলাস-ব্যসনে ব্যয় করতে পারেন, কিন্তু উত্তরাধিকারীদের জন্য স্থাবর সম্পত্তি রেখে যেতে পারেন না। তাই মানুষের শ্রমে উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে যে উদ্বৃত্ত মূল্য আরোপিত হয় তার সবটাই ঘুরে ফিরে জনগণের ইহজাগতিক সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং সাংস্কৃতিক জীবন উন্নয়নের কাজে ব্যয় হয়। বিপ্লবের শুরু থেকেই আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে সশস্ত্র শত্রুতা করে আসছে। আত্মরক্ষামূলক অস্ত্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে না হলে সোভিয়েত দেশের মানুষ আরো অধিক প্রাচুর্য ভোগ করতে পারতো।

অধ্যাপক আর. এইচ. টনি এক সময়ে ব্রিটেনবাসীর আর্থিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সেদেশের সর্বস্তরের মানুষের জন্য সমান রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা সৃজনের সুপারিশ করেছিলেন। গণতন্ত্রের মাতৃভূমি বলে পরিচিত ও প্রশংসিত ব্রিটেন এখনও সে লক্ষ্য পূরণ করতে পারেনি। উৎপাদনের সকল উৎস ও উপাদান যৌথ সামাজিক মালিকানায় এনে মাত্র ষাট বছরের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন উক্ত সর্বনিম্ন মানবিক লক্ষ্য—যা যিশু খৃষ্ট এবং হজরত মোহাম্মদেরও (দঃ) লক্ষ্য ছিল—পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। মানব ধর্ম এবং সমাজতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন ধর্ম।

রুশ জনগণের সাংস্কৃতিক চেতনা এবং সুরুচির প্রমাণ সর্বত্র। প্রয়াত মহৎ কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী এবং বীরদের নামে অসংখ্য ছোটবড় মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠা এবং চৌরাস্তার সংগমস্থল স্কোয়ারে (মোগল আমলের চাঁদনি চক) ওঁদের প্রস্তর অথবা ধাতব প্রতিকৃতি স্থাপনকে ওরা জাতীয় কর্তব্যরূপে গ্রহণ করেছে। গোর্কীর নামে পরিচিত রাস্তাটিই সম্ভবতঃ মস্কোর সবচেয়ে প্রশস্ত এবং দীর্ঘ সড়ক। লেলিনের নামে উৎসর্গীকৃত সুবৃহৎ

মিউজিয়ম ও লাইব্রেরী সমগ্র বিশ্বে সুপরিচিত। পুশকিন, মায়াকভস্কি, শেকভ, গোর্কী, লেনিন, তলস্তয় প্রমুখের প্রস্তরমূর্তি স্কোয়ারে স্কোয়ারে। মায়াকভস্কি পুরনো মস্কোর একটি গলিতে বসবাস করতেন। ছোটখাট বাড়ী। বাড়ীটি এখন মায়াকভস্কি মিউজিয়ম। একান্ত প্রয়োজনীয় সংস্কারের দিক বাদ দিলে বাড়িটি আগের মতোই আছে। মায়াকভস্কি রচিত গ্রন্থাদির প্রথম সংস্করণের কপি, তাঁর হস্তলিপি অঙ্কিত চিত্র, তাঁর ও তাঁর পরিবারের প্রতিকৃতিসহ বহু ছোটখাটো জিনিস সযত্নে রাখা আছে। তিনি রাজনৈতিক প্রচারপত্র, পোস্টার প্রভৃতিও রচনা করতেন। সেগুলোও দেখতে পেলাম। মায়াকভস্কি শুধু রুশ কবি নন, তিনি একজন জগদ্বিখ্যাত কবি এবং জগদ্বিখ্যাত কবিরাইতো বিশ্বকবি। যুগসন্ধিক্ষণে সমাজ ইতিহাসের এক অধ্যায় থেকে অন্য অধ্যায়ে উত্তরণ করে—এরই নাম সামাজিক বিপ্লব। প্রচারপত্র, পোস্টার কার্টুন ইত্যাদি রচনা করে মায়াকভস্কি প্রমাণ করে গেছেন যে, বড় শিল্পী, কবি-সাহিত্যিক হয়েও মাটির পৃথিবীর সামাজিক কর্তব্য পালন করা যায়। আমাদের দেশের কাজী নজরুল ইসলাম তার একটি দৃষ্টান্ত। সোভিয়েত ইউনিয়নে এ শ্রেণীর মিউজিয়মে জুতো পরে প্রবেশ করা যায় না। আমাদের প্রাচ্য ভূমিতে এটা বিরল। ইয়োরোপে এ রুচিশীলতা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। জানিনা রাশিয়ার বাইরের ইয়োরোপে এ প্রথা আছে কিনা।

এ মিউজিয়মটি দেখার আগে যুদ্ধে নিহত অজ্ঞাত সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভ এবং তৎসংলগ্ন অনির্বান শিখা দেখতে গিয়ে ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার নিদর্শন একটি ফুলের তোড়া অর্ঘ্য রূপে স্থাপন করেছিলাম। এখন থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। হিটলারী যুদ্ধে তিন কোটি সোভিয়েত নাগরিক নিহত হন। সোভিয়েত মানুষ ওদেরকে ভোলেনি। অজ্ঞাতনামা নিহত যোদ্ধাদের স্মৃতিস্তম্ভ জেয়ারত করার জন্য প্রতিদিন অসংখ্য নর-নারী পুত্র-কন্যাদের

নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। প্রত্যেকের হাতে ফুলের তোড়া। সুদীর্ঘ লাইন হয়ে যায় মানুষের। আমাকেও ঐ সুদীর্ঘ কিউতে দাঁড়াতে হয়েছিল। ক্রেমলিন স্কোয়ারে লেনিনের মমি দেখার জন্য সমবেত জনতার সংখ্যা এবং দীর্ঘ লাইন দেখে আমি সত্যি সত্যিই বিস্মিত হয়েছিলাম। আমি বৃদ্ধ। হাঁটুতে বল-শক্তি কম। মাথার উপরে রোদ। কয়েক ঘন্টার মধ্যে মমিঘরে পৌঁছার সম্ভাবনা নেই দেখে লেনিনের মমি দেখার প্রচেষ্টা হতে নিবৃত্ত হলাম। .মার্কসীয় আর্থ-সামাজিক পদ্ধতির প্রথম বাস্তব প্রতিষ্ঠাতা মহামতি লেনিন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নিহত কোটি কোটি নরনারীর প্রতি রুশ জাতির অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাবোধ দেখে দেশের কথা মনে পড়লো।

১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭১ সাল বাংগালীর জাতীয় চেতনা-লাভ এবং সংগ্রামের কাল। সে-সময়ের ঘটনাবলী ছায়াছবির মতো চোখের সামনে ভাসতে লাগলো। জাতীয় মুক্তির ঐ দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাসে প্রথম স্তম্ভ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ হন বাংলার তরুণ ছাত্র-যুবক। তার পর থেকে সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত এবং আজ্ঞাবহ এজেন্ট পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংগালীর স্বাধিকার সংগ্রাম ক্রমান্বয়ে অধিক হতে অধিক শক্তিলাভ করেছে। ১৯৬৬-৬৯ সালে শহীদ হয়েছেন বহু লোক। সত্তুরের নভেম্বরের গর্কীতে পাকিস্তান সরকারের নির্বিকার উদা-সীনতার ফলে প্রাণ হারিয়েছেন উপকূলের লক্ষ লক্ষ অধিবাসী। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী গণহত্যার শিকার হয়েছেন তিরিশ লক্ষ বাংগালী নর-নারী।

১৯৭১ সালের পর মাত্র দশ বছর পার হয়েছে। ঐতিহাসিক বিচারে অতি সামান্য সময়। কিন্তু এরই মধ্যে আমরা সব কিছু ভুলতে বসেছি। সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে চরগণ রাতের গভীরে অতর্কিতে হানা দিয়ে হত্যা করেছে দুধের বাচ্চা এবং অন্তঃসত্ত্বা মহিলাসহ সপরিবারের বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এবং

জেলখানায় স্বাধীন বাংলাদেশের চারজন জাতীয় নেতাকে। আমরা প্রতিবাদ করিনি। আমরা তাঁদের ভুলে গেছি। ভুলে গেছি আমাদের তিরিশ লক্ষ শহীদকে। ১৯৭১ সালের ভয়াবহ দিনগুলোতে বাংলাদেশকে সক্রিয়ভাবে সর্বপ্রকারে সাহায্য করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং প্রতিবেশী ভারত। এক কোটি গৃহবিতাড়িত নর-নারীকে আশ্রয় এবং আহার্য দিয়েছিল ভারত। আমরা ওদের সেই অবদানের কথা ভুলে গেছি। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানকে তার গণহত্যায় সক্রিয়ভাবে সর্বপ্রকারে সহায়তা করেছিল চীন, সৌদী আরব এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বংগবন্ধু শহীদ হওয়ার আগে প্রথমোক্ত দেশ দু'টি এবং পাকিস্তান বাংলাদেশকে রাজনৈতিক স্বীকৃতিও দেয় নি। আমরা সেদিনের ঐ শত্রুদের শুধু মিত্ররূপে গ্রহণ করিনি, পাকিস্তানকেও সুহৃদ ভাবছি। সজ্ঞানে সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য মেনে নিচ্ছি বললেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদেরও শহীদ মিনার আছে, আছে নিহত বুদ্ধিজীবি এবং অজ্ঞাতপরিচয় সৈনিক শহীদানের স্মৃতিস্তম্ভ। কিন্তু বছরে একবার আনুষ্ঠানিক কৃত্য সম্পাদন ছাড়া অন্য কোন সময়ে আমরা ওসব জায়গায় ফুলের তোড়া নিয়ে যাই না। পরলোকগত বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং স্বাধীনতার অন্য সকল স্থপতি এখন জাতীয় শত্রুরূপে প্রচারিত। আমরা এই মিথ্যাচার নীরবে হজম করছি। ওঁদের জন্য স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়নি। ওঁদের কবর জেয়ারত করতে ফুলের তোড়া নিয়ে যাই না। আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রমাণিত শত্রুদের করায়ত্তে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। এটাকে কি নিয়তির পরিহাস বলবো? নাকি গণ-অকৃতজ্ঞতা? অথবা জাতীয় চেতনার অভাব এবং নেতৃত্বের ব্যর্থতা? সোভিয়েত দেশের জনগণকে দেখে উপলব্ধি করলাম, স্বাধীনতা একটি ভাবাবেগসর্বস্ব শব্দমাত্র নয়, স্বাধীনতা একটি ঐতিহ্যলব্ধ আচরণ, মানব-চরিত্রের সবচেয়ে মহান দিক।

কোথা থেকে কোথায় এসে পড়েছি। স্বপ্নে পূর্বাপর যোগসূত্র থাকে না। অতীতকে পুনর্জাগ্রত করতে গেলেও বুঝি তাই হয়।

একদিন মধ্যাহ্নভোজের পর গেলাম মস্কোর সবচেয়ে বিস্ময়কর মিউজিয়মে। তলস্তয়ের মহত্তম শিল্পকীর্তি 'যুদ্ধ ও শান্তি' (ওয়ার এ্যাণ্ড পীস) উপন্যাসে নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের বিবরণ পাঠ করেছি, মস্কোর ঐ মিউজিয়মে দেখলাম তার অনুপম বিচিত্রণ। কিন্তু ওগুলো সাধারণ তৈলচিত্র নয়। একটি বৃত্তাকার বিশাল দালান, তার চারদিক বিশেষ ধরণের আয়নায় ঘেরা। তার মধ্যে চিত্রগুলো সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আয়না এক অপূর্ব যাদুর সৃষ্টি করছে দর্শকের চোখে। চিত্রগুলো শুধু চতুর্মাত্রিক হয়ে উঠছে না, আকারেও বহুগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। রুশ এবং ফরাসী সেনাবাহিনীর বিন্যাস, যুদ্ধ, বন্দুক-কামানের গোলাগুলী, হতাহত সৈনিক, অশ্বারোহী, অশ্ব, বিস্ফোরিত গোলার অগ্নি ও ধোঁয়া, নেপোলিয়ন এবং একচক্ষু রুশ সেনাপতি কুৎজভের তাঁবু, অশ্বপৃষ্ঠে নেপোলিয়ন, কুৎজভ, উভয়পক্ষের ফিল্ড কমাণ্ডার প্রভৃতি সব কিছু যার যার আকার-আকৃতি এবং পোশাক-পরিচ্ছদে নজরে আসছে। জ্বলন্ত তাঁবু এবং জনপদও দেখা যাচ্ছে। মিউজিয়মের সামনের চত্বরে একচক্ষু মার্শাল কুৎজভের বিশাল প্রস্তরমূর্তি (নাকি ব্রোঞ্জ-মূর্তি)। সড়কের নাম কুৎজভ প্রসপেক্ত। তলস্তয়ের বিবরণে আছে, একদিকে রুশ পোড়ামাটি নীতি এবং অপরদিকে প্রচণ্ড শীতে রসদহীন মস্কো। এ অবস্থায় নেপোলিয়ন তাঁর হতাবশিষ্ট সেনাবাহিনী নিয়ে স্বদেশে ফিরে যাচ্ছেন। রাত্রে সর্বোচ্চ রুশ সমর পরিষদের বৈঠক চলছে। জার নিজে উপস্থিত। সেনাপতিগণ আলোচনা করছেন। প্রধান সেনাপতি বৃদ্ধ কুৎজভ নিঃশব্দে চেয়ারে বসে আছেন। মনে হচ্ছে তিনি বুঝি বা ঘুমিয়ে পড়েছেন। সমর পরিষদের সিদ্ধান্ত, নেপোলিয়নকে পাল্টা আক্রমণের এটাই উত্তম সুযোগ। কুৎজভের নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। তাঁর অভিমত : গুরুতরভাবে আহত নেকড়ে পালাচ্ছে, তাঁকে আক্রমণ করতে গিয়ে একজন রুশই বা অযথা প্রাণ দেবে কেন ? নেপোলিয়নের শাস্তি

প্রস্তাবের উত্তরে কুৎজভ জানিয়েছিলেন, "শান্তি হতে পারে না, কেননা জনগণের তাই ইচ্ছে।" ফরাসী বাহিনীর পলায়নের সময় একমাত্র কুৎজভই বলতেন, আমরা যে রকমটি চাই তার চেয়েও ভালোভাবে সব কিছু আপনা-আপনি হয়ে যাচ্ছে। কোনো যুদ্ধ দরকার নেই।...দশ জন ফরাসীর জানের সংগে একজন রুশীর জীবনও বিনিময় করতে আমি রাজী নই। একমাত্র কুৎজভই ভিলনাতে জার আলেকসান্দরের মুখের উপর বলেছিলেন, সীমান্তের ওপারে যুদ্ধ ঠেলে নেয়া হবে অনর্থক এবং শয়তানি। জার আলেকসান্দরের নামোল্লেখ না করলেও সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষ জনযুদ্ধের প্রথম কৌশলী সেনানায়ক কুৎজভকে তাঁদের ইতিহাসে এবং ভাস্কর্যে অমর করে রেখেছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সমর কুশলতা, সাহসিকতা এবং বীরত্বের প্রতীকরূপে সোভিয়েত ইউনিয়ন "অর্ডার অব কুৎজভ" প্রবর্তন করেছিল। মার্কস্-এঙ্গেলসের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন লেনিন। কম্যুনিজম এখন সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় দর্শন। সেদেশে সমাজতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক-প্রশাসনিক পদ্ধতি প্রচলিত। 'দুনিয়ার শ্রমিক এক হও' বিশেষ কোনো দেশের ধ্বনি নয়। সমাজতন্ত্রের আবেদন বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত। এই বিশ্বমানবিক দর্শনে আস্থাবান হয়েও সোভিয়েত দেশ তার অতীত ইতিহাস রক্ষা করছে। স্বৈরাচার খতম করার জন্য ওঁরা ১৯১৭ সালে জার-পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করেছেন। কিন্তু সুদীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে কোন্ কোন্ ঘটনা স্বাধীনতা সংরক্ষণ এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রতীক চিহ্ন এবং কোন্ কোন্‌টা নয় সে বিষয়ে তাঁরা সজাগ। তাই পিটার দ্য গ্রেট এবং ক্যাথরিন যেমন ওঁদের রাজকীয় গ্লামার-সহ সংরক্ষিত তেমনি চিত্রকরের তুলি এবং ভাস্করের প্রতিকৃতির মধ্যে সংরক্ষিত আছেন কুৎজভ, আলেকসান্দর প্রমুখ। নেপোলিয়নকেও ওঁরা ভোলেন নি। লাল নেপোলিয়ন এবং সাম্রাজ্যবাদী নেপোলিয়ন উভয় রূপেই তাঁকে স্মরণ করা হয়। কম্যুনিস্টরাই শুধু নেপোলিয়নের মধ্যে রেড নেপোলিয়নিজমের সন্ধান করেন

নি। তলস্তয়ের মতো শান্তিবাদী মহৎ খৃষ্টানও নেপোলিয়নকে সমাজ বিজ্ঞানীর নিরাসক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছেন। নেপোলিয়ন যুগপৎ ইয়োরোপীয় সামন্তবাদ বিলোপকারী, সুতরাং জাতীয়তাবাদী চেতনার শক্তিমান জনক এবং বিশ্বত্রাস যোদ্ধা।

লেনিনের মমি স্বচক্ষে দেখার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলাম। অন্য একদিন চেষ্টা করেও সফল হইনি। সেই বিশাল লাইন। কোমরে জোর নেই। ধৈর্যও কম। তাই ঘুরে ঘুরে ক্রেমলিন অঞ্চলের বাড়ীঘর দেখতে লাগলাম। রেড স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে ডান দিকের টিলার উপরের প্রাচীরঘেরা ইমারত দেখলাম। জার আমলের চিহ্ন এ প্রাচীর প্রাচীনতার প্রতীক। দিল্লী, আগ্রা, লাহোর, ফতেহপুর সিক্রির প্রাচীরের সংগে এ প্রাচীরের সাদৃশ্য রয়েছে। মধ্য-এশিয়ায়ও এ রকম প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ দেখেছি। মধ্যযুগে কেল্লা এবং তার প্রাচীর নির্মাণ পদ্ধতি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এক রকম ছিল কিনা জানি না। তবে মস্কো থেকে মধ্য-এশিয়া হয়ে ভারতবর্ষ পর্যন্ত যে প্রায় এক রকম ছিল, ক্রেমলিনের কেল্লা দেখে আমার তা-ই মনে হলো। সেযুগে আত্মরক্ষার পদ্ধতি দেয়ালঘেরা শহর, দেয়ালঘেরা কেল্লা। আজও প্রাচীর আছে, প্রাচীন গড়খাইও দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিজ্ঞান মানুষের হাতে নতুন অস্ত্র তুলে দিয়েছে। এখন আত্মরক্ষা এবং আক্রমণের জন্য ট্রেঞ্চ, পিল বক্স, বাঙ্কার চাই। কিন্তু ওগুলোও যথেষ্ট নয়। ক্রেমলিন এলাকার কোনো কোনো গির্জার স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া ও নির্মাণশৈলী দেখে বৌদ্ধ প্যাগোডা এবং এক গুম্বজবিশিষ্ট প্রাচীন মসজিদের কথা মনে পড়লো। দূর থেকে অমৃতসরের শিখ মন্দিরের স্বর্ণচূড়া দেখেছি। সেটির কথাও মনে পড়লো। কিন্তু প্রাচীরবেষ্টিত উঁচু টিলার উপরে অবস্থিত বড় অট্টালিকাটি এ যুগের মনে হলো। সহসা মনে পড়লো কোনার্কের সূর্য মন্দিরের কথা। সাদৃশ্য নেই, কিন্তু নির্মাণ

কৌশল এবং কারুকার্যে উড়িষ্যার ঐ বিশাল ইমারতের তুলনা খুঁজে পাওয়া কঠিন।

বহুক্ষণ হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। নির্দিষ্ট স্থানে ট্যাক্সির জন্য দাঁড়ালাম। মাথার উপরে দুপুরের সূর্য। বেশ তাপ। আমাদের দেশের কার্তিক মাসের মতো। দেশী-বিদেশী অগণিত লোক ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষমান। সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে; আমাদের দেশের মতো পাড়াপাড়ি গুতোগুতি নেই, কিন্তু এই শৃংখলার মধ্যেও বৈদগ্ধ এবং মানবিক আচরণ লক্ষ্য করেছি। যষ্টিধারী বুড়ো-বুড়িদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। বুড়োবুড়িরা পরে এসে আগে চলে গেলেন। আমার হাতে লাঠি ছিল না। দেশে রেখে গিয়েছিলাম। মনে মনে ভাবলাম, নিয়ে এলে ভালো হতো। ট্যাক্সি একের পর এক আসছে, এক সংগে এসে শৃংখলা ভঙ্গ করে না।

দাঁড়িয়ে আছি। সহসা পিছন থেকে এক ভদ্রলোক ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করলেনঃ Are you a Pakistani—আপনি কি পাকিস্তানী। আমি পিছনে ফিরে দেখি রুশী নয়, প্রশ্নকর্তাও আমার মতো বিদেশী। আমি বললাম, না জনাব আমি বাংলা-দেশের লোক। আমি তাঁকে পাল্টা প্রশ্ন করে জানতে পারলাম, ভদ্রলোক সিরিয়ান এবং ৩৫ সদস্যের একটি ট্যুরিস্ট দলের একজন। ভদ্রলোক আরবী না বলে ইংরেজীতে কথা শুরু করায় আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, বিদেশী ভাষা হিসেবে ইংরেজীর চাইতে ফরাসী ভাষা আপনাদের বেশী জানার কথাঃ প্রথম মহাযুদ্ধের পর সিরিয়া ছিল ফরাসী অছিভুক্ত দেশ। ব্যাপার কি? ভদ্রলোক জানালেন, সিরিয়ানরা এখন ফরাসীর চেয়ে ইংরেজীর দিকে বেশী ঝুঁকেছেন। ইংরেজি এখন সিরিয়ায় বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় ভাষা। ভদ্রলোক বেশ রাজনীতি সচেতন। তিনি বললেন, Now that you are a free nation, I think you are happy and quite alright. আমি একটু

ভেবে উত্তর দিলাম, "my dear friend, political freedom is not everything. We are a people of ninety million souls living in a small land of only 55 thousand square-miles. It will take time before we can make our national freedom really meaningful for all the people—we are trying. রাজনৈতিক স্বাধীনতা সব কিছু নয়। মাত্র ৫৫ হাজার বর্গ-মাইল জায়গার মধ্যে আমরা ৯ কোটি লোক বাস করি। দেশের সকল মানুষের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলতে সময় লাগবে। আমরা চেষ্টা করছি। তারিখটা ছিল ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৮০। ট্যাক্সির লাইনের সম্মুখে এসে গেছি, সিরিয়ান ভদ্রলোক এবং আমি পরস্পর থেকে জীবনের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেলাম। কিন্তু স্মৃতিটি রইলো।

সেদিনই বিকেলে, তিনটার দিকে লমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন-রত দু'জন বাংগালী ছাত্র এলেন। ওঁরা আমাকে ওঁদের মধ্যে পেতে চান। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংগালী ছাত্রের সংখ্যা ১৩০ জনের মতো। ওঁরা নানা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করছেন। সোভিয়েত সরকারের বৃত্তির টাকায় ওঁদের লেখাপড়া চলছে। পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের আরো বহু ছাত্রছাত্রী সোভিয়েত ইউনিয়নের খরচে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা পাচ্ছে। নিঃসন্দেহে এটা অনুন্নত ও উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের মানবিক দরদের প্রমাণ। আফ্রিকার বীর সেনানী এবং সমাজতন্ত্রী জননেতা প্যাট্রিস লুমুম্বা মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার ভাড়াটে এজেন্টদের হাতে নিহত হন। তিনি তখন ছিলেন তাঁর দেশের সরকারপ্রধান এবং জনপ্রিয়তার শিখরে। সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের শিকার এই মহৎ মানুষটির স্মৃতিকে স্থায়ী করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন বিপুল অর্থব্যয়ে মস্কোর উপকণ্ঠে এই আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলেছে।

দেখার ইচ্ছে হ'লো। সম্মতি জানালাম। ওঁরাই জানালেন বাংলাদেশের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ডক্টর আবদুল গফ্ফুরও মস্কো আছেন। ওঁকেও বলা হচ্ছে। পাঁচ তারিখ বিকেলে ওঁদের অনুষ্ঠানে যাওয়া ঠিক হলো।

আট

....

ব্যালে নাচ ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য অবদান। নৃত্য এবং মঞ্চাভিনয়ে রাশিয়ার খ্যাতি বহু কালের। আমাদের যৌবন-কালে আনা পাভলোভা ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে খ্যাতীময়ী নর্তকী। একবার তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। যতদূর মনে পড়ছে, ম্যাডান থিয়েটর নামক রঙ্গালয়ে তিনি তাঁর শৈল্পিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন। বহু কষ্টে টিকেটের টাকা যোগাড় করে তাঁর নাচ দেখেছিলাম। রুশ মঞ্চাভিনেতা এবং পরিচালক স্তানিস্লাভস্কীর নাম আজকের তরুণেরা জানেন। ব্যালেনৃত্যেও রুশ খ্যাতি বিশ্ব জোড়া। দেশে চলচ্চিত্রে আনা কারনিনা ব্যালেনৃত্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। আশা ছিল মস্কোতে জীবন্ত ব্যালে দেখতে পাবো। নিরাশ হতে হলো। ঐ সময়টায় মস্কোতে কোনো খ্যাতনামা ব্যালে পার্টি উপস্থিত ছিল না। দুধের স্বাদ ঘোলে পাওয়া যায় না। তবু ওঁদের প্রস্তাব মতো সিনেমা দেখতে রাজী হলাম। ওঁরা আমাকে মস্কোর একটি বিখ্যাত সিনেমা হলে নিয়ে গেলেন। হল ভর্তি লোক। ছবির ইংরেজি নাম 'দ্য ক্রু'। বিমানচালক-দের জীবন নিয়ে ছবিটি। ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের স্থান থেকে বিপন্ন লোকজন উদ্ধারের সামাজিক দায়িত্ব সচেতনতার সাথে গৃহী জীবনের একটি জটিল সমস্যা জুড়ে দেয়া হয়েছে। টেকনি-ক্যাল দিক থেকে বিচার করলে প্রায় নিখুঁত। ফটোগ্রাফির বাহাদুরি আছে। মস্কো পৌঁছার পরই বুঝেছিলাম সেদেশের মানুষ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ভোগ করছে। ওদের খাওয়া-দাওয়ার বহর, পোশাক-পরিচ্ছদ, অসংখ্য প্রাইভেট গাড়ী তার প্রমাণ দিচ্ছিল। এ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটির কিছু কিছু সমস্যা পৃথিবীর সর্বত্র প্রায়

এক। সম্পন্ন সমাজের উদ্বৃত্ত এনার্জি আনন্দের নানা অভিনব পথ খুঁজে বেড়ায়। যত আধুনিক হোক, সামাজিক জীবন পৃথিবীর সর্বত্রই কতকগুলো প্রাচীন প্রথা-পদ্ধতি বহন করে চলছে। বিবাহিত পারিবারিক জীবন তার মধ্যে একটি। প্রাচীন সমাজের ট্যাবুর ন্যায় সর্বগ্রাসী হলেও এ বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার গোপন প্রবণতা পৃথিবীর সর্বত্র দেখা যায়। সেবাদাসী, দেবদাসী, পতিতালয় এর ঐতিহাসিক প্রমাণ। ওগুলো না থাকলে ব্যভিচার। দারিদ্র্যপীড়িত অসচ্ছল অনগ্রসর সমাজে বিবাহিত পারিবারিক জীবনের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া সহজ নয়। সচ্ছল ও অগ্রসর সমাজে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের আলাদা অর্থনৈতিক অস্তিত্ব নিশ্চিত। তাই পরস্পরবিরোধী জীবনবোধ আবিষ্কৃত হওয়া মাত্র বিবাহ-বিচ্ছেদের ইচ্ছা জাগে। সোভিয়েত ইউনিয়নে স্ত্রী-পুরুষের অধিকার ও দায়িত্ব সমান। সমাজও সচ্ছল। তাই অন্যান্য সচ্ছল দেশের মতো সেদেশেও বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা বাড়ছে। বিবাহবিচ্ছেদ নর-নারীর জীবনকে দ্বিতীয়, তৃতীয় সংগী বা সংগিনীর সংগ শয্যায় অধিকতর সুখী করে কিনা জানি না, কিন্তু শিশু সন্তানের জীবনকে নিঃসন্দেহে বিড়ম্বিত করে। শিশুকে মাতৃস্নেহ বা পিতৃস্নেহের কোনো একটিকে বেছে নিতে হয়। এখানে শিশুর স্বাধীনতা নেই। আদালতের রায়ই চূড়ান্ত। শিশু পুত্র-কন্যাকে কার ভালো-বাসার অধিকার বেশী? মাতার না পিতার?

বিবাহিত দম্পতির জীবনে এটা একটি জটিল প্রশ্ন ও মনোগত সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। দাম্পত্য জীবন বিষিয়ে তোলে। বিমান-চালক পিতা ঘরে ফিরে আসলেই শিশু পুত্র তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মা'র কাছে দৃশ্যটা অসহ্য। সে ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে মরে। ঈর্ষানলে দগ্ধ স্ত্রী তার স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ করে। বিবাহবিচ্ছেদ চায়। আদালতে দাঁড়িয়ে সে স্বামীর বিরুদ্ধে অনর্গল মিথ্যা বলে যায়। শাশুড়ী জামাতার পক্ষে স্বাক্ষী দেয়। কিন্তু বিচারক স্ত্রীর পক্ষে রায় দেন। স্ত্রী

শিশু পুত্রকে সংগে নিয়ে চলে যায়। যাওয়ার সময় ছেলেটি বারবার পিতার দিকে ছলছল চোখে ফিরে তাকায়। মহিলা কিছুদিন পরে অন্য একজনকে বিয়ে করে। শিশু পুত্রটি মায়ের নতুন সংসারে গিয়েও তার পিতাকে ভুলতে পারে না। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে অবোধ বালকটির মানসিক যন্ত্রনা ছবিটিতে প্রতিফলিত হয়েছে। বিবাহবিচ্ছেদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করাই ছবিটির মূল লক্ষ্য বলে মনে হলো। এদিক থেকে বিচার করলে ছবিটি চমৎকার। কিন্তু বক্স অফিস হিট করার লক্ষ্যেই সম্ভবতঃ ছবিটিতে কয়েকটি ভাঁড়ামি এবং প্রায় আদি রসাত্মক দৃশ্য জুড়ে দেয়া হয়েছে। ওসব দৃশ্য ছবির মূল কাহিনীর জন্য দরকার ছিল না। এ সব অনাবশ্যক দৃশ্য আমাকে আনন্দ দিতে পারে নি। উল্টো বরং ছবিটির পরিচালক ও নির্মাতাদের নান্দনিক ভারসাম্য বোধ সম্পর্কে সংশয় জেগেছে। প্রেক্ষাগৃহে বসেই স্মরণ করছিলাম, আনা কারনিনা ব্যালের কথা। তার মধ্যে যে অতুলনীয় অভিনয় নৈপুণ্য এবং উঁচু স্তরের নান্দনিক চেতনার সাক্ষাৎ মেলে তার সাথে "ক্রু'র" কোনো তুলনা হয় না। জানি, মঞ্চাভিনয় আর চলচ্চিত্রাভিনয় এক বস্তু নয়। তবু বারবার মনে হলো, সব দেশে সব কালেই রুচিবোধের পার্থক্য আছে। সচ্ছল-অসচ্ছল নির্বিশেষে সকল সমাজের মানব চরিত্রেই কতকগুলো মৌলিক ঐক্য আছে, জৈবধর্ম সব দেশেই এক। প্রক্রিয়াও অভিন্ন। জৈবধর্ম পালনে বিরোধের সূত্রপাত হলে দারিদ্র্যপীড়িত অসচ্ছল সমাজে দম্পতি অনেক সময় মুখ ও হাত দুই-ই ব্যবহার করে। স্বামী স্ত্রীকে তাড়িয়ে দেয় এমন কি হত্যাও করে। আমাদের দেশে এসব ঘটনা নিত্যই ঘটছে। ব্যভিচার অসচ্ছল সমাজেও আছে; সচ্ছল দেশে বিরোধ হাতাহাতি মারামারিতে পরিণত হওয়ার আগেই দম্পতি সাধারণত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে দু'পক্ষের কোনো পক্ষকে আর্থিক বা সামাজিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। নতুন জীবনসংগীও সহজেই জোটে। অর্থাৎ সচ্ছল ও অগ্রসর সমাজে দাম্পত্য জীবন প্রভু ও সেবাদাসীর সম্পর্ক নয়। ওটা সমকক্ষ ও সম-মর্যাদাবান দু'জন

স্বাধীন মানুষের জৈবধর্ম পালনের একটি আদর্শ পদ্ধতি মাত্র। সন্তানের জন্য রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকলে সূক্ষ্ম মানসিক বিরোধের কারণে বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। পশ্চিমী সচ্ছল জগতে ঐ নিরাপত্তা না থাকা সত্ত্বেও নিছক আর্থিক সচ্ছলতাই নানা রকমের মানসিক বিকৃতির জন্ম দিয়েছে। ইয়োরোপ আমেরিকায় বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা সোভিয়েত ইউনিয়নের চেয়ে অনেক বেশী। সন্তানাদির দায়িত্ব রাষ্ট্রের শুধু এ কারণে কোনোরূপ অতিরিক্ত জটিলতার সৃষ্টি হয় নি সোভিয়েত ইউনিয়নে। মস্কো লেনিনগ্রাদের মতো বড় বড় শহরেও সুখী দাম্পত্য জীবনের বিপুল সংখ্যাধিক্য চোখে পড়ে। পুত্র-কন্যার প্রতি পিতামাতার অথবা পিতামাতার প্রতি পুত্র-কন্যার কর্তব্যজ্ঞান সেদেশে একটি সুদৃঢ় সামাজিক ঐতিহ্যরূপে স্বীকৃত। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামাজিক কর্তব্যবোধ অপরাপর দেশের চাইতে অনেক বেশী। সোভিয়েত ইউনিয়নে অবৈধ সন্তান নেই। স্বেচ্ছায় স্বামী-স্ত্রী রূপে বসবাসের ফলে প্রসূত সন্তান মাত্রেই বৈধ—সন্তান সেদেশে জৈবধর্ম পালনের ফল—বৈধ বা অবৈধ কোনোটাই নয়—তার একমাত্র পরিচয়, সে একজন নতুন মানুষ। বিবাহ রেজিস্ট্রেশন তাকে অতিরিক্ত মর্যাদা দেয় না। সামাজিক নিন্দার ভয়ে সজ্ঞানে ভ্রূণ হত্যা সেদেশে অকল্পনীয়। অপরদিকে প্রতিটি নবজাত শিশুর জন্য মা রাষ্ট্রের কাছ থেকে একটি অতিরিক্ত মাসিক ভাতা পায়। পিতৃমাতৃহীন শিশুর প্রতিপালনের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা রয়েছে। নির্ধারিত বয়স পর্যন্ত শিক্ষা চিকিৎসা প্রভৃতি ফ্রী। অপরদিকে বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি পুত্র-কন্যার কর্তব্যবোধ বরং আমাদের দেশের চেয়ে বেশীই মনে হলো। আমার দোভাষী নাতাশা অবিবাহিতা। ওঁরা মিনস্কের লোক। পরিবার মিনস্কেই থাকে। পিতামাতা দু'জনই চাকুরে। নাতাশা মস্কোতে চাকরী করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির ছাত্রীও সে। দু'টি ভাই এখনও ছাত্র। নাতাশা দু'চার দিন পর পর টেলিফোনে মা-বাবার খবর নেয়। স্বচক্ষেই তা দেখলাম। ওদের টাকা পয়সার দরকার নেই। কিন্তু নাতাশা মা-বাবাকে টাকাকড়ি

পাঠায়, সে জানালো। সব চাকুরেই মা-বাবাকে টাকাকড়ি পাঠায়, এমন নয়। সোভিয়েত সমাজে সে প্রয়োজন এখন নেই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানলাম, বুড়ো পিতামাতা কোন কারণে বাধ্য হয়ে রোজগারী পুত্র-কন্যার কাছে টাকা কড়ি চাইলে সাধ্য মতো সে দাবী পূরণ না করা হলে পিতামাতা আদালতের শরণাপন্ন হতে পারেন। সে ক্ষেত্রে আদালত নাকি পুত্র-কন্যার মাসিক রোজগারের একটি অংশ পিতামাতাকে ডিক্রি দেয়। শুনে বিস্মিত হলাম। দারিদ্র্যপীড়িত অসচ্ছল দেশে এ রকম আইন দরকার। আমাদের দেশে এ রকম কোনো আইন সম্ভবত নেই। কিন্ত ঐ আইন প্রচলিত থাকার কারণে কি সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রাচীন পন্থী বলবো? অবশ্যই নয়। এটা একটি সর্বসম্মত মানবিক আচরণ। পুত্র-কন্যার কাছে বৃদ্ধ পিতামাতার দাবী মানবিক দাবী। পূরণকারী মানবিক গুণে গুণী। অবশ্য ভালোর সংগে মন্দও আছে। মন্দ না থাকলে ভালো বলতে কি বোঝায় তা উপলব্ধি করা সম্ভব হতো না, যেমন অন্ধকার না থাকলে আলো কি তা বুঝতে পারতাম না। প্রাচীন পারসিক ধর্মে তাই আলো-আঁধার যুগ্ম সত্তারূপে কল্পিত। পরবর্তী ধর্ম-সমূহে ওটাই অন্যভাবে এসেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে পেশাধারী বারবনিতা নেই। কিন্তু মহানগরীসুলভ অনাচার অল্পবিস্তর আছে। টাকাকড়ি ব্যয় করতে পারলে বড় বড় হোটেলে দেহ-পসারিণীও নাকি মেলে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ছোটখাটো দুর্নীতিও নাকি আছে। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কালো বাজারও আছে। কিন্তু উত্তরাধিকার আইন প্রতিকূল বিধায় ব্যাপক দুর্নীতির মূল কারণ অনুপস্থিত। দুর্নীতি ধরা পড়লে শাস্তি কঠোর, এমন কি মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে। সেদেশে রুজিরোজগার জীবৎকালে ভোগ-বিলাসের জন্য, অলস অকর্মণ্য উত্তরাধিকারীদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য নয়। মেধা স্ফূরণ ও বিকাশের সুযোগ সুবিধা সকলের জন্য সমান। প্রকৃত মেধাবী সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। মেধাবীরাই সমাজ ও রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানে আছেন। তাই শ্রেণী

থাকলেও সেদেশের মানুষ বিত্তবান ও বিত্তহীনের শ্রেণীতে বিভক্ত নয়। ওঁরা যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত। পেশাগত যোগ্যতা এবং শ্রমের প্রকৃতি অনুযায়ী পারিশ্রমিকের পার্থক্য আছে, কিন্তু উদ্বৃত্ত অর্থে স্থাবর সম্পত্তি বৃদ্ধি করা যায় না।

নয়

পাঁচই সেপ্টেম্বর বিকেলে বিখ্যাত রুশ গল্প লেখক আন্তন শেকভের বাসস্থান দেখতে গেলাম। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বিশ্ব সাহিত্যে তিনি একটি অবিস্মরণীয় নাম। বালজাক, মোপাসাঁ, হেমিংওয়ে প্রমুখের সাথে শেকভের নাম উচ্চারিত। এ বাড়ীটিও এখন মিউজিয়ম। শেকভ পরিবারের আসবাবপত্র, শেকভের হস্ত-লিখিত পাণ্ডুলিপি, রচিত এবং পাঠিত বই প্রভৃতি নিয়ে মিউজিয়ম। মহিলা কর্মীরা দর্শককে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখান। প্রথানুযায়ী জুতো খুলে প্রবেশ করার সময় জুতোজোড়া 'হারাবে না তো' অভ্যাসবশে মনে এ প্রশ্ন জেগেছিল। আমাদের দেশে খুলে রাখা জুতো হারাবার ভয় পদে পদে। একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়লো। প্রহরীদের সতর্ক প্রহরাধীন প্রাচীরবেষ্টিত রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ভিতরের বিশাল চত্বরে ঈদের নামাজ পড়তে গিয়েছিলাম। নতুন পাম্পস্ জোড়া নামাজের জন্য পাতা ফরাসের পাশে রেখেছি। নামাজ পাঁচ-দশ মিনিটের ব্যাপার। কিন্তু মোনাজাতের ব্যাপারটা ফরজ ওয়াজিব সুন্নত সব রকমের নামাজকে ছাড়িয়ে যায়। আধ ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সুদীর্ঘ মোনাজাতের মধ্যে শত্রুদের বাড়ী ঘর ভেঙ্গে দেওয়া প্রার্থনা সহ ইহকাল পরকালের জন্য নানাবিধ আবেদন জানিয়ে বাড়ী ফিরতে গিয়ে দেখি জুতোজোড়া গায়েব। পুলিশ ও মুসল্লী ছাড়া ওখানে অন্য কেউ ছিল না। বাসা কাছেই, ছেলেকে পাঠিয়ে এক জোড়া স্যাণ্ডেল আনিয়ে বাড়ী ফিরলাম। না হলে আচকান-পাজামা-টুপি-মোজা পরিহিত কিন্তু পাদুকাহীন পদযুগল—রাজসড়কে সে এক অপূর্ব দৃশ্য হতো। মিউজিয়ম এবাদতের জায়গা নয়।

সেদেশ শাসন করে কম্যুনিস্ট সরকার। ধর্ম ব্যাপারে ওরা নিরপেক্ষ, কিন্তু কি মিউজিয়ম, কি মসজিদ-মন্দির, কোথাও জুতো চুরি হয় না।

কথা মতো বিকেলে লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংগালী ছেলেরা আমাকে নিতে এলো। হোটেল থেকে কমপক্ষে ১৫/২০ মাইলের পথ। ট্যাক্সিতে আধ ঘন্টার মতো লাগলো। নতুন শহরতলি। নব নির্মিত অলিম্পিক ক্রীড়া নগরীও ঐ অঞ্চলে। অলিম্পিক শেষ হয়েছে। কিন্তু উপশহরটি আছে এবং সমাজের প্রয়োজন মিটাচ্ছে। অলিম্পিক নগরীর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ তার বিশাল বহুতল ট্যুরিস্ট হোটেল। হোটেল থেকে লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সড়কটি চমৎকার। দু'দিকে বন ও বাগান। ভূমি উঁচু-নীচু টিলাময়, মাটি লালচে। ভূমি বিন্যাসের দিক থেকে মস্কো এবং তার উপকণ্ঠ কতকটা আমাদের দেশের বান্দরবন, কক্সবাজার, টেকনাফ অঞ্চলের মতো।

মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় আগেই ঘুরে ফিরে দেখেছিলাম। দালান কোঠার সামনে পেছনে সমান্তরাল সড়ক শ্রেণী। তার দু'দিকে বাগান ও বৃক্ষরাজি। অনতিদূরে পাহাড়ের পাদমূলে নাতি প্রশস্ত বহতা নদী। সুউচ্চ সুসজ্জিত তীর শুধু বিদেশীদের কাছে নয়, দেশীয়দের কাছেও একটি আকর্ষণীয় স্থান। সেখানে দেখেছিলাম, নববিবাহিত দম্পতি এবং তাদের সহচর-সহচরীদের ভিড়। শুনলাম বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের পরে মস্কোর নব দম্পতিরা সকলের আগে এখানে যায়। মন ও মস্তিষ্ক স্বপ্নালু করার জন্য সত্যিই চমৎকার জায়গা। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনকে বেছে নিয়েছিলেন। আমাদের দেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কর্ণফুলীর তীর, বান্দরবনে শংখ নদীর তটভূমি এবং নাফ নদীর কূলে অবস্থিত টেকনাফ মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী ঐ স্থানটির সাথে তুলনীয়। কিন্তু পরিবেশকে আকর্ষণীয় করে তুলতে মানুষের হাত চাই। আমরা খাওয়া পরার ধান্ধা নিয়েই ব্যস্ত। তাই কার বা গোয়াল কে বা দেয় ধোঁয়া।

লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশও প্রায় একই রকম মনোরম। সামনে চওড়া হাইওয়ে। সড়ক ছাড়তেই বিশাল মসৃন চত্বর। মাঝখানে প্যাট্রিস লুমুম্বার প্রস্তরমূর্তি। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ী এবং ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেল। শ'দুই আড়াই লোক বসার উপযোগী ছোট-খাটো মিলনায়তন। সম্ভবত শ'দেড়েক ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। মস্কোর অন্যান্য বিদ্যালয়ে শিক্ষারত কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রীও এসেছিলেন। ভিন্ন দেশীয় দু'চার জন উপস্থিত ছিলেন বলেও মনে হলো। ওঁরা সম্ভবত ভারতীয় ছিলেন। বাংলা ভাষা শিক্ষার্থী সোভিয়েত ছাত্রছাত্রীও দু'চারজন উপস্থিত ছিলেন। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা দেশের অবস্থা জানতে চাইলেন। অনেকে দু' তিন বছর এমনকি তারও বেশীকাল ধরে একটানা ওদেশে। শুধু রুশ বৃত্তির উপর নির্ভরশীল দরিদ্র ছেলেমেয়েদের পক্ষে প্রতি বছর ছুটির সময়ে দেশ ঘুরে যাওয়া সম্ভব নয়। ছুটির সময় ওঁরা ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে বেড়াতে যান শুনলাম।

আমার আগে বললেন প্ল্যানিং কমিশনে সর্বপ্রথম আমাদের দেশের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ডক্টর আবদুল গফুর। তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্যে প্রচুর তথ্য ছিল, কিন্তু রাজনৈতিক ডেমাগগের উত্তাপ ছিল না। বিষয়মুখী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পর আপন মতামত ব্যক্ত করার আর প্রয়োজন থাকে না। তিনি একটা সতর্কতাপূর্ণ সাবধানী বক্তৃতা দিলেন।

তত্ত্বীয় পাণ্ডিত্যের অধিকারী আমি নই। আমার কর্মক্ষেত্র ভিন্ন। তাই আমার বক্তৃতাটি ছিল সাধারণ। দৈনন্দিন রাজনীতির তাপ তার মধ্যে ছিল না। বৈদেশিক ঋণ ও রিলিফের উপর বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতার বিষয় উল্লেখ করে বললাম, এ নির্ভরশীলতা পরিণামে দেশকে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের পরোক্ষ আধিপত্যে নিয়ে যাবে। বললাম, মস্কো এখন এ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটির (সুখী সম্পন্ন সমাজের) শহর। এ সমৃদ্ধি অর্জন করতে সোভিয়েত সমাজকে বহু বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম

করতে হয়েছে। এখনও কর্মে বিরাম নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের তিন কোটি নরনারী নিহত হয়। ১৯১৭ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বর—মাত্র ৬৩ বছর সময়। তার মধ্যে থেকে গৃহযুদ্ধের তিন বছর এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ছয় বছর বাদ দিলে বাকী থাকে মাত্র ৫৪ বছর। ইতিহাসের বিচারে অতি অল্প সময়। এই অল্প সময়ের মধ্যে তৎকালীন ইয়োরোপের রুগ্ন দেশ রাশিয়ার পক্ষে এরূপ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং সামরিক ও টেকনোলজিক্যাল শক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষতা-লাভ মানবজাতির ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। বর্তমানের পর্যায়ে আসতে পশ্চিম ইয়োরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমপক্ষে দু'শ বছর লেগেছে। ওদের উন্নতির পেছনে ছিল পদানত এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার বিশাল ভূভাগ এবং তার উৎপন্ন সম্পদ। ১৯১৭ সালেও রাশিয়া ছিল প্রায় আমাদের দেশের মতোই অনুন্নত। সমগ্র রাশিয়ার হিসেবে সাক্ষরতা ছিল মাত্র শতকরা ২০/২৫ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মধ্য-এশিয়ায় নিরক্ষরতা ছিল সর্বগ্রাসী। কারখানা শিল্পেও রাশিয়া পশ্চাৎপদ ছিল। কারখানা শ্রমিকের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৫ লক্ষ, অর্থাৎ আজকের দিনে বাংলাদেশে যা তাই। তা'ছাড়াও সে ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল। তার ইকনমি এবং সামাজিক সংগঠন বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। গৃহযুদ্ধ, আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের বয়কট ও বিরুদ্ধাচরণ, অজন্মা প্রভৃতি কারণে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর রাশিয়ায় ব্যাপক দুর্ভিক্ষও দেখা দিয়েছিল। ১৯১৭ সালের পরের পাঁচ বছরের রাশিয়া এবং ১৯৭১ সালের পরবর্তী পাঁচ বছরের বাংলাদেশ প্রায় সব দিক থেকেই তুলনীয়। আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপ এবং নেতা হত্যার চক্রান্ত রাশিয়ায়ও হয়েছিল। লেনিন গুলীবিদ্ধ হয়েছিলেন, তবে প্রাণে বেঁচে যান। বংগবন্ধু এবং তাঁর প্রধান সহকর্মীগণ ষড়যন্ত্রীদের হাতে নিহত হন। রাশিয়ার মানুষ সকল প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। এ সমৃদ্ধি সমাজতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক-প্রশাসনিক পদ্ধতি এবং জাতি

হিসেবে আপন কর্মকুশলতা, দক্ষতা ও আত্মনির্ভরশীলতার লক্ষ্যে দৃঢ়তারই ফসল—বাইরের কোনো শক্তির আর্থিক বা রাজনৈতিক সহায়তার অবদান নয়। একটাই অতিরিক্ত সুবিধা তার ছিল। সেটা তার বিরলবসতিপূর্ণ বিশাল ভূভাগ।

আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীদের স্মরণ করিয়ে দিলাম, শিক্ষা শেষে ওঁরা একদিন স্বদেশে ফিরে যাবেন। তখন যেন ওঁরা সোভিয়েত সমাজের সুখী-সমৃদ্ধ জীবনকে স্বদেশে জীবনযাপনের সংগত মানরূপে গণ্য না করেন। দুঃখের পর সুখ এবং সুখের পরে দুঃখ কোরান শরিফের কথা। কিন্তু দুঃখ এবং সুখ দুটোই স্বোপার্জিত বস্তু। কোনটাই ঐশ্বরিক নয়। মুষ্টিমেয় লোকের সুখ কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সকলের জন্য সুখ নিশ্চিত করেই শুধু সুখের নিশ্চয়তা বিধান সম্ভব। সোভিয়েত সমাজজীবনের চেয়েও সুখী সমৃদ্ধ জীবনের স্বপ্ন দেখায় দোষ নেই। কিন্তু শতকরা আশি নব্বই জনের দুঃখ অব্যাহত অথবা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে শতকরা দশ-বিশ জনের উন্নতমানের জীবন যে পদ্ধতিতে সংরক্ষিত ও প্রশংসিত সে পদ্ধতির প্রথাসিদ্ধতার জালেই আবদ্ধ বাংলাদেশের অনগ্রসরতা এবং পরনির্ভরশীলতা। এ পদ্ধতিতে দুঃখী মানুষের দৈন্য কখনও দূর হওয়ার নয়। পশ্চিম ইয়োরোপ এবং অমেরিকায় শিক্ষা অথবা কর্মরত বাংগালীকে ওসব দেশের ভোগ-বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত করা হয়। ওসব দেশের ঔজ্জ্বল্য আমাদের যুবক-যুবতীদেরকে মোহাবিষ্ট করে। এটা এক ধরনের সাংস্কৃতিক এবং চৈত্তিক সাবভারশন (চারিত্র্য হনন)। আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্য-বাদ সজ্ঞানেই এটা চালায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইঙ্গবঙ্গ সমাজ এ ভাবেই তৈরী হয়েছিল। টপ সিভিল সার্ভিসের দেশী লোকজন নামেই ছিলেন ভারতীয়। ভারতীয় সমাজজীবনের সাথে ওঁদের আত্মিক যোগসূত্র ছিল না। ওঁরা খাঁটি ইংরেজের মতোই এ-দেশের মানুষের উপর নির্যাতন চালাতেন। অবসর গ্রহণের পর অনেকে ব্রিটেনকেই বাসভূমিরূপে গ্রহণ করতেন। উপমহাদেশের মানুষ এখনো ঐ সাবভারশনের বিষময় ফলাফল থেকে পরিত্রাণ

পায় নি। পাকিস্তানী আমলে পাঞ্জাবী শাসকগণ মেধাবী বাংগালী যুবকদের একই প্রক্রিয়ায় বাংগালীর জাতীয় জীবন থেকে পৃথক করে রেখেছিল। পাকিস্তানী আমলের অবসান হয়েছে বটে, কিন্তু সাবভারশন বন্ধ হয় নি। প্রতিক্রিয়াশীল দেশী-বিদেশী চক্রান্ত উচ্চ শিক্ষাদান, নেতৃ-বিনিময়, বিশেষজ্ঞ তৈরী প্রভৃতির নামে ঐ ধরণের সাংস্কৃতিক ও চৈত্তিক সাবভারশন চালিয়ে যাচ্ছে। অনগ্রসর সমাজের অনগ্রসর বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ওটাকেই মনে করছেন জাতীয় উন্নতির সোপান। দেশে ফিরে ওঁরা শিল্পোন্নত অতি সচ্ছল দেশের বিলাসবহুল উন্নত জীবন নিশ্চিত করার জন্য যেকোন উপায়ে অর্থবিত্ত অর্জনের লক্ষ্যে হন্যে হয়ে ফিরছেন। মুৎসুদ্দী বণিক শ্রেণীই শুধু রক্তশোষক তক্ষক নয়, পশ্চিমী জগতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তথাকথিত বুদ্ধিজীবী এবং উচ্চপদস্থ আমলারাও ওদের সহযোগী। দুর্নীতি সম্প্রসারণের মূলেও ওঁরা। ধর্মের নামে সাধারণ মানুষকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন রাখার অভিযানের পেছনের শক্তিও ওঁরা। কেননা ওঁরাই মিথ্যার রাজনীতি করেন। ব্যর্থ প্রমাণিত ক্ষয়িষ্ণু আর্থ-সামাজিক প্রথা পদ্ধতি টিকিয়ে রাখার জন্য আবশ্যক কলাকৌশলের উদ্ভাবক এবং প্রয়োগকারীও ওঁরা।

বললাম, আপনারা সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাস স্মরণ রাখবেন। কঠোর পরিশ্রম করে ওঁরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। জার আমলের রাশিয়ায় পশ্চিমী সাবভারশন ছিল। মুষ্টিমেয় শাসক শ্রেণীর জীবনযাপন প্রণালীর সংগে রুশ জনজীবনের কোনো সাদৃশ্য ছিল না। উনবিংশ এমন কি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রুশ সাহিত্যেও ঐ বৈষম্যের বিবরণ আছে। বিপ্লবকালীন রুশ নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকে বিলাসী পশ্চিমী জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ঐ ঘনিষ্ঠতা ওঁদের বিভ্রান্ত করতে পারে নি। মৃত্তিকাকে ওঁরা স্বর্ণজ্ঞান করেন নি। আদর্শ ও লক্ষ্যে ওঁরা ছিলেন অটল। বিষয়গত বিচারে বৈপ্লবিক ভূমিকা পালনে প্রস্তুত রুশ জনসাধারণ ঐ নেতৃত্বের আদর্শ ও লক্ষ্যকে আপন লক্ষ্যাদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। অবর্ণনীয় ত্যাগ এবং কঠোর

শ্রমের বিনিময়ে মাত্র অর্ধশতাব্দীর মধ্যে ওঁরা মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে বিস্ময়কর সামাজিক সাফল্য অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার অবাধ অধিকারবিহীন সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেও যে সমৃদ্ধি সম্ভব সোভিয়েত ইউনিয়ন তার প্রথম দৃষ্টান্ত। সারা দুনিয়া শোষণ করে সমৃদ্ধি অর্জনকারী দু'শ বছরের আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদকে প্রায় এককভাবে মোকাবিলা করছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। শক্তিমান সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থান বাংলাদেশ-সহ এশিয়া-আফ্রিকার বহু অনুন্নত দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভ সম্ভব করেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতন্ত্রের কথা বলে। বাংলাদেশের সাংবিধানিক লক্ষ্যও ছিল সমাজতন্ত্র। বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সবংশে নিহত হওয়ার পরবর্তী শাসকগণ সংবিধান থেকে সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এমনকি যে বাংগালী জাতীয়তাবাদ দেশকে স্বাধীন করবার মূলে ছিল একমাত্র প্রেরণা তাও বাদ দিয়েছেন। কিন্তু জনসাধারণ বর্জন করে নি। বাংলাদেশ আয়তনে ক্ষুদ্র। তুলনায় জনসংখ্যা খুবই বেশী। প্রাকৃতিক সম্পদও সীমিত। এ রকম একটি দেশের মানুষের জীবনকে অর্থবহ করতে হলে সমাজতন্ত্র ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষাশেষে স্বদেশে ফিরে গিয়ে জনজীবনের সাথে আপন জীবনকে সম্পূর্ণরূপে মিশিয়ে দেশ গড়ার কাজে অংশ নিলেই শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও দীর্ঘকাল অবস্থান সার্থক হবে। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, আমার শত্রু তিনটি ঃ (১) আমি নিজে, (২) ভারতবাসী এবং (৩) ইংরেজ শাসক। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত অনুন্নত দেশগুলোর শত্রুও তিনটি! (১) অর্বাচীন নেতৃত্ব, (২) কায়িক শ্রমবিমুখ আরাম-আয়েশী শিক্ষিত শ্রেণী এবং (৩) আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ। মার্কসবাদ মানবকল্যাণকামী মতবাদ। অন্যান্য মানবকল্যাণকামী মানুষের সাথে কার্ল মার্কসের পার্থক্য মূলতঃ একটি। অন্যেরা যাঁর যাঁর সমসাময়িককালে প্রচলিত আর্থ-সামাজিক প্রথার মধ্যেও মানব কল্যাণের চিন্তা করেছেন। কার্ল মার্কস পুরনো পদ্ধতি বর্জনের

পক্ষে এক নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবক। তাঁর মতে, এবং বাস্তবেও তাই, শ্রমই সকল সমৃদ্ধির উৎস। সামন্তযুগের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবশেষ সোভিয়েত ইউনিয়নেও ছিল। ষাট বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় রুশী সমাজ যা বর্জনীয় তা বর্জন করেছে। বাংলা-দেশের সমস্যাবলীর মূলে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী আমলের সামন্ততান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোর অবশেষ। তাই, জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও দেশ আগের মতোই পিছিয়ে রয়েছে। দেশের শতকরা সাতাশি জন লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে জীবনযাপন করে। বৈষয়িক বিচারে সামাজিক বিপ্লব নিষ্পন্ন হওয়ার অনুকূল অবস্থা বিদ্যমান। তবু জনগণ বারবার প্রতারিত হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জন্মভূমিতে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের দেশের বাস্তব অবস্থা স্মরণ রেখেই কর্মক্ষেত্র বেছে নিতে হবে।

রাত প্রায় দশটায় সভাশেষে যখন ফিরে আসি তখন বাইরে কনকনে বাতাস এবং প্রচণ্ড শীত। শহরতলির রাস্তা তখন প্রায় জনশূন্য। দূর পাল্লার যাত্রীবাহী বাস চলছে। ট্যাক্সির সংখ্যাও কম। তবে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে হয় নি।

দশ

তাসখন্দে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনের কথা আগে বলেছি ঃ এখন মস্কো থেকে মধ্য এশিয়া গমনের কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলছি। ৭ই সেপ্টেম্বর, বিমান ছাড়ার সময় ১১টা। বিমানবন্দরে পৌঁছলাম বেলা সাড়ে দশটায়। বিমানেই মধ্যাহ্নভোজন হবে ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু যথাসময়ে দূরের কথা, তার বহু পরেও বিমান ছাড়লো না। লাউঞ্জে নানাদেশীয় অসংখ্য লোক। অপেক্ষা করছিতো করছিই, কোনো খবর নেই। অভ্যর্থনা সমিতির তরফ থেকে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। ওঁরাও বলতে পারছেন না বিমান কখন ছাড়বে। বিমানবন্দরে অসংখ্য বিমান পার্ক করে আছে। কোন কোনটায় অলিম্পিক ছাপ মারা। দরিদ্র দেশের সবেধন বোইং-এ যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়ার মতো প্রশ্ন ছিল না, যে কোন একটি বিমান আমাদের নিয়ে উড়তে পারতো, কিন্তু উড়লো না।

দোতলার লাউঞ্জে বসে আছি। কোনো কাজ নেই। বইপত্রও সংগে ছিল না যে পড়ে সময় কাটাবো। আফ্রিকান এবং আরব যাত্রীরা বেধড়ক আরবী বলেন ঃ প্রায় কেউই ইংরেজি জানেন না, যাঁরা অল্পবিস্তর জানেন তাঁরাও বলতে অনিচ্ছুক। ওঁরা পরলোকগত মওলানা আবুল কালাম আজাদের মতো মাতৃভাষা সচেতন। মওলানা আজাদ ইংরেজী জানতেন কিন্তু বিদেশীর সাথে আলাপের সময় কখনও বলতেন না। কংগ্রেস-প্রেসিডেন্ট রূপে বৃটিশ মন্ত্রিসভার প্রতিনিধিদের সংগে আলাপ আলোচনা করার সময় অধ্যাপক হুমায়ূন কবির ছিলেন তাঁর দোভাষী। আরবদের জাতীয় চেতনা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐক্য আনতে সক্ষম না হলেও তাঁদের ভাষা-চেতনা প্রায় মওলানা আজাদের সমতুল্য।

অসংখ্য লোকের ভিড়ের মধ্যে আমি নিঃসঙ্গ একা। সোফায় বসে আছি। নিজেকে বড় অসহায় বোধ করছিলাম। এমনিতেও আমি কিছুটা লাজুক। অপরিচিতের সাথে যেচে আলাপ জমাতে পারি না।

আমার পাশের সোফায় দু'জন ভদ্রলোক। একজন রুশ। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি ছিপলে-ছাপলা লম্বা। বর্ণ উজ্জ্বল। কিন্তু চেহারার মধ্যে কতকটা যেন চিনিচিনি ছাপ। তিনিই আমার দিকে চেয়ে প্রথম মুখ খুললেন। নিখুঁত ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করলেন আমার নাম এবং দেশের নাম। পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জমলো। ভদ্রলোকের জন্মস্থান বিভাগপূর্ব ভারতের নিজামশাসিত হায়দরা-বাদ। নাম মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ। দেশ বিভাগের পর তাঁর পরিবার পাকিস্তানে হিজরত করেন, বড় ভাই এবং অন্য আত্মীয়স্বজনেরা এখনো পাকিস্তানেই আছেন। আসাদুল্লাহ ১৭ বছর বয়সে ইয়ো-রোপে আসেন। দর্শন শাস্ত্রে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি. তিনি। পাকিস্তানে থাকতেই বামপন্থী রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়ে-ছিলেন। ভুট্টোর আমলে একবার পাকিস্তানে গিয়েছিলেন, কিন্তু টিকতে পারেন নি। এখন বার্লিন তাঁর বাসস্থান। বিয়েও করেছেন জার্মান মহিলা। ছেলেমেয়ে আছে। আসাদুল্লাহর বয়স এখন পঁয়তাল্লিশ। পেশা সাংবাদিকতা। এ.পি.এন. এবং করাচির একটি ইংরেজি দৈনিকের জন্য কাজ করেন। স্ত্রীও বিদ্বান এবং রোজগারী। পাকিস্তানে ফিরে যেতে চান, কিন্তু উপায় নেই। পাকিস্তান তাঁর জন্য নিষিদ্ধ দেশ। তাঁর পরিবার স্বেচ্ছায় ভারত ত্যাগ করে পাকিস্তানে কল্পিত স্বর্ণরাজ্যে এসেছিল। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে পাকিস্তান এখন তাঁর জন্য এবং তাঁর মতো আরো কোটি কোটি মানুষের জন্য নরক। আসাদুল্লাহ এখন বিশ্বনাগরিক।

তাঁর কাছে পাকিস্তান সম্পর্কে জানতে চাইলাম। আসাদুল্লাহ বললেন, শিল্পপতি, সামান্ত এবং সেনাবাহিনী সে দেশে ঐক্যবদ্ধ। তিনে মিলিয়ে প্রবল শক্তি। অপরদিকে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে

ব্যৈক্তিক স্বার্থচেতনা অত্যন্ত প্রবল। শোষিত নির্যাতিত জনসাধারণকে নেতৃত্বদানের মতো যোগ্য লোকের অভাব। পাকিস্তানে সহজে কিছু হবার নয়।

আসাদুল্লাহ সহসা কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। কাচের গবাক্ষপথে বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, পেছনের দিকে যখন ফিরে তাকাই তখন মনে হয়, এইতো সেদিন জীবন শুরু করে-ছিলাম। জীবন প্রভাতের সে দিনগুলোতে কত স্বপ্ন ছিল, ছিল কত সাধ, আশা। পৃথিবীর একটি নতুন চেহারা দেখতে চেয়েছিলাম। কিছুই হলো না। আজ আমি বড় নিঃসঙ্গ ঃ ব্যর্থ মনে হয় জীবন। Everything is futile—সব কিছুই অর্থহীন। আসাদুল্লাহ দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

বুঝলাম, তাঁর এ হতাশার মূলে কাজ করছে দীর্ঘ প্রবাস জীবন। মনে পড়লো কবি পাবলো নেরুদাকে। তিনি বিশ্বের বহু জায়গায় গিয়েছেন, থেকেছেন। আত্মবিসর্জনও দিলেন স্বদেশেই। বাল্য ও যৌবনের প্রতিবেশ মানুষ কখনও ভুলতে পারে না। যে দেশে জোনাকি পোকা নেই সেদেশে প্রবাসী বাংগালী রাত্রির নিঃসঙ্গ মুহূর্তে ঐ সামান্য পতঙ্গের অভাবটাও তীব্রভাবে অনুভব করবে। মোহাম্মদ আসাদুল্লাহর ঘরে স্ত্রী আছেন। পুত্রকন্যার বাপ তিনি। কিন্তু স্ত্রী ও পুত্রকন্যার জীবনের সংগে তার নিজের বাল্যজীবনে উপলব্ধ অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতার সম্পর্ক যে অতি ক্ষীণ। বয়স বাড়লে মানুষ বাল্য-যৌবনের স্মৃতিকে পুনঃজাগ্রত করে আনন্দ পায়। অপরিচিত পরিবেশ-প্রতিবেশে পরিবার আনন্দকে সম্পূর্ণতা দেয় না। তাই দেখি ব্রিটিশ আমলে রাজনৈতিক কারণে হিজরতকারী ভারতীয় বিপ্লবিগণ প্রায় সকলেই পরিণত বয়সে স্বদেশে ফিরে এসেছেন। কারাদণ্ডের ভয়ভীতি ওঁদের বিদেশে আটকে রাখতে পারে নি।

আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলাম। বললাম, বয়স যত বাড়ে বিদগ্ধ মানুষের নিঃসঙ্গতাও ততো বাড়ে। তখন অতীত রোমন্থন অথবা সর্বক্ষণ কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকা ছাড়া বাঁচার অন্য

কোনো পথ নেই। প্রুস্ত তাঁর Remembrance of the things past-এর মধ্যে বাঁচার চেষ্টা করেছেন। মানবজীবনটাই অতীতের যোগফল। বারবার অতিক্রম করে গেলেও প্রতিটি বর্তমান মুহূর্ত নিমিষে অতীত হয়ে যাচ্ছে। আসাদুল্লাহকে শেক্সপীয়র স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললাম, It is a story told by an idiot, full of sound and fury signifying nothing. ওমর খৈয়ামও তাঁর আগে অন্য ভাষায় একই কথা বলেছেন; One thing is certain, life flies...all others are lies. মানব-জীবনের মূল কথা তার প্রবহমানতা। তবু মানুষ তার জীবৎ-কালে সকল আকাঙক্ষার পূরণ দেখতে চায়। ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতাকে প্রবহমানতার মধ্যে বিলীন করে সামাজিক জীবনের ঐতিহাসিক সাফল্যগুলোর মধ্যেই সান্ত্বনা খুঁজতে হবে। এক জীবনে না আসে, অন্য জীবনে, ইতিহাসের অন্য অধ্যায়ে সাফল্য আসবে। আমি ভোগ করবো না, আমার উত্তরপুরুষগণ ভোগ করবে—এ আশা এবং লক্ষ্য নিয়ে মানবজাতি এগিয়ে যাচ্ছে। এবং এখানেই সে অন্যান্য পশু হতে স্বতন্ত্র।

মোহাম্মদ আসাদুল্লাহর সাথে সহজেই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলাম। তাঁর সাথে নানান আলাপে দিনটা বিমানবন্দরের লাউঞ্জে ভালোই কাটলো। পাকিস্তানী স্বৈরশাসন তাঁর মতো আরো কতো বিদগ্ধ জনকে দেশ ছাড়া করেছে কে জানে। সাম্প্রদায়িকতা উপমহা-দেশের কোটি কোটি মানুষকে গৃহহারা উদ্বাস্তু করেছে। আজও দেশ বিভাগের ভয়াবহ সামাজিক ফলাফলের শিকার কোটি কোটি মানুষ। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের তিরিশ লক্ষ মানুষ জীবন দিয়ে ১৯৪৭-এর ভুলের খেসারত দিয়েছে। তবু সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প থেকে এখনও বাংগালী মুক্ত হতে পারে নি। হয়তো প্রবাসেই আসাদুল্লাহর জীবনাবসান হবে।

সেদিন বিমান ছাড়লো না। আমরা সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরে এলাম। পরদিন অবশ্য কোনো ঝঞ্ঝাট হয় নি। অন্য এক

বিমানবন্দর থেকে যথাসময়ে বিমান ছাড়লো। আমরা সন্ধ্যার একটু পরে তাসখন্দে পৌঁছলাম। আমাদের সংবর্ধনা জানাতে ইসলামী সম্মেলনের পক্ষ থেকে লোকজন বিমানবন্দরে এসে-ছিলেন। আমাদের থাকার জায়গা ঠিক হয়েছে উজবেকিস্তান হোটেল। ১৯৬৮ সালের ভূমিকম্পে তাসখন্দ শহর প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। মাত্র ১২ বছর সময়ের মধ্যে শহরটি পুনঃনির্মিত হয়েছে। আমাদের দৃষ্টিতে প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাসখন্দে বহুতল বাড়ীর সংখ্যা কম। উজবেকিস্তান হোটেলটি ভূমিকম্পের পরে তৈরী হয়েছে। এটি বহুতল। ত্রয়োদশ তলার একটি দু-শয্যা কামরা দেয়া হলো আমাকে। কাচের জানালা দিয়ে নীচের সুইমিং পুল, বাগান, রাজপথ দেখা যায়। সকালে সূর্য উঠছে। পূবদিক হরিদ্রাবর্ণ। রাজপথে লোক চলাচল শুরু হয়েছে—নারী-পুরুষ বালক-বালিকারা বেরিয়ে আসছে।

হিজরি ১৫শ শতাব্দীকে শান্তির শতাব্দীরূপে খোশ আমদেদ জানাবার জন্য অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনের বিষয়ে আগেই বলেছি। ৯ই সেপ্টেম্বর থেকে ১২ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সম্মেলন চলেছিল। এ কয়দিন দু'বেলা সম্মেলনের অধিবেশন নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম।

এগারো

১৩ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ই সেপ্টেম্বর সকাল ১১টা পর্যন্ত উজবেকিস্তান প্রজাতন্ত্র ঘুরে ফিরে দেখার সময় পেয়েছিলাম। সির দরিয়ার প্রবাহপথে অবস্থিত উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দও প্রাচীন শহর। পুরাতন ও নতুনে মিলিয়ে শহরের আয়তন বেশ বড়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় দু'হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত এ শহরের লোকসংখ্যা এখন প্রায় পঁচিশ লাখ। আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের কোনো পাহাড়ের উচ্চতা দু'হাজার ফুটের বেশী নয়। তাই আমাদের দৃষ্টিতে উজবেকিস্তান প্রকৃতপক্ষে একটি মালভূমি। ভারতবর্ষের রাজস্থান ও বিন্ধ্যাচলের সাথে কতকটা তুলনীয়। শস্যোৎপাদন প্রধানতঃ সেচ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। শীতকালে প্রচণ্ড শীত, বরফও পড়ে এবং গ্রীষ্মে আমাদের দেশের মতোই অসহ্য গরম, কিন্তু বায়ুতে জলীয় বাষ্প কম থাকায় ঘর্মাক্ত কলেবর হতে হয় না। তখন অল্প অল্প শীত পড়ছিল। আমাদের দেশের অগ্রহায়ণ মাসের মতো। দুপুরে প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ, সকাল সন্ধ্যায় শীত।

মধ্য-এশিয়া মুসলিমপ্রধান দেশ। স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম সামাজিক জীবনের নানা দিক, তার অর্থনৈতিক তৎপরতা ও উৎপাদনের প্রথা-পদ্ধতি, প্রাচীন কীর্তিরাজি প্রভৃতি সব কিছুই ছিল আমাদের দেখার প্রধান আকর্ষণ। সম্মেলনের ফাঁকে ফাঁকে শহরের কয়েকটি পুরনো ও নতুন মসজিদে জোহরের নামাজে শামিল হওয়ার জন্য গিয়েছি। মধ্যাহ্নভোজনও করেছি মসজিদ-প্রাঙ্গণ অথবা চৌহদ্দিতে অবস্থিত হল ঘরে। প্রথমে দেখা মসজিদটির নাম হোজা আলমবরদার। বেশ প্রাচীন মসজিদ।

পাশেই গোরস্থান। পুরনো শহরের এ মসজিদটির চারদিকে বেশ ঘন মুসলিম বস্তি। বস্তির প্রাচীনতা বহন করছে সেকেলে মাটির দেয়ালের ঘর-বাড়ী। অবশ্য চুনকাম করা নতুন ফিট-ফাট বাড়ী ঘরও আছে।

বালক-বালিকা যুবক-যুবতী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নির্বিশেষে অসংখ্য লোক বিদেশী মেহমানদের দেখার জন্য বৃক্ষছায়াশীতল অপ্রশস্ত সড়কের দু'পাশে সমবেত হয়েছে। অধিকাংশ মেয়ের পরনে লম্বা কোর্তা, সালওয়ার এবং মাথায় রংগীন রুমাল। লাল রং ওদের খুব পছন্দ মনে হলো। সাদার কারবার নেই। বেলুচিস্তানের কাফে-লায় এ ধরণের পোশাক দেখেছি। ফর্সা সুশ্রী সুন্দর স্বাস্থ্যবান মানুষ। বালক বালিকারা ফুল হাতে দাঁড়িয়েছিল। ফুল ছিটিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছিল আমাদের। সবার মুখে সালামু আলায়কুম। আমরা অ-আলায়কুম সালাম জানিয়ে প্রথাসিদ্ধ জবাব দিচ্ছিলাম, প্রসারিত কচি হাত থেকে ফুল সানন্দে গ্রহণ করছিলাম। ফুল ওদের খুব প্রিয়। বেশীর ভাগ বাড়ীতেই ফুল ও ফলের ছোট-খাটো বাগান আছে।

প্রতিটি মসজিদ সংলগ্ন জনবসতিতে আমাদের এ অভিজ্ঞতা হয়েছে, স্বতঃস্ফূর্ত সংবর্ধনা পেয়েছি। ওরা অমাদের ভাষা বোঝে না। আমরা তুর্কী ভাষার শাখা উজবেক বুঝি না। বহু আরবী ফার্সী শব্দ প্রবেশ করেছে ভাষায়; কিন্তু উচ্চারণ বদলে গেছে। তাই একটি বর্ণও বুঝি না। উচ্চশিক্ষিত বড়দের মধ্যে অনেকে বেশ ভালো আরবী বলেন। ভাষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও মধ্য-এশিয়ার সাধারণ মুসলমানদের আতিথেয়তার মধ্যে অকৃত্রিম সহৃদয়তা লক্ষ্য করেছি। শিশুদের দেখে মনে হয়েছে ওরা যেন প্রস্ফুটিত গোলাপ। কাকলিমুখর মুখ। চোখে রাজ্যের মায়া। ওদের সান্নিধ্য আমাকে অনাবিল আনন্দ দিয়েছে। আনন্দের ঐ মুহূর্ত-গুলো জীবনের মূল্যবান সঞ্চয় হয়ে রইলো। পুরনো তাসখন্দের প্রতিটি বসতবাড়ীর প্রবেশমুখে বেশ চওড়া সদর দরজা। প্রবেশ

মুখে দাঁড়িয়ে দেখেছি, প্রতিটি বাড়ীর ভিতরের প্রশস্ত উঠোনে আপেল আঙ্গুরের গাছ। বিজলী বাতি ঘরে ঘরে। কোথাও কোথাও বস্তি ভেঙ্গে নতুন বহুতল বাড়ী তৈরীর কাজ চলছে। বৃষ্টি খুব কম হয়। ভূমিকম্প অঞ্চলও বটে। তাই মনে হয় মধ্য-এশিয়া থেকে বেলুচিস্তান পর্যন্ত সর্বত্র মাটির ঘর-বাড়ীর শহর গড়ে উঠেছিল। কাবুল, বেলুচিস্তানের গুলিস্তান, চমন, মাসতুন প্রভৃতি শহরেও মাটির ঘর-বাড়ীর প্রাধান্য দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ নিজের জন্য মাটির ঘর তৈরী করিয়েছিলেন। তাঁর খেয়ালের পেছনে কি ওইসব প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুপ্রেরণা ছিল? কে জানে? মরুসদৃশ অঞ্চলে মাটির ঘরই হয়তো পরিবেশের অনুকূল বাসগৃহ।

দোভাষীকে বললাম, বহুতল এ্যাপার্টমেণ্ট বাড়ীর পাশাপাশি মাটির বস্তি যে বড়ই সামঞ্জস্যহীন লাগছে। সে বললো, সবার জন্য ও রকম বাড়ী তৈরীর কাজ চলছে। নগরীর পঁচিশ লাখ লোকের চাহিদা পূরণ করতে কিছু সময় লাগা স্বাভাবিক। প্ল্যান-প্রোগ্রাম অনুযায়ী পুরোদমে কাজ চলছে। সড়ক চওড়া হচ্ছে, দালানের পর দালান উঠছে। চলছে ভূগর্ভস্থ রেল লাইন (মেট্রো) নির্মাণের কাজও।

বস্তি তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আছে। কিন্তু কোনো বস্তি নোংরা নয়। উষর ভূমিতে ধূলোবালি থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু উষর মরুকে বাগানে রূপান্তরিত করার অবিরাম চেষ্টা চলছে এখানে। নতুন শহরে সড়কের দু'ধারে সারিবদ্ধ গাছপালা। পুরনো শহরের গলির উপরও ছায়া দিচ্ছে গাছগাছালি। এখন থেকে দশ বছর পরে উপকথার তাসখন্দ শহরটিকে হয়তো কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রতীকরূপে যার যার ইতিহাস ও প্রাচীনতা নিয়ে হয়তো দাঁড়িয়ে থাকবে শুধু সেকালের মসজিদ-মন্দির ও রাজপ্রাসাদ এবং ভগ্ন দেয়ালের অবশেষ। কিন্তু তার জন্যে কারো খেদ থাকবে না। দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে অতিবাহিত কঠোর জীবন সংগ্রামের সাক্ষী মৃত্তিকার নড়বড়ে ঘরবাড়ীর মধ্যে

ক্লেশকর জীবনযাপনের পরিবর্তে শহরবাসীরা বসবাস করবে আরাম-আয়েশের সকল আধুনিক উপাদানে সমৃদ্ধ বহুতল পাকাপোক্ত বাড়ীতে।

বর্তমান উন্নত অবস্থার প্রকৃত মূল্যায়নের জন্য অতীতকে স্মরণ করতে হয়। রুশ বিপ্লব ১৯১৭ সালের ঘটনা, কিন্তু প্রতিবিপ্লবী শক্তি সহজে নিরস্ত হয় নি। খোদ রাশিয়াতেই তিন চার বছর গৃহযুদ্ধ চলেছিল। মধ্য-এশিয়ার অবস্থা ছিল আরো বেশী খারাপ। রাশিয়ায় ইয়োরোপীয় শিল্পবিপ্লবের ভিতভূমি কিছুটা গড়ে উঠেছিল। কিছু কিছু কলকারখানা স্থাপিত হওয়া ছাড়াও কাব্য, সাহিত্য, সংগীত, নাটক, থিয়েটার, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপ্লবপূর্ব রাশিয়া পশ্চিম ইয়োরোপের সাথে প্রতিযোগিতা করছিল। পুশকিন, তলস্তয়, দস্তয়ভস্কি, গগোল, গোর্কী, মায়াকভস্কি, পাভলভ প্রমুখ অসংখ্য কবি-সাহিত্যিক-বিজ্ঞানী রাশিয়াতে সামাজিক বিপ্লবের বীজ বপন করেছিলেন।

মধ্য-এশিয়ার অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। গোটা মধ্য-এশিয়া আমির, বেগ ও মোল্লাশাসিত ছিল। তিন সহোদর ভাই এবং আরো ২৮ জন নিকট আত্মীয়কে হত্যা করে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে নাসরুল্লাহ খান বোখারার আমীর হন। তিনি রাজনৈতিক এবং অন্যান্য কয়েদীদের জন্য ৪০ বর্গফুট আয়তনবিশিষ্ট একটি অন্ধকূপ নির্মাণ করেন। মাটির বেশ গভীরে অবস্থিত উক্ত কয়েদখানার নীচের তলার আয়তন ছিল ২০ বর্গফুট। দড়িতে ঝুলিয়ে কয়েদীদের তার মধ্যে ফেলে দেয়া হতো। আমীর তাতেও সন্তুষ্ট ছিলেন না। কূপের মধ্যে বিষধর সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর প্রভৃতির বাসা করে দিয়েছিলেন। বোখারার লোকমুখে একটি প্রবাদ ছিল, দুনিয়ায় সর্বত্র আলো উপর থেকে নীচে নামে, এখানে আলো নীচে থেকে উপরে ওঠে।

মধ্য-এশিয়ার এ অঞ্চল ইতিপূর্বে নানা যাযাবর জাতি এবং চেঙ্গিস, তৈমুর লঙ্গ প্রমুখ বহু জহলাদ বিজয়ী কর্তৃক আক্রান্ত

হয়েছে। একে একে পারসিক, বৌদ্ধ, নেস্টোরিয়ান, ক্রিশ্চানিটি প্রভৃতি বহু ধর্মও এ অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। সবশেষে আসে ইসলাম। সপ্তদশ শতাব্দীতে বিজয়ীরূপে প্রবেশ করে শেহরি খানের নেতৃত্বে তুর্ক-মঙ্গোল মানবগোষ্ঠীভুক্ত উজবেক জাতি এবং বোখারাকে রাজধানী করে স্থায়ী হয়ে বসে। তাজিকরা বিতাড়িত হয়ে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নেয়।

মধ্য-এশিয়ার দিকে রুশ জারদের লোলুপ দৃষ্টি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই পড়েছিল। নাসরুল্লাহ খানের রাজত্বকালে উজবেকিস্তান পুনরায় আক্রান্ত হয়। নাসরুল্লাহ পরাজিত হন। সমরকন্দ শহরসহ রাজ্যের বৃহদংশ রুশ শাসনাধীনে ছেড়ে দিয়ে তিনি সন্ধি করতে বাধ্য হন। তাঁকে দু'কোটি রুবল জরিমানাও দিতে হয়। বোখারার আমীর রুশ জারের অধীন সামন্ত নৃপতিতে পরিণত হন।

সৈয়দ আলিম খান বোখারার শেষ আমীর। তাঁর বিশাল রাজ্যের অবস্থা ছিল সংক্ষেপে এই ঃ মোট জনসংখ্যার তিন শতাংশ মাত্র শিক্ষিত (অক্ষরজ্ঞানী)। ওঁরা সকলেই মোল্লামুনশী। পাঠ্য তালিকায় আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ছিল না। সামন্তশ্রেণীর সাথে মিলে ওঁরাই দেশের শাসনকার্য চালাতেন। দেশটি নামেই ছিল থিওক্রাসি (মোল্লাতন্ত্র)। প্রকৃতপ্রস্তাবে আলীম খান শাসিত উজবেকিস্তান ছিল সব রকমের অনাচার অবিচার ব্যভিচার এবং দুর্নীতির কেন্দ্রভূমি। দাসপ্রথা ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল। কর্ষিত ভূমিতে প্রকৃত চাষীর স্বত্বস্বামিত্ব ছিল না। ওঁরা উৎপন্ন শস্যের এক-চতুর্থাংশ জীবিকার জন্য পেত। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্ন উত্থাপন করাও ছিল গর্হিত অপরাধ। বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলে সে ব্যক্তি নাসরুল্লাহ খান নির্মিত অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত অথবা জহলাদের হাতে নিহত হতো। স্ত্রীলোক মাত্রেই ছিল দাসী। আমীর আলীম খানের হেরেমে আবদ্ধ অসংখ্য ললনা তার লালসার শিকার ছিল। প্রদেশ জেলা গ্রাম প্রভৃতি নানা প্রশাসনিক

বিভাগে বিভক্ত এ রাজ্য বেগ, আমলিয়াকাদার এবং আকসাকাল পদবীর লোকেরা শাসন করতেন। আলিম খাঁন দেশে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কোনো স্তরের শাসকের জন্য বেতন নির্দিষ্ট ছিল না। ওঁরা সবাই কমিশনের ভিত্তিতে কাজ করতেন। প্রজাপীড়ন করে যে যত বেশী রাজস্ব আদায় করতে পারতো তাঁর কমিশন তত বেশী হতো। ওঁদের সবার এবং মোল্লাদেরও একটি করে হেরেম ছিল। দেশটি ছিল প্রায় আদিম বর্বরতার লীলা নিকেতন। এই বর্বর শাসন পদ্ধতি অব্যাহত রাখার জন্য আলিম খান তাঁর প্রভু রুশ জার, তার পরিবার ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরকে নিয়মিত অর্থ ও উপ-ঢৌকন দিয়ে সন্তুষ্ট রাখতেন। শোষণ কি পর্যায়ে পৌঁছেছিল তার প্রমাণ আলিম খানের ব্যক্তিগত অর্থবিত্ত। বিদেশী এবং রুশ ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, শিল্প, রেল কোম্পানী প্রভৃতিতে আলিম খান কর্তৃক লগ্নিকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ১০ কোটি রুবল। রাষ্ট্রীয় তহবিল এবং আমীরের তহবিলের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। রাজধানী বোখারা সহ সমগ্র রাজ্যটিই ছিল আমীরের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আমীর এতেও সন্তুষ্ট ছিলেন না। ১৯১৯-২০ সালে আমীর তাঁর দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ তুলা এবং ভেড়ার চামড়া ব্রিটেনে রপ্তানি করেন। বিক্রয়লব্ধ সম্পূর্ণ অর্থই তাঁর তহবিলে জমেছিল। মালগুদামে জমা ছিল ৩.৫ কোটি পাউণ্ড মূল্যের সোনা-রূপোর পিণ্ড এবং মোহর ইত্যাদি। তাছাড়া ব্রিটিশ ও ফরাসী ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল বিপুল পরিমাণ অর্থ। রাজ্যের বাৎসরিক রাজস্ব আয়ের ১.৮ কোটি রুবলের খুব সামান্যই সাধারণের জন্য ব্যয় করা হতো। বোখারা শহরের কেন্দ্রস্থলে এক ফালি পাকা সড়ক এবং তিনটি নামকে ওয়াস্তে সরকারী দাওয়াখানা—এই ছিল জনহিতকর কার্যের সমষ্টি।

এই শ্বাসরোধকর ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেও "জাদিদ" অর্থাৎ নতুন নামক একটি ছোট-খাটো গোপন রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছিল। এই জাদিদ দল বলশেভিকদের সহযোগিতায় আলিম

খানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। আলিম খান দুশাম্বে শহরে পালিয়ে গিয়ে বিদ্রোহের মোকাবিলা করতে চেষ্টা করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাঁকে সাহায্য-সহায়তা করতে এগিয়ে যায়। কিন্তু রাজ্যের নিঃস্ব চাষী-মজুর তাঁর সেনাবাহিনীতে যোগ না দেয়ায় ১৯২০ সালের ৫ই মার্চ তারিখে আলিম খান তাঁর শতাধিক বিবি এবং দাস-দাসী নিয়ে আফগানিস্তানে পলায়ন করতে বাধ্য হন। আলিম খানের সংগে মিলিত হয় বাসমাচী বিদ্রোহী ইবরাহিম বেগ ও তার অনুগত ব্যক্তিগণ। এগারো বছর দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে দস্যুতা ও অরাজকতা চালাবার পরে বাসমাচী সর্দার ইবরাহিম বেগ সদলবলে ধৃত হয়। এ ঘটনা ঘটে ১৯৩১ সালের ২৩শে জুন।

ফলে মধ্য-এশিয়ার জার-আশ্রিত আমীর আলিম খান বিতাড়িত হওয়ার এক যুগেরও বেশী সময় পরে মধ্য-এশিয়ায় প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হয়। একনিষ্ঠভাবে দেশ গড়ার কাজে মনোযোগ দেয়ার জন্য ওঁরা সময় পেয়েছেন মাত্র ৫০ বছর। ইতিমধ্যে অবশ্য ভাষা সংস্কৃতি ও জাতীয়তার ভিত্তিতে মধ্য-এশিয়া কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক রাজ্যে বিভক্ত হয়েছে। উজবেকিস্তান, কাজাকস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কিস্তান প্রভৃতি দেশ এখন বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারসহ আলাদা স্বায়ত্বশাসিত রাজ্য। ঐতিহাসিক বিচারে পঞ্চাশ বছর খুবই অল্প সময়। এই সামান্য সময়ের মধ্যে মধ্য-এশিয়ার মানুষ বিস্ময়করভাবে এগিয়ে গেছে। বিপ্লবপূর্ব কালের বহু নরনারী এখনও বেঁচে আছেন। সেকালের কথা স্মরণ করে রাত্রির নিভৃত নিঃসঙ্গতার মধ্যেও ওঁরা সম্ভবত শিউরে ওঠেন। সেকালের অবশেষরূপে এখনও মাটির ঘর এবং শহরে ঘিঞ্জি বস্তি কিছু কিছু আছে। কিন্তু জীবন ও জীবিকা সহজতর হয়েছে। অনাহারে অপুষ্টিতে বিনা-চিকিৎসায় স্বাধীনভাবে মরার ব্যক্তিগত "পবিত্র অধিকার" এখন কারো নেই।

কিন্তু নিয়মিত খেয়ে-পরে, বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষা করে, অসুখ-বিসুখে চিকিৎসা পেয়ে এবং যার যার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পেয়ে ও করে বাঁচার সমষ্টিগত নাগরিক অধিকার ওঁরা পেয়েছেন। কেনো বালক-বালিকার চোখে মুখে অনাহার অর্ধাহার এবং অপুষ্টিজনিত ব্যাধির চিহ্ন দেখতে পাইনি। সেদেশে এখন নিরক্ষরতা বলতে কোনো বস্তু নেই। দেশের সর্বত্র বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা আছে। শহর-পল্লীর কোথাও একজনও যাযাবর অথবা ভিক্ষুক নজরে পড়ল না। হোটেল প্রাঙ্গণে একজন বিকৃত মস্তিষ্ক লোকের সংগে দেখা হয়েছিল। কিন্তু বিবস্ত্র নয়—তার পরণেও কোট প্যান্ট ছিল।

শহর থেকে প্রায় তিরিশ-চল্লিশ মাইল দূরে এক জায়গায় একটি নবনির্মিত বিশাল মসজিদ দেখে রীতিমতো বিস্মিত হয়েছিলাম। তা'হলে শুধু পুরাতন মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ নয় নতুন মসজিদও নির্মিত হচ্ছে। কয়েক একরের একটি ফলবান বাগানের মধ্যস্থলে ঐ মসজিদ। নিপুন শিল্পীর হাতের স্পর্শ লেগেছে তার ভিতর-বাহির সর্বত্র। প্রায় দোতলাতুল্য উঁচুতে ছাদ। বিশাল বারান্দায় কারুকার্যমণ্ডিত স্তম্ভরাজি। ছাদ ও দেয়াল আরবী লিপি এবং লতাগুল্মপুষ্পে চিত্রিত। ইটের রং ফ্যাকাশে হলুদ। গোটা মেঝেয় কার্পেট পাতা। পাশে গোসলখানা, অজুর জায়গা এবং কমপক্ষে আট দশটি আধুনিক টয়লেট। নতুন হলেও মসজিদটি মধ্য-এশিয়ার প্রাচীন মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের একটি সার্থক নিদর্শন। শহর এবং গ্রামের আরো বহু মসজিদে গিয়েছি। প্রতিটি মসজিদ ফলফুলের বাগানে ঘেরা। শাখায় আপেল আঙ্গুর ঝুলছে। একটি ছোট মসজিদ প্রাঙ্গণের মাচাঙ্গে পাকা আঙ্গুরের বিপুল সমারোহ দেখে লোভ সংবরণ করতে পারিনি। অনুমতি নিয়ে অনেকে দু'চারটি করে খেয়েছিলাম। প্রতিটি মসজিদ অত্যন্ত পরিপাটি। রক্ষণাবেক্ষণ নিখুঁত। চৌবাচ্চা ছাড়াও হাত মুখ ধোয়া এবং অজুর জন্য আলাদা কল আছে। টয়লেটে কারুকার্যমণ্ডিত কালাই করা তামার বদনাও আছে—দেখতে কতকটা

গাড়ুর মতো। দেয়ালগাত্রে তোয়ালে ঝুলানো। সাবানও আছে। মসজিদগুলো কি সরকারী সাহায্যে চলে? নতুন মসজিদ কি সরকারী অর্থে তৈরী হয়? প্রশ্ন করেছিলাম। উত্তরে ওঁরা বললেন, রাষ্ট্র ধর্ম-নিরপেক্ষ। মসজিদ-মন্দির-গির্জা রক্ষণাবেক্ষণ, নির্মাণ এবং পরিচালনার জন্য সরকারী অনুদান দেয়া হয় না। তবে প্রতিটি মসজিদের নিজস্ব সম্পত্তি আগেও ছিল, এখনও আছে। নতুন মসজিদের জন্য সরকার নামমাত্র নজরে ভূমি বরাদ্দ করে। দেখেশুনে মনে হলো, মসজিদ মাত্রেরই সম্পত্তি কমপক্ষে এক একরের বেশী—কয়েক একরও আছে। উৎপন্ন শস্য মসজিদের। তা'ছাড়াও মহল্লাবাসীরা আপন আপন উপার্জন থেকে নিয়মিত চাঁদা দেন। মসজিদ পরিচালনা এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ব্যাপার দেখাশোনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান আছে। প্রতিষ্ঠানটির আরবী নাম সজলাতুল আদারাতে দ্দীনিয়াতে লে মুসলেমী এসিয়াউল-ওয়াসতী অ-কাজাকস্তান। ইংরেজিতে মুসলিম রিলিজিয়াস বোর্ড ফর সেণ্ট্রাল এশিয়া এ্যাণ্ড কাজাকস্তান। আগেই উল্লেখ করেছি প্রতিষ্ঠানের বর্তমান নির্বাচিত সভাপতি মুফতী জিয়াউদ্দীন ইবনে ইসান বাবাখান। আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত এই মণীষীর বয়স ৭২-৭৩। তিনি অনেকগুলো ভাষা জানেন। আরবী ও উজবেক ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করতে পারেন। কণ্ঠস্বর বজ্রগম্ভীর। বোর্ডের স্থায়ী অফিস এবং গ্রন্থাগার আছে। কর্মচারীর সংখ্যা পঞ্চাশ ষাট জন। বোর্ড মধ্য-এশিয়া এবং কাজাকস্তানের মসজিদের জন্য ইমাম নিযুক্ত করেন। ইমামদেরকে উচ্চশিক্ষা দানের জন্য মাদরাসা (কলেজ) আছে। বোখারার একটি প্রাচীন মাদ্রাসা এ জন্য নির্দিষ্ট। এ সম্বন্ধে পরে আরো কিছু বলবো। ইমাম মাত্রেই প্রায় মাতৃভাষার মতো সহজে আরবী বলতে পারেন। ইংরেজি বলতে পারেন খুব কম লোক। একটি ঘটনা মনে পড়লে এখনও হাসি পায়। বিনামূল্যে প্রাপ্ত আঙ্গুর-আপেল প্রভৃতি ফল এবং বিরিয়ানি কাবাব ইত্যাদি খাওয়ার

কারণেই কি না জানিনা, আমার হলো পেটের অসুখ। পল্লীর মসজিদ এবং খামারবাড়ীতে দু'তিন বার যেয়েও পরিত্রাণ পাচ্ছি না। আমাদের বাসের সংগে মেডিক্যাল টিম ছিল। কিন্তু ডাক্তার উজবেক, রুশ এবং আরবী ছাড়া অন্য কোনো ভাষা বোঝেন না, আমি শুধু ইংরেজি বলতে পারি। পেট দেখালাম। তিনি বোধ করি আমাশা মনে করে ইঞ্জেকশন দিয়ে দিলেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য অঞ্চলের মতো মধ্য-এশিয়ায়ও মহিলা ডাক্তারদের প্রাধান্য। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও শিক্ষয়ত্রীদের সংখ্যাধিক্য। মধ্য-এশিয়া এমনকি আজারবাই-জানেও এখন পর্যন্ত মুফতী প্রথা চলছে। সমাজ এবং সরকার সর্বত্রই মুফতীদের মান-মর্যাদা যথেষ্ট। ফিনল্যাণ্ডে মাত্র ১২০০ মুসলমানের জন্য একজন মুফতী আছেন। মধ্য-এশিয়ার ইমাম ও মুফতীরা নীচে ট্রাউজার এবং উপরে শার্ট, কোর্তা, সদরিয়া, চোগা প্রভৃতি পরেন। মাথায় টুপির উপরে পাগড়ি। অনেকে কোট-পাতলুন-টাইও পরেন, কিন্তু মসজিদ বা মজলিসে উপস্থিত হওয়ার সময় উপরে চোগা এবং মাথায় পাগড়ি লাগান। সুন্দর-ভাবে ছেঁটেছুটে দাড়ি রাখেন, অনেকে কামিয়েও ফেলেন। দাড়ি-গোঁফ রাখা ইমামতি এবং ধর্মনিষ্ঠার শর্ত নয়। দাড়িকামানো বুড়োও দেখেছি। কোথাও ইয়োরোপীয় হ্যাট দেখিনি। সাধারণ মানুষ কারুকার্যমণ্ডিত চতুষ্কোণ টুপি পরেন। প্রাচীনপন্থী মহিলারা, বিশেষকরে গ্রামাঞ্চলে, গোড়ালির উপরে ওঠানো সালোয়ার এবং লম্বা কামিজ পরেন, মাথায় বাঁধেন রুমাল। আধুনিকারা ইয়ো-রোপীয় পোশাক ধরেছেন, কিন্তু মিনি স্কার্ট পরেন না। সবার স্কার্ট হাঁটু ছাড়িয়ে নীচে, উপরে কোট বা জ্যাকেট। প্রসাধন দ্রব্যের উৎকট গন্ধ পাইনি। অলঙ্কারপত্রের ব্যবহারও কম। তবে একটি প্রবণতা আছে। দাঁত পড়লে ওঁরা সোনার দাঁত বাঁধান। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মধ্যেই এ শখ দেখলাম। সোনা ও ক্যালসিয়াম সংমিশ্রিত মাড়ি দেখতে বেশ লাগে। হাসির

মধ্যে সোনালি ঝিলিক। অপূর্ব! জানিনা, অপেক্ষাকৃত কম বয়সে ওদের দাঁত পড়ে যায় কি-না। ওরা কি কিছু দাঁত ফেলে দিয়ে সোনালী দাঁতে মাড়ির শোভা বৃদ্ধি করেন? এক যুবতীর সোনালী হাসি আমাকে মুগ্ধ করেছিল। রসিকতা করে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আসল দাঁত তুলে নকল দাঁত লাগিয়েছ নাকি? সে মুহূর্তের জন্য মুখ নীচু করলো, কিন্তু পরক্ষণেই কেশ দুলিয়ে সোনালী হাসি হেসে উত্তর দিল, না, না, কি যে বলেন। আমার দু'টো দাঁত নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

তাসখন্দের একটি হাইস্কুল দেখতে গিয়েছিলাম। আধুনিক স্কুল। সামনে খেলার মাঠ। চৌহদ্দির মধ্যে চমৎকার ফুল-বাগান। জিমনাসিয়ামও আছে। গান-বাজনাও শিক্ষা দেয়া হয়। এটি আরবী স্কুল নামে পরিচিত। আর উজবেক এবং রুশ তিনটি ভাষাই শিখছে বালক-বালিকারা। আরবীর উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। ছেলেদের জন্য প্যাণ্ট ও শার্ট এবং মেয়েদের জন্য স্কার্ট ও জ্যাকেট স্কুল ইউনিফর্ম। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী দু-ই আছেন। হেড মাস্টার পুরুষ। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী সবার পোশাক ইয়োরোপীয়। নীচের শ্রেণী থেকে সর্বোচ্চ শ্রেণীর প্রায় প্রতিটি কক্ষে ঢুকেছি। আরবী ভাষাভাষী কুয়েতী, সিরীয় এবং সুদানীরা ছিলেন। ওঁরা ছেলেমেয়েদেরকে আরবীতে জিজ্ঞাসা-বাদ করলেন। ছাত্রছাত্রীরা নির্ভুল উত্তর দিয়েছিল। আমার সীমিত আরবী জ্ঞান নিয়েও আমি বুঝেছিলাম এ বিদ্যালয়ে আরবীকে একটি আধুনিক ভাষা হিসেবে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। মূর্খতা সম্প্রসারণের অসৎ লক্ষ্যে ভাষার উপর পবিত্রতা আরোপ করা হচ্ছে না। ভাষা পবিত্রও নয়, অপবিত্রও নয়ঃ সারিবদ্ধ শব্দ ভাব-বিনিময়ের মাধ্যম মাত্রঃ ভাষা যুগপৎ জ্ঞান বিকিরণ এবং মূর্খতা সম্প্রসারণের সর্বোত্তম অস্ত্র। অন্য যেকোনো উন্নত ভাষার মতো আরবী ভাষাও সেদেশে জ্ঞানদানের মাধ্যমরূপে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। অনুন্নত দেশে শুধু আরবী নয়, ইংরেজি বাংলা প্রভৃতি সব ভাষাই মূর্খতা সম্প্রসারণের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ফেরার পথে চোখে পড়লো একটি স্বাস্থ্যবান সুশ্রী বালক ঃ পরনে হাফপ্যাণ্ট। শার্ট ও জুতো খুলে রেখে উদোম গায়ে লক্ষ্যহীন ঢিল ছুড়ছে। এটাই খেলা। আমাদের দেশেও ছেলেরা অযথা ঢিল ছোড়ে। মানব চরিত্র পৃথিবীর সর্বত্রই বুঝিবা এক। সবাই উদোম জন্মায়। লক্ষ্যহীন ঢিল ছোড়া এবং লক্ষ্যহীন জীবনযাপনের মধ্যে পার্থক্য ক্ষীণ। যাঁদের লক্ষ্যাদর্শ আছে তাঁরা গতানুগতিক জৈব-জীবনে প্রবহমানতার বেগ প্রদান করে। লক্ষ্যাদর্শের ভিতভূমি তৈরী করেন দার্শনিক-বিজ্ঞানী। জীবন দান করে জাতি। সহসা ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্ন উপস্থিত হয়। শত শত বছরের অভ্যাস বর্জন করে মানবসভ্যতা দৃপ্ত পদক্ষেপে নবদিগন্তের দিকে এগিয়ে যায় ঃ গড়ে ওঠে যুগোপযোগী নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতি। শুকনো পাতা বর্জন করে বৃক্ষ ঃ নতুন সবুজ কিশলয়ে সমৃদ্ধ হয় তার শাখা-প্রশাখা। মধ্য-এশিয়ার মানুষ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে যুগোপযোগী পূর্ণতার দিকে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই জাতির বৃহত্তর কল্যাণ এবং সুখ-সমৃদ্ধির লক্ষ্যে উৎপাদনকর্মে নিযুক্ত।

রাতে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েছিলাম। স্থান—তাসখন্দের একটি প্রেক্ষাগৃহ। উজবেক লোকসংগীত, নৃত্য এবং ক্লাসিক সব কিছুই পরিবেশন করলেন শিল্পীরা। বাদ্যযন্ত্রের সংগে আমাদের পরিচিত বাদ্যযন্ত্রের ঘনিষ্ঠতা সুস্পষ্ট। শুধু তবলা নেই। তার জায়গায় মৃদঙ্গ—আমরা যাকে খোল বলি তাই। ভাষা কোন বাধা হয়নি। সংগীতের সুর তাল লয় অন্তর্মূলে প্রবেশ করছিল। মনে হচ্ছিল, আমাদের পরিচিত উচ্চাঙ্গ সংগীত ও লোকনৃত্যের আসরেই যেন আছি। মধ্য-এশিয়ার সংগে আফগানিস্তান এবং পশ্চিম ভারতের যোগসূত্র দীর্ঘ দিনের। শক হুন মোগল পাঠানেরা ঐ অঞ্চল থেকেই ভারতবর্ষে প্রবেশ করে-ছিল। ঐ অঞ্চলে এমনকি ককেশাস পর্বতের পাদমূলে অবস্থিত সোভিয়েত আজারবাইজানেও প্রাচীন ভারতীয়দের যাতায়াতের ঐতি-হাসিক নিদর্শন আছে। তাই গৃহনির্মাণ পদ্ধতিতে, শিল্পকর্ম ও

বাদ্যযন্ত্রে, সংগীত ও সুরের মূর্চ্ছনায় ও আবেদনে, নৃত্যভঙ্গিমা প্রভৃতিতে সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। তবে আমাদের দেশের মতো সেদেশেও ইয়োরোপীয় প্রভাব পড়েছে। পৃথিবীর কোথাও এখন অবিমিশ্র আদিম সাংস্কৃতিক আভিজাত্য বলে কিছু নেই। উজবেকিস্তানের ১·৭ কোটি লোকও কোনো অবিমিশ্র মানবগোষ্ঠীর নয়। তুর্কী মঙ্গোল প্রভৃতি নানা গোষ্ঠীর লোক মিলে বর্তমান উজবেক জাতি। দেশের অধিকাংশ লোক মুসলমান। আরবী নামের লোকের সংখ্যাই বেশী মনে হ'লো।

তাসখন্দের একটি স্থায়ী শিল্প প্রদর্শনীও দেখলাম। বিপ্লবপূর্ব উজবেকিস্তানে আধুনিক বৃহৎ শিল্প বলতে কিছুই ছিল না। এখন উজবেকিস্তানে টেলিফোন সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক তার ও যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ী, মালবাহী এ্যারোপ্লেন, রেলগাড়ীর ইঞ্জিন, মেশিন টুলস প্রভৃতি বহু কিছু তৈরী হচ্ছে। বস্ত্র ও সুতাকল তো আছেই কিন্তু কুটির শিল্পও বর্জন করা হয়নি। এখানকার কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি নকসা ও নির্মাণ-কৌশল মিলিয়ে চমৎকার। হাতের কাজ করা চতুষ্কোণ টুপি খুবই জনপ্রিয়।

একটি পুরানো পাণ্ডুলিপি এবং গ্রন্থ সংরক্ষণাগার (মিউজিয়ম) দেখার সুযোগও পেয়েছিলাম। মিউজিয়মে অতীতকালের বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিক দার্শনিক-বিজ্ঞানীদের দুষ্প্রাপ্য পুথিপুস্তক আছে। মিউজিয়মের একজন মহিলা অফিসারের সংগে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করেছিলাম। তিনি ইংরেজি জানেন। তাঁর সাথে কথা বলে জানতে পারলাম, প্রতিষ্ঠানটির পরিচালকের সর্বোচ্চ বেতন ৫৫০ রুবল। রিসার্চ অফিসারদের স্কেল ১৫০—২৫০ রুবল। সকালে কিছুক্ষণের জন্য এসে যাঁরা ঘর ঝাড় এবং আসবাবপত্র মুছে দিয়ে যান তাঁরা পান ৭০ রুবল—এটাই তাসখন্দের সর্বনিম্ন মাসিক বেতন। সর্বনিম্ন বেতনভোগীরা প্রায় সবাই অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্কা মহিলা। ইচ্ছে করলে ওঁরা এখানকার কাজ সেরে অন্য কাজও করতে পারেন। মহিলা নিজে রিসার্চ অফিসার। স্বামী ইঞ্জিনিয়ার—এ শহরেই কর্মস্থল। দু'কামরার

ফ্লাটে থাকেন। রান্নাঘর, টয়লেট, বাথরুম প্রভৃতি সব কিছুই আছে। গ্যাস, ইলেকট্রিসিটি প্রভৃতির চার্জসহ মাসিক ভাড়া মাত্র ১০ রুবল। প্রতি ফ্লাটে টেলিফোন আছে। তার জন্য মাসে দিতে হয় ২ রুবল। একটি ছেলে। বয়স ১১। তার শিক্ষার যাবতীয় ব্যয় সরকার বহন করে। চিকিৎসা ফ্রী। সোভিয়েত ইউনিয়নে অত্যাবশ্যক নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী এবং খাদ্যদ্রব্যের দাম সর্বত্র সমান এবং অত্যন্ত কমও। জন্ম-গ্রহণমাত্র শিশু আলাদা সরকারী ভাতা পায়। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মাত্রেই নিয়মিত পেনশন পান। তাই বুড়ো বাপ-মা সমেত যৌথ পরিবার হোক, আর স্বামী-স্ত্রীর আলাদা পরিবার হোক সেদেশের কোনো পরিবার অভাব-অনটন-অনাহার-অর্ধাহারে নেই।

মধ্য-এশিয়ার ভূমি উর্বর নয়। ঝুরঝুরে ঊষর মাটি। কিন্তু ব্যাপক জলসেচের সাহায্যে ফসল উৎপন্ন হচ্ছে। বিপ্লবের আগে আধুনিক পদ্ধতির জলসেচ ব্যবস্থা ছিল না। তুলনায় ইয়োরোপীয় রাশিয়া অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল। মস্কো-লেনিনগ্রাদের সমমানের এ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটি এ অঞ্চলে এখনও গড়ে ওঠেনি, কিন্তু ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের জনজীবনের চেয়ে শতগুণে সমৃদ্ধ এবং উন্নত মধ্য-এশিয়ার জনজীবন। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন আয়ের মধ্যে ব্যবধান ১ঃ৮। মন্ত্রী এবং অধ্যাপক সমান বেতন পান। উভয়ের বেতন ৫৫০ রুবল। গ্রামবাসী তাঁর বাড়ীর চতুঃসীমার মধ্যে যেকোনো শস্য উৎপাদন করতে পারেন। তুলা এবং গম ছাড়া বাকী সবকিছু—যেমন তরিতর-কারি, ফলফুল, হাস-মোরগ, ডিম-দুধ প্রভৃতি খোলা বাজারে সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রয়ের অধিকার তাঁর আছে। গম ও তুলা নির্ধারিত মূল্যে সরকারের কাছে বিক্রী করতে হয়। সরকারী ও যৌথ খামারে কর্মরত শ্রমিক তাঁর প্রদত্ত শ্রম (ঘন্টা-দিন) অনুপাতে পারিশ্রমিক পান। যৌথ খামারে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম আছে শুন-লাম। উৎপাদন ব্যয় বাদে যে ফসল উদ্বৃত্ত থাকে সেটা খামার সদস্যদের মধ্যে শ্রমের হিসেবে ভাগ করে দেয়া হয়। পারি-

বারিক প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত থাকলে, তুলা ও গম বাদে, ঐ ফসলও তাঁরা খোলা বাজারে বিক্রী করতে পারেন। পল্লী অঞ্চলে বসতবাড়ীর জন্য দু'হেক্টরের শতকরা ১৫ ভাগ, আমাদের হিসেবে ৭৫ শতাংশ, জমি দেয়া হয়। এটা গৃহস্বামী ইচ্ছেমতো ভোগ-তছরূপ করতে পারেন, কিন্তু বিক্রয় করতে পারেন না। উত্তরাধিকারীরা ভোগ-তছরূপের মালিক হয়। অপরদিকে সরকার-নির্মিত শহরের বহুতল বাড়ীর ফ্লাট যেকোনো নাগরিক ক্রয় এবং উত্তরাধিকারসূত্রে সেটার মালিক থাকতে পারেন। সুতরাং সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যক্তিগত উদ্যোগ সম্পূর্ণ বন্ধ বলা যায় না। এবং উক্ত সীমারেখার মধ্যেও নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরা রীতিমতো সচ্ছল জীবনযাপন করে। গাভী, ছাগল, দুম্বা, হাঁস, মোরগ প্রভৃতি পশুপক্ষী বহু বাড়ীতে দেখেছি। ওগুলো বেশ পুষ্ট নাদুস-নুদুস। কোনো কোনো অঞ্চলের গাভী নাকি দৈনিক ১৫ সের দুধ দেয়। নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে বাকী দুধ অথবা দুগ্ধজাত দ্রব্য খোলা বাজারে বিক্রীও করা যায়।

সম্মেলনে যোগদানকারী নিমন্ত্রিত অতিথিদের সম্মানে উজবেকিস্তান সরকার একটি ভোজের আয়োজন করেছিলেন। সরকারী ভবনের এক বিশাল হলঘরে ভোজ। কমপক্ষে চার-পাঁচ শত লোক নিমন্ত্রিত। উজবেক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রীরাও উপস্থিত ছিলেন। মুফতী জিয়াউদ্দীন বাবা খানও যোগ দিয়েছিলেন। বক্তৃতা ও খানাপীনা যুগপৎ চলছিল। কোনো মদ ছিল না। এতো রকমের খানার আয়োজন আমি খুব কম দেখেছি। বিরিয়ানী, রোস্ট, স্টেক, কাবাব, চপ, কাটলেট, নান রুটি; পাউরুটি, মাখন, পনীর, সবজির সালাদ প্রভৃতি থেকে শুরু করে হেন খাদ্য এবং ফলফলারি নেই যা টেবিলে ছিল না। গুণে দেখিনি, তবে মনে হলো বিশ-পঁচিশ রকমের খাবারতো হবেই। প্রতিটি আইটেমের কিঞ্চিৎ স্বাদ গ্রহণের দুর্লোভ সামলাতে না পারার ফলেই সম্ভবত পরদিন পেটের

পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলাম। এ ধরণের বড় ভোজে আরো দু'এক-বার শামিল হতে হয়েছে।

তাসখন্দের একটি বিশাল বস্ত্র ও সুতাকল ঘুরে ফিরে দেখেছি। সর্বাধুনিক কলকব্জা। মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা বেশী। শুনলাম, সোভিয়েত ইউনিয়নের সতত সম্প্রসারণশীল কারখানা এবং কৃষি-শিল্পের প্রয়োজনের তুলনায় শ্রমিকের সংখ্যা অপেক্ষকৃত কম। তাই যতটা সম্ভব যন্ত্রের ব্যবহার।

তাসখন্দে অবস্থানকালে আমরা প্রতিদিন শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে গিয়েছি। বেশ চওড়া পিচঢালা রাস্তা। বিপরীতগামী যানবাহন চলাচলের সময় গতি কমাতে হয় না। বিশাল বিশাল কৃষি খামারের মাঝখান দিয়ে অথবা খামার ঘেঁষে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পথ চলে গেছে। তুলা, গম, শাক-সবজি এমনকি ধানের চাষও দেখেছি। চমৎকার ফলেছে ধান। বৃষ্টিপাত সামান্য। জলসেচ ব্যবস্থা ব্যাপক। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই শুধু এতো অল্প সময়ের মধ্যে এমন ব্যাপক জলসেচ ব্যবস্থা এবং রাস্তাঘাট নির্মাণ সম্ভব। বিশাল তুলার খামার দেখতে দেখতে পথ চলছিলাম। সহসা মনে হলো আমি যেন এক সীমাহীন পুষ্পোদ্যানের মধ্য দিয়ে চলছি। তুলাও তো ফুল বটে, এ ফুল থেকে আতর-গোলাপ তৈরী হয় না, কিন্তু তুলা মানুষের লজ্জা নিবারণ করে। বস্ত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবের চেয়েও ঘনিষ্ঠ ঃ শীত গ্রীষ্মের সতত সাথী। প্রস্ফুটিত তুলাফুল চয়ন করছে অগণিত নরনারী। প্রত্যেকের সংগে ঝুড়ি। স্থানে স্থানে মোটর লরি দাঁড়িয়ে। ঝুড়ি ভরলে লরিতে ঢালা হয়। উপরে মধ্য-এশিয়ার মেঘমুক্ত আকাশের সূর্য। প্রখর তাপ। নীচে হালকা-শুকনো বাতাস। মহিলারা লাল সালোয়ার-কামিজ পরে মাথায় প্রকাণ্ড রুমাল বেঁধে সারিবদ্ধভাবে তুলা চয়ন করছেন। আমাদের চা বাগানের কথা মনে পড়লো। দু'টি পাতা একটি কুঁড়ি চয়ন করেন মহিলারা। কিন্তু পার্থক্য বিরাট। চা বাগানে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত মূল্য সবটাই ভোগ করে বিলাস-ব্যসনে

লিপ্ত অপব্যয়ী মালিক। সোভিয়েত ইউনিয়নের খেত-খামারে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত মূল্য সরাসরি রাষ্ট্রীয় তহবিলে জমা হয়। সে তহবিলের টাকা সবটাই ব্যয় হয় জনজীবনকে ক্রমান্বয়ে অধিক থেকে অধিকতর সুন্দর ও সুখী করার কাজে। প্রতিপক্ষ সাম্রাজ্য-বাদী শিবির অস্ত্রের প্রতিযোগিতা এবং আধিপত্যের প্রতিযোগিতা বন্ধ করে মানব কল্যাণের মহৎ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে এলে সমগ্র বিশ্ব শান্তি-উদ্যানে পরিণত হতো, মানবজীবন গোলাম, বেকারত্ব, বর্ণবাদ, ধর্মীয় দাঙ্গা প্রভৃতি থেকে মুক্ত হতো ।

মালভূমির মধ্যেও উপত্যকা-অধিত্যকা। বিচিত্র বর্ণালির দেশ। সব বাধা-বিপত্তি ভেদ করে এগিয়ে গেছে উঁচু পাকাসড়ক। মানুষ প্রকৃতির প্রতিকূলতাকে অনুকূল করেছে ঃ স্টিফেন স্পেন্ডারের কবিতার একটি পঙক্তি মনে পড়লো। বিলেতী যুবতীর সোনালী চুল দেখে তিনি লিখেছিলেন ঃ Fantastic flare of southern sun। এখানে দক্ষিণের সূর্যাভার সংগে সবুজ শস্যের বিভাও দেখলাম। সহসা ডান পাশের নীচু ভূমিতে চোখে পড়লো সুন্দর ধানখেত। একজন লোক পাকা ধান কাটছেন। লোকটি নিঃসঙ্গ একা। তাঁর ডান হাতে আদিকালের বাঁকা কাস্তে, বাঁ হাতে কাটা ধানের ছড়া। দেশের কথা মনে পড়লো। কিন্তু বাংলার শ্রমিকের মতো গামছা পরা উদোম-গা নয় লোকটি। পরনে প্যাণ্ট, গায়ে হাওয়াই শার্ট। বেশ হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর চেহারা তাঁর। একবার আমাদের ধাবমান মোটরের দিকে তাকালেন। তারপর আবার ধান কাটতে লাগলেন। বিশাল মাঠে একা কেন তিনি? বসতবাড়ীতে ছাড়া অন্য কোথাও কাউকে নিঃসঙ্গ একা কাজ করতে দেখিনি। তবে কি বসতবাড়ীর বাইরেও কোনো কোনো অঞ্চলে ব্যক্তিগত উদ্যোগে চাষবাস করার অনুমোদন আছে? সেদিন আমার সাথে কোনো ইংরেজি ভাষা জানা দোভাষী ছিলেন না। আরবী ভাষায় ওরূপ জটিল প্রশ্ন করার এবং তার জবাব বোঝার ক্ষমতা আমার নেই। তাই বিষয়টা প্রশ্ন হয়েই রইলো। আজ জীবন সায়াহ্নে এসে আফসোস হয়, কেন আরবী-ফার্সী ভাষার চর্চা অব্যাহত রাখিনি।

বারো

সেপ্টেম্বর মাসের ১৪ তারিখ। সকাল সাড়ে দশটার বিমানে আন্দিঝান গন্তব্যস্থল। চল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিটের বিমান পথ। সবটাই পর্বতাকীর্ণ। স্থানে স্থানে উপত্যকা। পাহাড়ের বুকের উপর দিয়ে উপত্যকা থেকে উপত্যকান্তরে চলে গেছে পাকাসড়ক। প্রতিটি উপত্যকায় শস্য-শ্যামল জনপদ—বিমান থেকে ছোট ছোট শহরের মতো দেখায়। মনে হয় শহরের মতো প্ল্যান করে তৈরী। সংস্কৃত 'পুর' শব্দের অর্থ শহর। সেকালের "পুরে" এ কালীন জীবনের সুযোগ-সুবিধা অবশ্যই ছিল না। এ যুগের সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইয়োরোপীয় গ্রাম মাত্রেই এ কালীন শহরের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা—বিজলী বাতি, রেডিয়ো, টেলিভিশন, টেলিফোন, পরিশুদ্ধ পানীয় জল, সেনিটেশন ব্যবস্থা প্রভৃতি সবকিছু আছে। অনুন্নত এশিয়ার বহু "পুর" এখনও এসব থেকে বঞ্চিত। কিন্তু কেন? এ প্রশ্নের যথার্থ জবাবের মধ্যেই রয়েছে উন্নতির পথ।

উপত্যকায় অবস্থিত ছোট শহর আন্দিঝান। পাহাড়ের গা ঘেঁষে ছোট-খাটো বিমানবন্দর। মনে হলো নতুন। আয়তনে ছোট হলেও শহরটি বেশ সুন্দর। প্রাচীন জনপদ বলেই মনে হলো। সড়কের উভয় দিকে কাঁচা পাকা উভয় জাতীয় ছোট ছোট বাড়ীঘর। বহুতল দালানকোঠা বিরল। পুরাতন এবং নতুন মুখোমুখী দাঁড়িয়ে। অপ্রশস্ত গলিকীর্ণ পুরনো বস্তির সামনে নব-জীবনের স্রোত। একটি মসজিদে যাওয়ার পথে চমৎকার দৃশ্য চোখে পড়লো। প্রবহমান সেচখালের উভয় তীর ঘেঁষে অপ্রশস্ত সড়ক। কায়ক্লেশে গাড়ী চলে। দু'তীরে গাছপালা। ছায়াশীতল

স্বচ্ছ পানির মন্থর স্রোত। সড়ক ঘেঁষে উভয় তীরে সারিবদ্ধ বাড়ী-ঘরের বস্তি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আঙ্গুরলতা ঝুলছে। পারাপারের জন্য স্থানে স্থানে দেশী সাঁকো। কোষাজাতীয় ছোট ছোট নৌকোও দেখলাম। এমন সুন্দর ছায়াঘন পরিবেশ এ অঞ্চলে এর আগে দেখিনি। এখানে সাধারণ কর্মী গৃহস্থ মানুষেরা বসবাস করেন। তবু মনে হচ্ছিল, বড় মনোরম এই স্থানটি। ইচ্ছে হচ্ছিল, ঐ ক্যানালের প্রবাহে অবগাহন করি। অপ্রশস্ত এ খালের তীরের কাছেই মাঝারি আকারের প্রাচীন মসজিদ। গেটের ভিতরে ঢোকার আগেই বস্তির বালক-বালিকারা ভিড় করেছিল। ওদের লাল টুকটুকে চেহারা, হাস্যোজ্জ্বল মুখ আমার মনে এক অপূর্ব মমত্ববোধের সঞ্চার করলো। স্বাস্থ্যবান শিশু মানবসমাজের পুষ্প—বয়স্ক লোকের জন্য অনাবিল আনন্দ।

মসজিদের আঙ্গিনায় আঙ্গুরলতার মাচাঙ্গ ইমামের হুজরা পর্যন্ত বিস্তৃত। মাঝখান দিয়ে সানবাঁধানো পাকা পথ। মাথার উপরে নাগালের মধ্যে অসংখ্য পাকা আঙ্গুর ঝুলছে। খেতে পারি? প্রশ্ন করতেই ওঁরা বললেন—খাওয়ার জন্যেইতো, যতো ইচ্ছে খান। গুটিকতক খেলাম। জোহরের নামাজের পর মধ্যাহ্ন-ভোজন মসজিদ প্রাঙ্গণেই হলো। খাবারের সংগে বে-এন্তেহা ফলের সমাহার, সবশেষে বিরিয়ানী। মধ্য-এশিয়ার বিরিয়ানী আমাদের পরিচিত বিরিয়ানীর চেয়ে কিছুটা ভিন্ন রকমের। মাংসের টুকরো ছোট ছোট। ঘি'র পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম—কতকটা আফগানী খোশকার মতো। শিক কাবাব আমাদের পরিচিত শিক কাবারের চেয়ে সুস্বাদু। নান রুটি আবশ্যিক আইটেম।

অন্য একটি ইতিহাসখ্যাত সুদৃশ্য স্থানের উল্লেখ করতে ভুলে গেছি। বিমান থেকে অবতরণ করেই আমরা সম্রাট বাবরের জন্মভূমি ফারগনায় যাই। আন্দিঝান থেকে ৩০-৪০ মাইল দূরে ফারগানা নদী। নদীর উপরে সেচ বাঁধ। বাঁধে ধরে আনা জল দু'টি সেচ খালে পড়ছে। সেচ খাল থেকে সেই জল আবার অপ্রশস্ত নালা কেটে কৃষি-

ক্ষেত্রে নেয়া হচ্ছে। আন্দিঝান শহরে এ পানি দেখেছি। বাঁধের উপরে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালাম। অপূর্ব দৃশ্য। বিপরীত দিকে অনুচ্চ পাহাড়। নদী সান্নিধ্যে বলেই হয়তো নিরেট নয়। হরিতে শোভিত পাহাড়ের গা। বিদ্যুৎও উৎপন্ন হচ্ছে বাঁধে। বাঁধের পাশে কিছু বাগান-ঘেরা বাড়ী। বড় বড় দালানকোঠা নয়, আমাদের চৌচালা ঘরের মতো ঘর—একটি ছোট আধুনিক গ্রাম। বাঁধের কাজে নিযুক্ত লোকেরা সম্ভবত ওখানে বাস করে। জায়গাটিকে সযত্নে সাজানো যেন একটি উদ্যান মনে হচ্ছিল—এ যেন এক অন্য জগৎ, অন্য জীবন। সেচ খাল দু'টির মধ্যবর্তী ভূমিতে বেশ কিছু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত সুন্দর বাগান। বড় ছোট সব রকম গাছ ছায়া দিচ্ছে। মাঝখান দিয়ে সানবাঁধানো পায়ে হাঁটা পথ। কিছুটা এগুতেই দোতালা রেস্ট হাউস। আমরা ওখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম, ঝরনার পরিশুদ্ধ জলে তৃষ্ণা নিবারণ করলাম।

বাবর ছিলেন প্রকৃতপ্রস্তাবে একজন কবি। সেকালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি হয়তো তাঁকে দুঃসাহসিক যোদ্ধা হতে বাধ্য করেছিল। জয়-পরাজয়ের মাঝে যদি বাঁচার অন্য কোনো পথ না থাকে তা'হলে মানুষের পক্ষে জয়ী হওয়ার চেষ্টা করাই স্বাভাবিক। বাবর তা-ই করেছিলেন। যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে জীবন কাটালেও বৈদগ্ধ, নান্দনিক চেতনা এবং মানবিক মূল্যবোধের স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন। তাঁর জীবন-স্মৃতি আজও বিশ্ব-সাহিত্যের সম্পদ। ফারগানার অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই সম্ভবত তাঁর মনকে আজীবন শিশিরস্নাত করে রেখেছিল। ফারগানায় তিনি ফিরে যেতে পারেননি। কিন্তু আগ্রায় মৃত্যুবরণ করা সত্ত্বেও কাবুলকে আপন সমাধিস্থল নির্বাচিত করেছিলেন, বাবরের কবর কাবুলে। ফারগানার হাওয়া কাবুল স্পর্শ করে যায় হয়তো এই ছিল বাবরের ধারনা।

ফারগানার সেচ বাঁধ থেকে আন্দিঝান ফিরে যাচ্ছি। আমার গাড়ীতে উঠলেন এক সুশ্রী যুবক। আমার গা ঘেঁষে বসলেন।

বয়স তিরিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে। স্বাস্থ্যবান। উজ্জ্বল গায়ের রং। পরনে প্যান্ট-শার্ট এবং কোট। দাড়ি কামানো। ছেটেছুটে গোঁফ রাখেন। বাস চলছে। যুবকটি ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোন্ দেশের লোক? আমি বললাম, বাংলাদেশ আমার দেশ। আমার উত্তর শোনামাত্র তিনি অন্তরঙ্গ উষ্ণতার সংগে বললেন, O! Sheik Mujibur Rahman's Bangladesh—ও! শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশ? আমার চিত্ত আলোড়িত হলো। যুগপৎ রোমাঞ্চ এবং তীব্র কষাঘাতের যন্ত্রণা অনুভব করলাম। সত্যিইতো আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান। কিন্তু অন্তঃস্বত্বা মহিলা এবং নাবালক শিশু-সহ সপরিবারে শেখ মুজিবুর রহমানকে শুধু হত্যাই করা হয়নি, স্বাধীন বাংলার ইতিহাসের পাতা থেকে তাঁর স্মৃতি মুছে ফেলার জন্যও চেষ্টা চলছে। কিন্তু মধ্য-এশিয়ার অজানা পল্লীর এক যুবকের কাছে এখনও বাংলাদেশের পরিচয় শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলা-দেশ। বিশ্বের অন্যত্রও হয়তো তাই। শেখ মুজিবুর রহমান-হীন বাংলাকে কে জানতো ১৯৬৯-৭১ সালে!

লজ্জায় অধোবদন হতে হলো। তাঁর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বাইরের সবুজ শস্যক্ষেত্রের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে বললাম: হ্যাঁ ভাই, আমি বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেশেরই লোক। যুবকটি বোধ করি আমার মনের অবস্থা বুঝে থাকবেন। শেখ মুজিবুর রহমানকে কেন হত্যা করলো অকৃতজ্ঞ বাংগালী? তিনি পরবর্তী স্বাভাবিক প্রশ্নটি করে আমাকে বিব্রত করলেন না। সুদানের এক ভদ্রলোক আমাকে এক সময়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: তোমরা পাকিস্তান ভাঙ্গলে কেন? তাইতো, শেখ মুজিবকে হত্যা এবং সেই সংগে বাংগালী জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র প্রভৃতি যদি বর্জনই করলাম, তা'হলে পাকিস্তান ভাঙ্গলাম কেন? পরে বলবো বলে সুদানী ভদ্রলোককে এড়িয়ে গিয়েছিলাম। মনে পড়লো সেকথা। সংগী প্রসংগান্তরে চলে গিয়ে আমাকে বাঁচালেন। জিজ্ঞাসা করলেন:

আপনার নাম? বললাম। যুবকটি অত্যন্ত খুশী হয়ে জানালেন, তাঁর নামও শামসুদ্দীন। জানি, পৃথিবীতে শামসুদ্দীন নামের লক্ষ লক্ষ লোক আছেন। গতায়ু শামসুদ্দীনদের স্থান অধিকার করছে নতুন শামসুদ্দীনেরা। তবু তুজুকে বাবুরী নামক বিশ্ব ক্লাসিকের লেখক, ভারতবর্ষের প্রথম মোগল সম্রাট বাবরের জন্মভূমি ফারগানার স্নিগ্ধ সুন্দর পরিবেশে একজন মিতা পেয়ে মনে মনে খুশী হয়েছিলাম।

মসজিদ প্রাঙ্গণে মধ্যাহ্নভোজের পর আমরা ২৫-৩০ মাইল দূরের একটি সমবায় কৃষি খামারে গেলাম। কয়েক শ' হেক্টর আয়তনের বিশাল খামার। প্রধানতঃ তুলা চাষ হয়। ফলফলারির চাষই অল্পবিস্তর আছে। প্রবেশমুখে ছোটখাটো দোতালা অফিস এবং তত্ত্বাবধান ও হিসেবপত্রের কার্যে নিযুক্ত স্থায়ী কর্মচারীদের বাসাবাড়ী। একটি ছোটখাটো কৃষি মিউজিয়মও আছে। শিক্ষার সংগে নান্দনিকবোধ এবং সচ্ছলতার সমাবেশ ঘটলে মানুষ যে কত সুন্দরভাবে তার জীবনকে উপভোগ করতে পারে তার প্রমাণ এখানে পেলাম। ঘনবসতিপূর্ণ আমাদের দেশের তুলনায় এসব অঞ্চল প্রায় জনহীন প্রান্তর। কাছেকোলে শহর-বন্দর নেই। শহরের সংগে একমাত্র যোগসূত্র বাস এবং সাইকেল। সংখ্যায় অল্প হলেও বাসিন্দারা প্রায় নির্জন এ স্থানটিকে শুধু মনোরম নয়, বিদেশী পর্যটকদের জন্যও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। দৈর্ঘ্যে অনুমান ১০০ গজ এবং প্রস্থে ২০-৩০ গজ একটি জায়গা ঘন শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লবশোভিত বৃক্ষরাজি দ্বারা বেষ্টিত। মধ্যস্থল সানবাঁধানো পাকা। মরুর মধ্যে নিবিড় ছায়াশীতল ওয়েসিস যেন। খামার পরিচালকেরা ঐ স্থানটিতে আমাদের স্বাগত জানালেন। রকমারি খাদ্য, ফলফলারি এবং মিষ্টি পানীয়ের সমাবেশ লম্বা খাবার টেবিলে। চারদিকে বসার চেয়ার। আমরা আসন গ্রহণ করতেই বাজনা বেজে উঠলো। চেয়ে দেখি এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে কয়েকজন যুবক স্থানীয় ভাষায় গান ধরেছেন। সম্ভবত লোকসংগীত। ব্যক্ত ভাব ও ভাষা

বুঝিনি। এ অঞ্চলের লোক কয়েকশ' বছর ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছিলেন। তাই নির্মাণ পদ্ধতিতে অল্পবিস্তর পার্থক্য থাকলেও বাদ্যযন্ত্র সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়। সুরের সংমিশ্রণও ঘটেছে। তবে কিনা নানা বিবর্তন সত্ত্বেও উত্তম সুর এবং উত্তম চিত্রমাত্রেরই বিশ্বমানবিক আবেদন আছে। তাই মধ্য-এশীয় মালভূমির প্রচণ্ড রৌদ্রদগ্ধ বিকেলে "ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়"ঐ স্থানটিতে শ্রুত গীতবাদ্য আমার অন্তর্গভীরে অনাবিল আনন্দের সঞ্চার করেছিল। মনে পড়ছিল বাল্যকালের কথা। কৃষি-শ্রমিকেরা ভর দু'পুরের খর-রোদে পাটখেত আউশখেত নিড়াতেন। ঘুঘু ডাকা উদাস মধ্যাহ্নে ওঁরা সমবেত কণ্ঠে গান ধরতেন, "জলভর বিরলরে কন্যা জলে দিয়া ঢেউ" অথবা "ধরিয়া চালের কোণা কান্দন করেগো বলি ও বন্ধু দাঁড়াওরে আইজ তারে দেইখা লই জনমের তরে রে বন্ধু।" আমি আইলে বসে প্রাণভরে শুনতাম ঐ গান। বাজনা ঐ সংগীতের মধ্যে কৃত্রিম ঝঙ্কার তুলতো না। তবু বড় ভালো লাগতো শুনতে। বালক হৃদয়ের তন্ত্রীগুলো আপনা-আপনি মৃদু ঝঙ্কারে বেজে উঠতো ঐ সংগীতের তাল লয় সুরের সংগে। সেকাল গেছে। আজ আর বাংলার মানুষ পাট খেতে ধান খেতে ভর দুপুরে সমবেত কণ্ঠে পল্লী বাংলার সুখ দুঃখের গান গায় না। সুখ দুঃখ বোধের জন্য যে সর্বনিম্ন উপাদান উপাচার আবশ্যক তার সংস্থানও নেই ওদের জীবনে।

ছায়ায় বসে বাইরের রৌদ্রঝলসিত ফসলের মাঠের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সংগীরা আহার্য গ্রহণে ব্যস্ত। আমার প্রবীণ উদরে স্থানাভাব। খনিজ পানিতে চুমুক দিতে দিতে স্বদেশের দারিদ্র্যপীড়িত পল্লীর কথা ভাবছিলাম। খেত খামারের পাশে ও-রকম নিষ্পাপ আনন্দকেন্দ্র গড়ে উঠতে পারতো না কি বাংলার পল্লীতেও? কেন সন্ধ্যাবাতির পরেই বাংলার পল্লী আজ স্তব্ধ মৃতপ্রায়? কিসের অভাব? জীবন প্রবাহের কোথায় ফাঁক? মন উত্তর দেয়ঃ স্থির লক্ষ্যাদর্শ এবং কর্তব্যসচেতন জাতীয় নেতৃত্বের।

ঐ অঞ্চলের আরো একটি মসজিদ দেখতে গিয়েছিলাম আমরা। স্বাগত সংবর্ধনা জানালো মস্ত বড় এক জনতা। স্থানীয় পোশাক-পরিচ্ছদে ভূষিতা মহিলারা ছিলেন। ছিল বালক-বালিকারাও। কেন জানিনা আমার মতো একজন বৃদ্ধের উপর ফুটফুটে এক ছোট্ট বালিকার দৃষ্টি পড়লো। হাতে তার প্রস্ফুটিত তাজা গোলাপ। সে মায়ের হাত ছাড়িয়ে এগিয়ে এলো। ফুলটি তুলে দিল আমার হাতে। আমি হৃদয়ভরা খুশিতে ফুলটি হাতে নিলাম। শিশুর মুখে প্রথম প্রভাতের স্নিগ্ধ হাসি, সাফল্যের আনন্দ চোখে মুখে। তাকে বুড়ো হাতে আদর করে দিলাম। ইচ্ছে করছিল কোলে নিয়ে চুমু দিই। কিন্তু সে তার আগেই মায়ের কোলে ছুটে গেল।

মধ্য-এশিয়ার মেহমানদারিতে এখনও প্রাচীন রীতি রেওয়াজ চলে আসছে। প্রথম মসজিদের মেজবানেরা আমাদের প্রত্যেককে উপহার দিলেন এক টুকরো স্থানীয় সুতীবস্ত্র। আমার হতে পেলাম একটি করে হাতের কাজ করা সুন্দর চারকোণ টুপি। ও টুপি ওঁরা পরেন। সেদেশে খালি মাথা বিরল। আমরা সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার দিকে তাসখন্দ ফিরে এলাম।

তেরো

পরদিন বোখারার প্রোগ্রাম। সকাল সাড়ে ন'টার একটু পরে বিমান ছাড়লো। দশটা বিশ মিনিটে বোখারা বন্দরে অবতরণ করলাম। ইরানী কবি রত্নখচা সমরকন্দ-অ-বোখারাকে অমর করে গেছেন। প্রিয়ার মুখের একটি কালো তিলের বিনিময়ে তিনি সমরকন্দ ও বোখারাকে বিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এ ঘোষণার ফলে তাঁর প্রিয়া অমর হননি। অনিত্য মানবজীবনে প্রিয়াও অনিত্য। আগমন-নির্গমন ব্যক্তিমানুষের নিয়তি। কিন্তু মানবসমাজের ইতিহাস আছে। ইতিহাস নিত্য প্রবহমান জীবনের মতোই স্থায়ী। কবি সমরকন্দ এবং বোখারার জন্য স্থায়ী ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন। বোখারায় অবতরণ করে মনে পড়লো হাজার হাজার বছরের প্রাচীন ইতিহাস। মধ্য-যুগে মুসলিম সংস্কৃতি ও সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র বোখারা রাজ্য। আবু আলী ইবনে সীনা, আধুনিক বীজগণিতের জনক মোহাম্মদ ইবনে মুসা আল্‌খাওয়ারেজমী, জ্যোতিবিজ্ঞানী মোহাম্মদ আলী ফারগানী, আবু নাসের ফারাবী, আবু বকর আর রাজী, আবু রায়হান আল বিরুনী, ইমাম বোখারী প্রমুখ অসংখ্য বিশ্ববিখ্যাত মুসলীম বিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক চিন্তাবিদের জন্মস্থান তৎকালীন সামানিদ রাজ্য, যার রাজধানী ছিল বোখারা।

বোখারা এখন খুব বড় শহর নয়। লোকসংখ্যা দু'লক্ষ। বোখারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈদেশিক ভাষা বিভাগের গ্র্যাজুয়েট এক পরমা সুন্দরী তরুণী আমাদের "ইংলিসিয়া" গাইড ও দোভাষী। চমৎকার ইংরেজি বলেন তিনি। আমরা মসজিদ মাদ্রাসা রাজ-প্রাসাদ প্রভৃতি প্রাচীন কীর্তি ঘুরে ফিরে দেখছিলাম। তরুণী

মুখস্থ আবৃত্তি করার মতো সহজে আমাদের সবকিছু বুঝিয়ে বলছিলেন। রুশ জার-আশ্রিত বোখারার শেষ আমীর আলিম খান এবং তাঁর কার্যকলাপের উল্লেখ অন্যত্র সংক্ষেপে করেছি। এক সময়ে তাঁর প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গসদৃশ প্রাসাদে প্রবেশ করলাম। এটি এখন মিউজিয়ম ঃ ঢাল-তরোয়াল, ভয়াবহ কুঠার, নেজা, বল্লম, তীর, ধনুক, প্রভৃতি নানা রকমের অস্ত্রশস্ত্র, সুবর্ণখচিত পানপাত্র, জড়োয়া চোগা-চাপকান দেখলাম। আমীরের দরবারে জল্লাদ সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকতো। "অপরাধীদের" নির্যাতন স্থানটিও দেখলাম, কিন্তু ঐ অন্ধকূপে প্রবেশ করার সাধ্য ছিল না। শাসিত অঞ্চলের গণ-মানুষের চরম দারিদ্র্য এবং অশিক্ষার মধ্যেও বোখারার আমীরের আমীরানায় কমতি ছিল না। প্রাচীর ঘেরা বিস্তীর্ণ স্থান। রাজপ্রাসাদ ঘিরে বাগান। বৃক্ষচ্ছায়া এবং সরোবর। যুবতী নারীদের নিয়ে জলকেলীর ব্যবস্থা ছিল বলেই মনে হয়। লাক্ষ্ণৌর বুলবালায়া প্রাসাদের প্রাঙ্গণে অবস্থিত জলাশয়ে নাকি ও রকম ব্যবস্থা ছিল। আলিম খানের প্রাসাদে রক্ষিত বিলাসদ্রব্যাদি এবং প্রজাপীড়ন ও নির্যাতনের ব্যবস্থাদি দেখার পর, লেনিন কর্তৃক আত্মনিয়ন্ত্রন ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার প্রদত্ত হওয়া সত্ত্বেও কেন মধ্য-এশিয়ার মুসলমানরা সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্যরূপে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তার সঠিক উত্তর পেতে গবেষণার দরকার হয় না। আগেই বলেছি, এ অঞ্চলে শান্তি স্থাপিত হয় ১৯৩১ সালে। উজবেকিস্তান আনুষ্ঠানিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নে যোগদান করে বিপ্লবের প্রায় এক যুগ পরে। কিন্তু স্মরণীয় যে, রুশ বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই বহু ভারতীয় বিপ্লবী তাসখন্দে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ১৯২১ সালে এম. এন. রায়ের নেতৃত্বে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি প্রথম সেখানেই গঠিত হয়। ঐ অঞ্চলের মুসলিম জনসাধারণ আর্থ-সামাজিক বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত না থাকলে, শুধু অল্প সংখ্যক রুশ কম্যুনিস্ট ও সৈনিকের সহায়তায় ভারতীয় বিপ্লবিগণ ওখানে ওঁদের কার্যকলাপ চালাতে পারতেন.

না। ভারতীয়দের ট্রেনিং দেয়ার জন্য সেখানে একটি প্রশিক্ষণ-কেন্দ্রও খোলা হয়েছিল। এম. এন. রায়ের আত্মচরিত, অধিকারীর ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির ইতিহাস এবং কুনিজের 'ডন ওভার সমরকন্দ' প্রভৃতি গ্রন্থে মধ্য-এশিয়ার তৎকালীন অবস্থার বিবরণ আছে।

যতদূর মনে পড়ছে, আমাদের গাইডের নাম মাস্তুরা মোজা-ফারোভা। ফারসী-আরবী মিশ্রিত নামের অন্ত্যাক্ষরটিই শুধু রুশ। গ্রীবা পর্যন্ত ঝুলন্ত ঘন চুলের মধ্যে নিখুঁত প্রতিমার মতো তার মুখটি। কথার সংগে হাসি লেগেই আছে। দু'টি সোনালী দাঁত সোনালী আলো বিকিরণ করছিল। পাখীর কাকলির মতো শ্রুতিমধুর তার কণ্ঠস্বর। সে কথার ফাঁকে ফাঁকে আমাদের কাছে কম্যুনিস্ট পার্টি সম্পাদিত উন্নয়নমূলক কাজের বর্ণনা দিচ্ছিল। আমার সংগী ছিলেন শ্রীলঙ্কার ভূতপূর্ব ধর্মনিষ্ঠ মন্ত্রী, অশীতিপর বৃদ্ধ বদিউদ্দীন আহমদ। তিনি তরুণীকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য? সে উত্তর দিল, হ্যাঁ। বদিউদ্দীন সাহেব পরবর্তী প্রশ্ন করলেন, তুমি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর? মাস্তুরা অপ্রস্তুত হয়নি। সে উত্তর দিল, ইয়েস, হ্যাঁ। বুঝলাম, মধ্য-এশিয়ার মুসলমান সমাজতন্ত্রকে গণ-মানুষের কল্যাণক্ষম একটি আর্থ-সামাজিক-প্রশাসনিক পদ্ধতিরূপে গ্রহণ করেছেঃ ঈশ্বর এবং পরলোকে আস্থার সংগে ইহলোকের আর্থ-সামাজিক জীবন এবং তার সংগঠনকে এক করে ফেলেনি।

বোখারার একটি দর্শনীয় বস্তু মীর আরব মাদ্রাসা। ষোড়শ শতাব্দীতে স্থাপিত এ মাদ্রাসা আগের মতো এখনও মধ্য-এশিয়ার উচ্চতম ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র। মধ্যযুগের মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন এই মহাবিদ্যালয় ভবনের প্রশস্ত আঙ্গিনায় বসে আমরা বিশ্রাম করছিলাম। টেবিলে ফলের রস, নাস্তা এবং চা। যাঁর যেমন খুশি সদ্ব্যবহার চলছিল। মাদ্রাসাটি প্রকৃতপক্ষে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। শুধু মধ্য-এশিয়ার নয়, ভলগা এবং

ককেশাস অঞ্চলের ছাত্ররাও উচ্চ ইসলামী শিক্ষার জন্য এখানে আসে। আভার, আজারবাইজান, কিরঘিজিয়া, কাজাকস্তান, তাজি-কিস্তান, তুর্কমেনিয়া, তাতারিয়া, উজবেকিস্তান প্রভৃতি নানা দেশের নানা জাতির নানা ভাষাভাষী মুসলিম ছাত্র বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে একত্রে বসবাস এবং পড়াশোনা করে। ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞাত এবং আরবী ভাষায় প্রাথমিক জ্ঞানসম্পন্ন তরুণদের এখানে ভর্তি করা হয়। আরবী ভাষা এখানে শিক্ষার মাধ্যম। বর্তমান কালের উপযোগী করে সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছে। কোরান হাদিস ফেকাহ প্রভৃতি ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও আধুনিক আরবীভাষা শিক্ষা দেয়ার উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। ভূগোল, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, উজবেকভাষা এসবও সিলেবাসে আছে। এ মাদ্রাসায় শিক্ষিত আলেমগণ মাতৃভাষার মতো সচ্ছন্দে আরবী বলতে পারেন। এমনকি পিয়ানো সহযোগে আরবী গানও তাঁরা গাইতে পারেন।

প্রাচীন এ মহাবিদ্যালয়ের সদর দরজার রোয়াকে বসে স্বদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার কথা ভাবছিলাম। আমাদের মাদ্রাসায় শিক্ষিত মৌলবিদের মধ্যে শতকরা ক'জন খাঁটি আরবদের সংগে আরবীতে সচ্ছন্দে সব বিষয়ে কথাবার্তা বলতে পারেন? শতকরা ক'জনের আধুনিক আরবীভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান আছে? শতকরা ক'জন বিশ্ব ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ-বিজ্ঞান এবং মাতৃভাষায় মোটামুটি দখল রাখেন? শতকরা ক'জন স্বাধীন বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে ঐতিহাসিক বাধ্যবাধকতাধীন আধুনিক বিশ্বের জটিল ইহজাগতিক ও ধর্মীয় সমস্যাবলীর ব্যাখ্যা করতে এবং সমুদ্ভূত প্রশ্নাবলীর উত্তর দিতে পারেন? আগেই বলেছি, পৃথিবীর কোনো ভাষাই পবিত্র অপবিত্র অথবা বিশেষ কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের ভাষা নয়। হাজার হাজার বছর আগে ভাষার জন্ম হয়েছে। প্যাগান আমলের আরবী ভাষার উত্তরাধিকারী মুসলিম সম্প্রদায়। নারী-পুরুষের যৌনাচার এবং অশ্রাব্য গালি-গালাজ হতে শুরু করে উচ্চমার্গীয় দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক চিন্তা-

ভাবনা প্রকাশ করার উপযুক্ত শব্দাবলী প্রতিটি উন্নত ভাষায় আছে। বিশেষ কোনো ভাষায় দক্ষতা-অদক্ষতা অথবা বিশেষ ধরণের পোষাক-পরিচ্ছদ মানুষকে নেককার বদকার ধর্মনিষ্ঠ ধর্মচ্যুত করে না। আরবীভাষা বিশ্বের উন্নত ভাষাগুলোর অন্যতম। জীবন্ত ভাষারূপে নিত্য গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে আরবীভাষাও অন্যান্য উন্নত ভাষার মতো সতত শক্তি অর্জন করছে। আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে ইদানিং নোট বই চলছে। পরীক্ষায় ব্যাপক নকল হচ্ছে। ফলে লম্বা কোর্তা টুপি পাগড়ি প্রভৃতি লেবাসী এলেম নিয়ে মাদ্রাসা হতে বের হওয়ার পরেও অধিকাংশ লোক প্রকৃতপ্রস্তাবে অশিক্ষিত থেকে যান। তাই জ্ঞানের পরিবর্তে ওঁরা ধর্মের নামে সমাজে মূর্খতা সম্প্রসারণের কাজ করে বেড়ান। পরিণামে লাভবান হয় দেশের জালেম শ্রেণী। আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষার এ অধঃপতন ওয়ারেণ হেস্টিংস স্থাপিত কলকাতা মাদ্রাসার সূত্র ধরে হয়েছে। এককালে হলেও, ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত মাদ্রাসা শিক্ষা অদ্যাবধি কোনো আলবিরুনী, ইবনে খালদুন, ইবনে সীনা, আলকিন্দী, আলফারাবী, এমনকি মওলানা আবুল কালাম আজাদ সৃষ্টিতেও সক্ষম হয়নি। মওলানা আজাদ ব্রিটিশের প্রবর্তিত মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করেন নি। শ্রেণীস্বার্থান্ধ রাজনীতি এখন পর্যন্ত মাদ্রাসা শিক্ষাকে পঙ্গু করে রেখেছে।

বোখারার অন্য দর্শনীয় স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শনসমূহের মধ্যে কল্যাণ মিনার (১১২৭-২৯), সামানিদ স্মৃতিসোধ (৯-১০ম শতাব্দী), চশমায়ে আইয়ুব (১৪শ শতাব্দী) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নকশবন্দীয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতারূপে খ্যাত শেখ বাহাউদ্দীন নখশবন্দীর খানকা বোখারার অপর একটি প্রসিদ্ধ ও দর্শনযোগ্য স্থান। জায়গায় জায়গায় প্রাচীর ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু মসজিদটি এখন পর্যন্ত অটুট আছে। খানকাটি এখন তীর্থস্থানরূপে গণ্য। প্রাঙ্গণে সেকালের একটি গভীর কুয়ো। পানি এখনও স্বচ্ছ। স্থানীয় লোকদের বিশ্বাস, ঐ কুয়োর পানি সর্বরোগনাশক মহৌষধ। একজন খাদেম আছেন। তিনি পানি তুলে দিলেন। সকলের

সাথে আমিও এক পেয়ালা পানি খেলাম। আমি বহুমূত্ররোগী। এ রোগ এখনও আছে। তবে ঐ কুয়োর ঠাণ্ডা পানি তৃষ্ণা নিবারণ করেছিল। সন্ধ্যায় আবার ফিরে এলাম তাসখন্দে।

•

চৌদ্দ

১৬ই সেপ্টেম্বর। সকাল দশটার কিছু পরে সমরকন্দ পেঁছি-লাম। বিশ্বত্রাস তৈমুরলঙ্গের রাজধানী হওয়ার অনেককাল আগেও সমরকন্দের খ্যাতি ছিল দুনিয়া জোড়া। ইতিপূর্বে ইরানী কবি হাফিজের বিশ্ববিখ্যাত দু'টি পঙক্তি "আগর আঁ তুর্কে শিরাজী বদস্ত আরদ দিলে মারা, বখালে হিন্দুয়শ বখশম সমরকন্দ ও বোখারা"র উল্লেখ করেছি। এ সম্বন্ধে একটি চমৎকার গল্প প্রচলিত আছে। ইরান জয়কালে এ পঙক্তি দু'টি শুনে তৈমুরলঙ্গ নাকি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং হাফিজকে ডেকে পাঠান। তাঁর রাজধানী সমরকন্দ। ওটাকে এত স্বল্পমূল্যে বিলিয়ে দেয়ার প্রস্তাব! দুঃসাহসতো কম নয়। হাফিজ তৈমুরের দরবারে হাজির হয়ে যা বলেছিলেন, তার দু'রকম বিবরণ আছে। কারো কারো মতে হাফিজ নাকি বলেছিলেন, "জাঁহাপনা, শেষ পঙক্তির "সমরকন্দ অ বোখারার" স্থানে হবে "দো মন কন্দ অ সী খোর্মারা"—অর্থাৎ দু'মন চিনি এবং তিন মন খোর্মা। অন্য মতে হাফিজ নাকি বলেছিলেন "হুজুর, আমি আজকাল ঐ রকম অমিতব্যয়ী হয়ে পড়েছি।" কথিত আছে কবির উত্তর শুনে তৈমুর অত্যন্ত খুশী হন এবং তাঁকে পুরস্কার দিয়ে বিদায় করেন। অবশ্য, তৈমুর-লঙ্গের সংগে হাফিজের আদৌ সাক্ষাৎ হয়েছিল কি না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

সমরকন্দে পেঁছে প্রথমেই তৈমুরলঙ্গের নাম মনে পড়লো। তিনি শুধু বাগদাদ দামেস্ক দিল্লী প্রভৃতি সেকালের জনবহুল শহর ধ্বংস এবং রাজপথে রক্তস্রোত প্রবাহিত করেন নি, তৈমুরলঙ্গ রাশিয়ার রাজধানী মস্কোও দখল করেছিলেন। এক বছর মস্কো

তাঁর দখলে ছিল। বিশ্বত্রাস তৈমুরলঙ্গ এবং বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী উলুঘ বেগেরও রাজধানী ছিল সমরকন্দ।

প্রাচীন এবং আধুনিক উভয় অংশ মিলিয়ে সমরকন্দ এখন বেশ বড় শহর—লোকসংখ্যা নাকি ১৫ লক্ষ, তাসখন্দের পরেই তার স্থান। তৈমুর এবং তাঁর বংশধরদের রাজধানী এ শহরে তৎকালীন এশিয়া ইয়োরোপের বহু স্থান থেকে বিপুল ধনরত্ন লুণ্ঠন করে আনা হয়েছিল। সেই সংগে বাগদাদ দামেস্কসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের শিল্পী, কারিগর, ইঞ্জিনিয়ার, স্থপতি এবং জ্ঞানীগুনী ব্যক্তিদেরকেও কখনও বন্দী করে, কখনও বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সংগ্রহ করা হয়। সমরকন্দের স্থাপত্য নিদর্শন-গুলোতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পাহাড়, অধিত্যকা এবং উপত্যকার সমতলভূমি মিলিয়ে বর্তমান সমরকন্দ শহর। স্থানটির সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের খ্যাতি কেন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল তা বিমান থেকে অবতরণের পর আমাদের প্রথম দর্শনীয় স্থান মির্জা উলুঘ বেগের অবজারভেটরিতে (মানমন্দির) যাওয়ার পথেই বুঝতে পারলাম। মানমন্দিরটি একটি পাহাড়ের সানুদেশে অবস্থিত। গাইডেরা বললেন, এটি ছিল একটি চারতলা দালান। খনন-কার্যের পর নীচের তলার মেঝেয় গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য নির্মিত ভূগর্ভস্থ কক্ষ ও তার সুড়ঙ্গটি উদ্ধার করা হয়েছে। পাহাড়ের উপরে অবস্থিত মানমন্দিরের পাকা মেঝের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে গোটা সমরকন্দ শহরটি দেখা যায়। সে এক চমৎকার দৃশ্য।

মানমন্দির সংলগ্ন একটি ছোট দালানে ছোট মিউজিয়ম। এখানে শুধু উলুঘ বেগ নয়, মধ্য-এশিয়ার মধ্যযুগের বহু মণীষী সম্পর্কিত নানা তথ্য সংগ্রহ করে রাখা আছে। প্রাচীন পাণ্ডুলিপিও বেশ কিছু দেখলাম। উলুঘ বেগ প্রণীত গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী এবং গাণিতিক চার্ট‌ও আছে। সমসাময়িক বা প্রায় সমসাময়িক ইয়োরোপীয় চার্ট এবং উলুঘ বেগের চার্ট পাশাপাশি রাখা আছে। আজকের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের চার্টের

সাথে উলুঘ বেগ প্রণীত চার্টের পার্থক্য খুব সামান্য—উলুঘ বেগ রাজা ছিলেন। কিন্তু রাজকার্যের চেয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের কাজেই তিনি বেশী সময় ব্যয় করেছিলেন। সেটা ছিল ষড়যন্ত্র ও হত্যার রাজনীতির যুগ। হজরত ওসমানকে হত্যার মধ্য দিয়ে মুসলিম জগতে হত্যার রাজনীতির সূত্রপাত। মুসলিম রাজনীতিতে ভাই কর্তৃক ভাই হত্যা, পুত্র কর্তৃক পিতা হত্যা, ভ্রাতুষ্পুত্র কর্তৃক পিতৃব্য হত্যা এবং পুত্রের দ্বারা পিতা-মাতা বন্দী হওয়ার বহু দৃষ্টান্ত আছে। শিল্প-সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে মুসলিম শাসকগণ অবদান রেখেছেন সত্য, কিন্তু তার পাশাপাশি ক্ষমতা দখলের জন্য পৈশাচিক নরহত্যা ও বর্বরতার অসংখ্য নজীরও তাঁরা স্থাপন করে গেছেন। সে ঐতিহ্য থেকে মুসলিম জগৎ এখনও নিষ্কৃতি পায় নি। শান্তির ধর্ম ইসলাম উচ্চাভিলাষী মুসলিম শাসক এবং রাজনীতিকদের উপর কোনোরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল বা করেছে এমন কোনো তথ্যগত প্রমাণ নেই। ধর্মকে ওঁরা স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়াররূপে ইচ্ছে মতো ব্যবহার করেছেন।

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী এবং সুশাসক উলুঘ বেগ তাঁর ক্ষমতালোভী দুর্বৃত্ত পুত্র কর্তৃক শৃঙ্খলিত হন। পুত্রের নির্দেশে পুত্রনিযুক্ত জল্লাদ তাঁর শিরোশ্ছেদ করে। অজ্ঞাতনামা শিল্পী এর একটি তৈলচিত্র এঁকেছিলেন। সেটি দেখে আমি শিউরে উঠেছিলাম। শাজাহান এবং তার পুত্র আওরঙ্গজেব উভয়েই পিতৃদ্রোহী। আওরঙ্গজেব পিতাকে বন্দী এবং তিন ভ্রাতাকে ধর্মের নামে হত্যা করেছিলেন। সহসা আমার মনে প্রশ্ন জাগলো, উলুঘ বেগের পুত্রই কি ছিল ওদের আদর্শ ? আরো মনে জাগলো একটি অত্যন্ত কটু ঐতিহাসিক সত্য। আবুজর গিফারী এবং পরবর্তীকালে ইমাম আবু হানিফা ছাড়া অন্য কোনো খ্যাতিমান মুসলিম আলেমের নাম মনে পড়ছে না যিনি বা যাঁরা পিতৃঘাতক, ভ্রাতৃঘাতক জালেম ও যুদ্ধবাজ মুসলিম শাসকদের সংগে সহযোগিতা করা থেকে বিরত ছিলেন অথবা তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ইমাম গাজ্জালিতো প্রকারান্তরে শাসকশ্রেণীর হুকুম

মেনে চলার নির্দেশই দিয়েছেন। ভবিষ্যজ্ঞানী লোকমান হবু-জালেমকে হত্যা করেছিলেন। লোকমান কোরানের কাহিনীতেই রহে গেলেন। তথাকথিত আলেম শ্রেণী কাহিনীটির তাৎপর্য উপলব্ধি করলেন না। কেন এ ব্যর্থতা? এ প্রশ্নের উত্তর কারো কাছে পাইনি।

সমরকন্দ বোখারা তাসখন্দ তিনটিই অতি প্রাচীন জনপদ। সির দরিয়া ও আমু দরিয়া মধ্য-এশিয়ার প্রধান নদী। এই নদী দুটোর কোনো না কোনটির প্রবাহ তিনটি শহরকেই ছুঁয়ে গেছে। খৃস্টপূর্ব কালেও এই জনপদ তিনটি ছিল অশ্ব ও উষ্ট্র পৃষ্ঠারোহী বণিকদের কাফেলার পথে। পথটি গোবী মরু হয়ে চীনের প্রাচীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মিশর, এশিয়া মাইনর, ইরান প্রভৃতি দেশ এবং সুদূর প্রাচ্যের মধ্যে ওটাই ছিল সংযোগপথ। অনেকের মতে, সমরকন্দ জনপদের বয়স কমপক্ষে তিন হাজার বছর।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে খাওয়ারিজমের মোহাম্মদ শাহ ছিলেন মধ্য-এশিয়ার বাদশাহ। তাঁর রাজ্য একদিকে বাগদাদ এবং অপরদিকে ভারত সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সমরকন্দ, বোখারা, খীবা, বলখ, হিরাত প্রভৃতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান ছিল তাঁর রাজ্যভুক্ত। তৎকালীন বোখারা ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার কেন্দ্র। অসংখ্য বিদ্যালয় এবং মসজিদ শহরের শোভা বর্ধন করতো। তৎকালীন জনৈক পর্যটক সমরকন্দ সম্বন্ধে লিখেছেন, "শহরের চতুর্দিকে মাইলের পর মাইলব্যাপী স্থান জুড়ে ফলবান বৃক্ষরাজি, কুঞ্জবন, ফুলের বাগান, এ্যাকুয়াডাক্ট, প্রবহমান ঝর্ণা, বড় বড় চতুষ্কোণ জলাধারা এবং গোল তালাব। সত্যি সত্যিই সমরকন্দ অত্যন্ত মনোরম এবং আনন্দদায়ক স্থান।" সেকালের রীতি অনুযায়ী সমরকন্দ এবং বোখারা উভয় শহর ছিল সুদৃঢ় প্রাচীরবেষ্টিত। গোবী মরুসর্দার বিশ্বত্রাস চেঙ্গিজ খান উভয় শহর ভস্মীভূত এবং শহরবাসীদেরকে পাইকারিভাবে হত্যা করেন। এ ঘটনা ঘটে ১২২০ খৃষ্টাব্দের দিকে। চেঙ্গিজ খাঁর বাহিনী

ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে এলেও কি ভেবে ভিতরে প্রবেশ করেনি। দিল্লী সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পায়। মোহাম্মদ শাহ আত্মসমর্পণ করেন নি। কাস্পিয়ান সাগরের এক দ্বীপে কপর্দকহীন অবস্থায় তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। স্মরণীয় যে, চেঙ্গিজের মৃত্যুর দশ বছর পরে তাঁর এক সেনাপতি মস্কো দখল করেন।

চেঙ্গিজের আক্রমণের আগের সমরকন্দের কোনো দালান-কোঠা, মসজিদ-মন্দির এখনও বিদ্যমান আছে কিনা জানি না। তবে তাঁর উত্তরপুরুষরূপে পরিচিত তৈমুরলঙ্গ এবং তাঁর পরবর্তীদের রাজধানী সমরকন্দের বহু কীর্তি বেশ ভালোভাবেই বিদ্যমান। ফলফুলের বাগান, প্রবহমান ঝর্ণা, এ্যাকুয়াডাক্ট, সেচখাল প্রভৃতি সম্ভবত আগের চেয়েও উন্নত। বিদ্যুৎশক্তি এবং আধুনিক কারিগরি দক্ষতা সেগুলোর শ্রী ও সংখ্যা দুই-ই বৃদ্ধি করেছে। সমরকন্দ একালেও এক আশ্চর্য সুন্দর শহর। এতো অধিক সংখ্যক মনোরম এবং বিশাল প্রাচীন কীর্তিরাজির একত্র সমাবেশ বিরল ব্যাপার। এথেন্স এবং রোমে থাকলে থাকতেও পারে। মিশরে বিশালতা আছে, কিন্তু সৌন্দর্য কতটুকু জানি না। সমরকন্দের প্রাচীন কীর্তিরাজি দেখার পর তাজমহল এবং ফতেপুর সিক্রি ছাড়া দিল্লী আগ্রা লাহোর প্রভৃতি শহরের মুসলিম আমলের সমস্ত কীর্তি আমার কাছে সহস্র প্রদীপদীপ্ত দীপাধারের কাছে একান্তে জ্বলন্ত পিলসুজের বাতি মনে হয়েছে। সমরকন্দের স্থাপত্য শিল্পের সাথে কতকটা তুলনা হতে পারে সম্রাট আকরব নির্মিত ফতেপুর সিক্রির। নিঃসন্দেহে মোগল স্থাপত্য শিল্পের প্রেরণা ছিল সমরকন্দ-বোখারা।

আমাকে আরো একটি বিষয় বিস্মিত করেছে। ধ্বংসোন্মুখ অগণিত বিশাল বিশাল মসজিদ, মাদ্রাসা, রাজপ্রাসাদ, প্রাচীর, দুর্গ, বুলন্দ দরজা—এমনকি কবরস্থানকেও পূর্ব-মহিমা ও সৌন্দর্যে পুনরুদ্ধার করার অত্যন্ত ব্যয় বহুল ও দুঃসাধ্য কাজে হাত দিয়েছেন সোভিয়েত উজবেকিস্তান সরকার। তিনটি সুউচ্চ বুলন্দ দরজা-শোভিত একটি জায়গায় ঢুকে বহুক্ষণ স্তম্ভিত বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। উলুঘ বেগ স্থাপিত মাদ্রাসা ছাড়াও আরো তিনটি প্রাচীন

মাদ্রাসা আছে সেখানে। প্রবেশপথে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি জুড়ে মনোরম ফুল বাগান এবং ফোয়ারা সেকালকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। রাজপ্রাসাদতুল্য দালানকোঠা, মিনার, সুউচ্চ বুলন্দ দরজা, সংলগ্ন মসজিদ প্রভৃতি প্রায় প্রতিটি ইমারতকে তার প্রাচীন কারুকার্যসহ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। সোনালী, রূপালী, সাদা, কালো, হলদে প্রভৃতি যে রং যেখানে যেমন ছিল—যেমনটি ছিল আরবী-ফার্সী লিপিচিত্রণ এবং অন্য নানা ধরণের শৈল্পিক কারুকার্য—অবিকল তেমনি পুনর্জীবিত করা হয়েছে। আসলে স্থানটি সম্ভবত ছিল তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চল। মাদ্রাসা চৌহদ্দির মধ্যে অবস্থিত একটি ছোট মসজিদের ভেতর-বাইরের দেয়ালগাত্র, মেহরাব, এবং ছাদের সোনালী কারুকার্য ও লিপি-চিত্রণের কোনো তুলনা হয় না। সেকেন্দ্রার সলিম চিশতির ক্ষুদ্র সমাধি সৌধটিতো তুলনায় নিষ্প্রভ মনে হয়। নাম সোনালী মসজিদ। মসজিদটির মেহরাব ও মিম্বরে উৎকীর্ণ সোনালী কারুকার্যের দিকে বহুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। টাকা-পয়সা থাকলে সবকালেই খরচ করা যায়। কিন্তু এখন থেকে চার পাঁচ শ' বছর আগে, প্রচলিত শিল্পবোধই সৃষ্টি করতো তৎকালীন শিল্পী ও কারিগর। সময়ের হিসেব ছিল না। অপরদিকে দাস-প্রথাভিত্তিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় শিল্প ও কারিগরি বিদ্যা ছিল পুরুষানুক্রমে লব্ধ দক্ষতা ও অভ্যাস। পুনরুদ্ধারকার্যের জন্য এযুগে ও ধরণের কারিগর ও শিল্পী কেমন কোথায় পাওয়া গেল আমার কাছে অর্থের চেয়ে সেটাই ছিল বেশী বিস্ময়ের ব্যাপার। পরে শুনলাম, পুনরুদ্ধার কাজের জন্য শিল্পী ও কারিগরদেরকে বিশেষ ট্রেনিং দেয়া হয়। জাতির প্রাণস্পন্দন সতত জাগ্রত থাকলে সবকিছুই সম্ভব ঃ মরুও তখন উদ্যান হয়ে ওঠে। শুধু পুন-রুদ্ধারের মধ্যে সীমিত নয় কাজ ঃ সংরক্ষণ ব্যবস্থাও নিখুঁত। পরিচ্ছন্নতা এবং পরিবেশের সংগে সাযুজ্যতাও দর্শককে আকৃষ্ট করে। উপমহাদেশের প্রাচীন কীর্তিরাজির কিছু কিছু দেখেছি। পরিচ্ছন্নতার অভাব প্রায় সর্বত্র। পরিবেশ এবং প্রতিবেশকে অসমঞ্জস

করার প্রবণতাতো আছেই। ঢাকার কার্জন হল এবং পুরনো বিজ্ঞানভবনের পাশে নবনির্মিত শিক্ষাভবন এবং বিজ্ঞানভবন তার দৃষ্টান্ত। পুনরুদ্ধারের প্রতি ঔদাসীন্য প্রতিবেশী ভারতের অজন্তাতেও দেখেছি। ক্রমে ক্রমে অস্পষ্ট এমনকি বিলীন হয়ে যাচ্ছে অজন্তা-গুহার বিশ্ববিশ্রুত দেয়ালচিত্র।

তৈমুরলঙ্গ এবং তাঁর পরের রাজা-বাদশা ও বেগমদের গোরস্থানও এক বিস্ময়কর স্থান। পাহাড়ের গোড়া থেকে সানুদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল গোরস্থানটি প্রকৃতপক্ষে অসংখ্য সুরম্য হর্ম্য সুশোভিত একটি ছোটখাটো আলাদা শহর। শহরটিকে দু'ভাগে ভাগ করে উপরে উঠে গেছে নাতিপ্রশস্ত একটি পাকারাস্তা। ইচ্ছে করলে জিপ গাড়ী চালানো যায়। উভয়দিকে প্রাচীর এবং তার মধ্যে সারি-বদ্ধভাবে নির্মিত ছোট ছোট কুঠরি। সুরক্ষিত দুর্গের প্রবেশদ্বার মনে হয়। সম্ভবত সশস্ত্র প্রহরীরা থাকতো। রাজ-রাজড়ার মরদেহও নিরাপদ নয়। এখন প্রহরী নেই। কুঠরিগুলো শূন্য। কোনো কোনো সমাধি রাজপ্রাসাদের মতো বিশাল এবং উঁচু। প্রবেশ করলে অন্য জগৎ। একটি প্রাসাদ এখন মিউজিয়ম। সেকালের বহু নিদর্শন রাখা আছে। তৈমুরলঙ্গ, তাঁর পরিবার এবং উত্তরপুরুষদের সমাধিসৌধটির মেঝের উপরে তাজমহলের মতো নকল কবর। সুড়ঙ্গপথে ভূগর্ভে প্রবেশ করলে যে প্রকোষ্ঠটি পাওয়া যায় সেখানে প্রকৃত কবর। বিজ্ঞানী বাদশা উলুঘ বেগও সেখানেই শায়িত। মৃতের এ শহরটির অধিকাংশ সুদৃশ্য সৌধ চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর। সমরকন্দের সমাধিসৌধের সাথে দিল্লীর আগ্রার সমাধিসৌধের শৈল্পিক সাদৃশ্য স্পষ্ট। তৈমুরলঙ্গ নিজে ১৩৩৬-১৪০৫ খৃষ্টাব্দের লোক।

যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক পন্থায় মোটামুটি প্রামাণিক হাদিস সংকলক-রূপে ইমাম আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি। তিনি ১৯৪ হিজরিতে জন্মগ্রহণ এবং ২৫৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। প্রায় বারোশ' বছর আগের কথা। এখনও

এই জ্ঞানসাধকের নাম মুসলিম জগতে বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। বোখারা রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন, তাই তিনি ইমাম বোখারী নামেই বেশী পরিচিত। তাঁর কবর জেয়ারত করার বাসনা ছিল। পূরণ হলো। বর্তমান বোখারা শহরে তাঁর কবর নয়। সমরকন্দ থেকে বাসযোগে প্রায় এক ঘণ্টার পথ ঐ জায়গা। সমরকন্দের পাহাড়-পর্বত, টিলাময় উপকণ্ঠ ছাড়িয়ে বেশ দূরে নিভৃত পল্লীর সমতল ভূমিতে হজরত ইমাম বোখারীর ছোট সমাধিসৌধ এবং তার পাশেই বিশাল মসজিদ। মসজিদের সামনে কয়েকটি প্রাচীন ওক গাছ। বিশাল গাছগুলোর গুড়ি বৃত্তাকারে বাঁধানো। শাখা-প্রশাখা মসজিদ প্রাঙ্গণে ছায়া দিচ্ছে। ঐ ছায়ায় একটি বড় ফোয়ারা। অসংখ্য মুখ দিয়ে নির্গত পানি অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করছে। এক পাশে একটি ছোট দালানে ওজুর জন্য মস্তবড় চৌবাচ্চা এবং বেশ কয়েকটি সেনিটারি টয়লেট। ছায়ার নিচে প্রায় বুক সমান উঁচু পাকা জায়গায় হাত-মুখ ধোয়ার জন্য ৮-১০টি কল। মসজিদ ও সমাধিসৌধের চোহদ্দির বাইরে আঙ্গুর-আপেল প্রভৃতি ফলের বাগান। প্রবেশমুখে একটি প্রশস্ত দরজা। দরজার পরেই বাঁ দিকে দু'কামরার একটি দালান এবং তার উঁচু বারান্দা। মসজিদের অফিস-বাড়ী বলে মনে হলো। ডান দিকে ছায়াঘেরা একটি ছোট বাড়ী, ইমামের বাসস্থান। তিনি সপরিবারে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ঐ গ্রামের লোকসংখ্যা কম বলেই মনে হলো।

শুনলাম মসজিদ ও মাজার দু'টিই ধ্বংস হতে বসেছিল। কয়েক বছর আগে উজবেক সরকার দুটি সৌধই পুনরুদ্ধার করেছেন। প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শনরূপেই পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। ইমাম বোখারী রাজা-বাদশা-আমীর ছিলেন না। তাই মনে হয় তাঁর মাজারের উপরে বিশাল প্রাসাদ তৈরীর তাগিদ সেকালের রাজা-বাদশারা বোধ করেন নি। কিন্তু অত্যন্ত ছোট হলেও সৌধটির শৈল্পিক কারুকার্য অত্যন্ত নিখুঁত এবং সুন্দর। অন্যেরা যখন ওক গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন, আমি তখন

একা ঐ ছোট সুন্দর ঘরটি ঘুরেফিরে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, আজ থেকে বারশ' বছর আগে জালিয়াতি থেকে প্রকৃত সত্যকে উদ্ধার করার জন্য একজন সত্যপিয়াসী সাধক যে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। সেকালে ভ্রমণের জন্য উট, ঘোড়া এবং নিজের একজোড়া পা-ই ছিল সম্বল। মাত্র ৬২ বছরের জীবদ্দশায় সম্পাদিত তাঁর বিশাল কাজের যে নিদর্শন তিনি রেখে গেছেন আজও তা মুসলিম বিশ্বের গৌরবের বিষয়। এ যুগে বিজ্ঞান বহু নতুন সত্য উদ্‌ঘাটন করেছে। সত্য উন্মোচনের সুযোগ-সুবিধাও একালে অনেক বেশী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আমরা এই অঞ্চলের মানুষ আজকের দিনেও অসংখ্য মিথ্যাকে সত্যরূপে আকড়ে ধরে আছি। ধর্মের নামে মিথ্যা ও মোনাফেকির বেসাতি চলছে। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, অর্থবিদ্যা এবং সমাজবিজ্ঞানের সত্যগুলোকে অগ্রাহ্য করে আমরা এখনও মূর্খতার প্রতীক নানা কুসংস্কারের প্রতি মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছি। এ অন্ধতার সুযোগ নিচ্ছে জালেম শাসকশ্রেণী। অতীতকে পেরিয়েই বর্তমান আসে এবং মুহূর্তের মধ্যে বর্তমান অতীতে মিলিয়ে যায়। এশিয়া-আফ্রিকার পশ্চাৎ-পদতার একমাত্র কারণ চলমান জগতে বাস করে চলমানতার প্রতি বৈরিতা। এ বিরুদ্ধতার কারণেই বিগত চারশ' বছর ধরে আমাদের অবনতি হয়েই চলেছে। স্বাধীন হয়েও, প্রকৃতপ্রস্তাবে দু' চারটি দেশ ছাড়া, এশিয়া-আফ্রিকার বাকী অঞ্চল সাম্রাজ্য-বাদী শক্তির পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন।

শত শত বছর ধরে মুসলমান তার শত্রুর ঘরবাড়ী ধ্বংস এবং ওদেরকে নির্জীব করার জন্য আল্লাহর কাছে সমবেতভাবে প্রার্থনা করছে। কিন্তু চর্মচক্ষেই দেখা যাচ্ছে, শত্রুর ঘরবাড়ী ক্রমাগত মজবুত, সংখ্যাবৃদ্ধি এবং তার ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য উত্তরোত্তর প্রসারিত হচ্ছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহতালা সর্বক্ষম এবং পৃথিবীর মালিকও

তিনি। কিন্তু আল্লাহতালা পৃথিবীর সম্পদ আহরণ, উত্তোলন, ভূপৃষ্ঠে খাদ্য-শস্য উৎপাদন প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করার জন্য তাঁর ঐশী শক্তি প্রয়োগ করেন না। এসব কাজ মানুষকেই করতে হয়। মানব সমাজ স্থবির নয়। জঙ্গমতা তার ধর্ম। তাই ইতিহাসের যে সময়ে যে উৎপাদিকা শক্তি এবং আর্থ-সামাজিক প্রশাসনিক পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং প্রয়োগ আবশ্যক তখন তার উদ্ভাবন ও প্রয়োগ মানুষ করে আসছে। সনাতনতা অথবা অলৌকিকতার দোহাই দিয়ে কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় ঐতিহাসিক বাধ্যবাধকতার বাইরে অবস্থান করতে পারেনি। কিন্তু আমরা এই বাস্তবতা দেখেও দেখি না। মূর্খতাকে প্রজ্ঞা বা পূর্ণতা এবং অন্ধবিশ্বাসকে ধর্মরূপে গ্রহণ করে আমরা ইহকাল এবং সম্ভবতঃ পরকালকে অভিশপ্ত করছি। অপরের ধ্বংস প্রার্থনা করে নিজের উন্নতি করা যায় না। এরকম একটি দৃষ্টান্তও পৃথিবীতে নেই। অবিরত প্রার্থনা সত্ত্বেও প্যাগান চেঙ্গিজ খানের বাহিনী কর্তৃক তৎকালীন মুসলিম জগৎ পরাস্ত হয়েছে। পরবর্তীকালে শিল্পোন্নত ইয়োরোপ গোটা মুসলিম জগতকে পদানত করেছে। হাজার প্রার্থনা সত্ত্বেও মুসলিম জগৎ এখনও ঐ অবস্থা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করতে পারে নি। কিন্তু অরণ্যে রোদন। চৈতন্যোদ্রেক হচ্ছে না। মহাবিশ্বে চন্দ্র-সূর্য-পৃথিবী সবকিছুই এক একটি গোলক—পবিত্রতা-অপবিত্রতার সংগে ওদের কোনো সম্পর্ক নেই। চাঁদে অবতরণ করেছে মানুষ, তবু চাঁদ অনেকের কাছে পবিত্র। কিন্তু আমি অন্য প্রসংগে চলে যাচ্ছি।

ছোটবেলায় আস্ত পশুর কাবাবের গল্প শুনেছি। ইমাম বোখারীর মসজিদ প্রাঙ্গণে এক গাছের সুশীতল ছায়ায় বসে আস্ত দুম্বার কাবাব দেখার এবং খাওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। দশ পনরটি দুম্বা কাবাবে পরিণত হয়ে বড় বড় খাঞ্চায় পরিবেশিত। টেনে ছিঁড়ে কেটে যার যার প্রয়োজনমতো খেলাম। গন্ধে ও স্বাদে অতুলনীয় এ কাবাব। মধ্য-এশিয়ার সাধারণ খাদ্য নান রুটি, খোশকা, শিক কাবাব এবং গোশতের নানা রকমের

ভোজ্য যার সংগে আমরা কম বেশী পরিচিত। ফলের দেশ, তাই ফলও। ওঁরা অত্যন্ত চা প্রিয়। কিন্তু দুধ মিশিয়ে নয়, হালকা রং চা ওঁরা ধীরে সুস্থে পেয়ালার পর পেয়ালা পান করেন। চা ওঁদের প্রধান পাণীয় ।

খাওয়া শেষে ইমাম সাহেবের সাত বছর বয়সের পুত্র কোরান আবৃত্তি করলো। তার নির্ভুল উচ্চারণ এবং কেরাতের সুর শুনে চমৎকৃত হয়েছি। শুনলাম ছেলেটি হেফজ করছে। কিন্তু আধুনিক স্কুলের আধুনিক বিদ্যা থেকেও সে বঞ্চিত নয়। সে স্কুলে যাচ্ছে। শুধু হাফেজ হচ্ছে না, আরবী ভাষাও শিক্ষা করছে। আমাদের দেশের মতো অর্থ না বুঝে "আলেম" হচ্ছে না।

সমরকন্দ শহর থেকে তিরিশ-চল্লিশ মাইল দূরের একটি কৃষি গবেষণাকেন্দ্র এবং খামার ছিল আমাদের সেদিনকার শেষ দর্শনীয়। সমতলভূমিতে অবস্থিত এই বিশাল খামারটির আয়তন ৭৫০ হেক্টর—আমাদের হিসেবে প্রায় ১৯০০ একর (১ হেক্টর = ২.৪৭১১ একর)। এত বড় কৃষি গবেষণাকেন্দ্র আমি কোথাও দেখিনি। ছাত্রজীবনে আমরা মনিপুর কৃষি খামারে অনুষ্ঠিত কৃষি প্রদর্শনী দেখতে যেতাম। তৎকালীন ভারতবর্ষে ঢাকার মনিপুর এবং পুসার কৃষি খামার ও গবেষণাকেন্দ্রের সুনাম ছিল। ইসলামাবাদে স্থাপিত শাদ্দাদী বেহেশতের সান্ত্বনারূপে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানীদের জন্য নির্মিত ঢাকার "সেকেন্ড ক্যাপিটালের" বলি হলো শত বছরের ঐতিহ্যবাহী মনিপুরের ঐ উত্তম গবেষণা-কেন্দ্র এবং তার বিরল বৃক্ষরাজিসমৃদ্ধ বাগান।

সমরকন্দের কৃষিগবেষণাকেন্দ্র এবং খামারের তুলনা সে নিজে, যেমন রবীন্দ্রনাথের তুলনা তিনি নিজে। প্রবর্তনার পার্থক্য অনেক কিছু নির্ধারণ করে। আমাদের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার খামারের প্রবর্তনা, পরাধীন আমলের মতো, এখনও শহর বন্দরে অথবা বিদেশে পিয়ন-চাপরাশি পরিবৃত চেয়ার টেবিলের চাকরি। বিশ্ববিদ্যালয়টি বিদেশী অর্থ সাহায্যে স্থাপিত এবং এখনও যাবতীয়

উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বিদেশী অর্থ সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। সাবভারশন বা চারিত্র্য হনন দু'দিক থেকে চলছে। মেধাবী ছাত্ররা বিদেশী অর্থে বিদেশে চলে যাচ্ছেন। অনেকে ফিরে আসছেন না। যাঁরা ফিরে আসছেন তাঁরা শিল্পোন্নত ধনী দেশের উন্নত জীবনযাত্রায় আপাদমস্তক অভ্যস্ত হয়ে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে ফিরে আসছেন। ফলে কৃষি উন্নয়নের গুরুভার প্রকৃতপ্রস্তাবে কোটি কোটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে বিভক্ত জমির মালিক গরীব চাষী এবং ভূমিহীন বর্গাদারদের উপরেই থেকে যাচ্ছে। কৃষিবিপ্লব ভূমি সংস্কারের উপর নির্ভরশীল। কৃষি বিশেষজ্ঞদের প্রবর্তনার মধ্যে কৃষিবিপ্লব অনুপস্থিত।

সমরকন্দের বিশাল কৃষি-খামারে সেদেশের জলবায়ুর উপযোগী শস্য নিয়েই পরীক্ষা-নিরীক্ষা গবেষণা চলে। ধান চাষের বিষয় ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। হয়তো ধান সম্বন্ধেও গবেষণা হচ্ছে। হাতে সময় অল্প। আমরা শুধু খামারের আঙ্গুর-আপেল অংশটি দেখেছি। মোটর চলার উপযোগী পাকা অলিগলিতে খামারটি বিভক্ত। দু'দিকে লোহার খুঁটিতে আঙ্গুর লতার মাচাঙ্গ রাস্তার উপরে ছায়া দিচ্ছে। মাথার উপরে নানা রং এবং আকৃতির পরিপক্ক আঙ্গুর ফল। পরিচালক জানালেন, এ পর্যন্ত প্রায় ৩০০ জাতের উচ্চ-ফলনশীল আঙ্গুর বীজ উৎপন্ন করেছেন ওঁরা। মাচাঙ্গের ছায়ার নীচের এক গলিতে লম্বা টেবিল এবং তার দু'দিকে চেয়ার। টেবিলে নানা ফল এবং আহার্যের সমাহার। ঘুরে ফিরে ওখানে এসে বসতেই বাজনা বেজে উঠলো। বংশী-বাদক এবং তারযন্ত্র ও খোল-করতাল বাদক গীতবাদ্য শুরু করলেন। সেই বিকেলে তুর্ক-মঙ্গোল জাতির লোকসংগীত ও বাজনা বড় ভালো লেগেছিল। বিদায় নেয়ার পরেও ঐ সংগীতের মূর্ছনা হৃদয়তন্ত্রীতে সুরধুনির ঝঙ্কার তুলছিল। সমরকন্দের একটি সুন্দর হোটেলে রাত্রিযাপন করলাম।

পনের

পরদিন স্থানীয় সময় ১০.২০ মিনিটে আবার বিমান যাত্রা। এবার গন্তব্যস্থল আজারবাইজানের রাজধানী এবং তৈলশহর বাকু। কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম তীরে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত আজারবাইজানের দক্ষিণাংশ ইরানে পড়েছে। উত্তরাংশ সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্য এবং ইয়োরোপের মানচিত্রে অবস্থিত। আজার-বাইজানের পূর্ব-সীমায় বিশাল হ্রদ কাস্পিয়ান সাগর—আয়তনে বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বড়। পশ্চিমে কৃষ্ণসাগর। বাকু এবং কৃষ্ণসাগরের পূর্ব তীরে অবস্থিত বাতুম বন্দর রেললাইন দ্বারা যুক্ত—মধ্যপথে ৎবলিসি। বাকু থেকেই ইতিহাসখ্যাত কুহে্ কাফ বা ককেশাস পর্বতশ্রেণীর শুরু। সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্য একটি অঙ্গরাজ্য জর্জিয়াও ককেশীয় দেশ। ককেশাস পর্বতমালাই ছিল প্রাচীনকালে ইয়োরোপ এবং এশিয়ার মধ্যে স্থলপথে যাতায়াতের দুর্ভেদ্য বাধা। তবু স্থলপথে মানুষের যাতায়াত বন্ধ হয়নি। চেঙ্গিজ খাঁর সেনাবাহিনী কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ তীর ঘুরে ইউক্রেন, পোলাণ্ড এবং ভিয়েনা পর্যন্ত পৌঁছেছিল। তারও বহু আগে পারস্য সম্রাট সাইরাস দ্যা গ্রেট ককেশাস অঞ্চলকে তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। মুসলিম উপকথার সেকান্দরী দেয়াল সাইরাস বা সেকালের কোনো একজন পারস্য নৃপতির কীর্তি বলে অনেকে মনে করেন। আজারবাইজান সংলগ্ন সোভিয়েত অঙ্গরাজ্য জর্জিয়া। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-খ্যাত স্তালিনগ্রাদ জর্জিয়ার শহর। সমরকন্দ থেকে বাকু তিন ঘন্টার পথ। আমরা কখনও পর্বতশ্রেণী, কখনও সমতলভূমি এবং সবশেষে কাস্পিয়ান সাগর পাড়ি দিয়ে চললাম। বাকুর এ বিমানবন্দরটি খুব বড় নয় এবং

বন্দরে নোঙ্গর করা বিমানের সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত কম। বাকু থেকে মস্কো অবধি রেলপথও আছে। তিরিশ-পঁয়ত্রিশ কিলো-মিটার দূরে অবস্থিত বিমানবন্দর থেকে বাকু শহর পর্যন্ত মোটর পথের পাশ ধরে আমরা কেবল তৈলক্ষেত্র এবং তৈল উত্তোলনরত পাম্পযন্ত্র দেখলাম। তৈলবাহী পাইপ লাইন এবং শোধনাগারও পথে পড়লো। বাকু সত্যি-সত্যিই তৈল শহর। ওঁরা বললেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে আজারবাইজান প্রজাতন্ত্র (বাকুসহ) সোভি-য়েত ইউনিয়নে উৎপন্ন তেলের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ উত্তোলন করতো। বর্তমানে আজারবাইজান বছরে ২·২ কোটি টন অশোধিত তেল উত্তোলন করে। এটা সোভিয়েত ইউনিয়নে উত্তোলিত অশোধিত তেলের শতকরা মাত্র ৫ ভাগ।

বাকু কাস্পিয়ান তীরের শহর হলেও বেলাভূমির উপর থেকেই ককেশাস পর্বতমালার আরোহ শুরু। এখানেই কি জেনোফোন বর্ণিত সাইরাসের এ্যানাবাসিস শুরু হয়েছিল? ফরাসী কবি সাঁ জঁা পার্সের এ্যানাবাসিসের অনুপ্রেরণা কি ককেশাস? সাগরের অগভীর অংশে বহু দূর পর্যন্ত তৈল উত্তোলন ক্রিয়া বিস্তৃত। লোহার খুঁটির উপরে সেতুর মতো করে নির্মিত মোটর চলাচল উপযোগী পাকাসড়ক সাগর বুকের তৈলকূপ পর্যন্ত চলে গেছে। সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। মোটরেই গিয়েছিলাম। সাগর বুকে স্থির দাঁড়িয়ে সাগর দেখার অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই-ই প্রথম।

প্রকৃত বাকু শহর প্রায় সবটাই পাহাড় আর তার চড়াই উতরাইর উপরে অবস্থিত। বোম্বাই শহরের কোনো কোনো এলাকার সাথে সাদৃশ্য আছে। সোভিয়েত আজারবাইজানের লোকসংখ্যা ৬০ লক্ষ। রাজধানী বাকুর লোকসংখ্যা ১৫ লক্ষ। শহরটি যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তেমনি সুন্দর। এমন সুকৌশলে এটি নির্মিত যে, পাহাড়ের পাদমূলের যেকোনো বাড়ী থেকে চূড়ায় নির্মিত বাড়ী অবধি যাতায়াতের উপযোগী পাকাসড়ক আছে। মোটরে আসা-যাওয়া করা যায়, চট্টগ্রামের মতো সিঁড়ি

বেয়ে চূড়ার বাড়ীতে ওঠানামা করতে হয় না। গোর্কী বর্ণিত মর্ত্যের দোজখ আজ মর্ত্যের বেহেশতে রূপান্তরিত। মানুষের হাতেই এ উন্নতি হয়েছে।

পর্বতশীর্ষে বহুতল বাকু হোটেল। বরাবর নীচে কাস্পিয়ান সাগর। তেরো তলায় আমার কামরা। জানালা খুলে সাগরের বিপরীতে মনোরম পার্বত্য শহরটি দেখছিলাম। দেশের কথা মনে পড়লো। টাকাকড়ি, কারিগরি দক্ষতা এবং উদ্যোগ থাকলে আমরা চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, টেকনাফ প্রভৃতি জায়গাকেও বাকুর মতো সুদৃশ্য শহররূপে গড়ে তুলতে পারতাম। হোটেলের সামনে ছোট তৃণচত্বর, তার সামান্য নীচে সড়ক। তার বেশ নীচে সাগর। বসার জন্য পাকা আসন আছে। সাগর দেখাও যায়, তার বিরামহীন গর্জনও শোনা যায়। কিন্তু প্রচণ্ড বাতাস। তার বেগ সামলে দাঁড়িয়ে অথবা বসে থাকা দু'টোই বুড়োদের পক্ষে অসম্ভব।

১৭ই হতে ২০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাকুতে ছিলাম। এ সময়ের মধ্যে আমরা কয়েকটি মসজিদ, কয়েক দিক থেকে সাগর সৈকত এবং জল ও স্থলের তৈলকূপ ঘুরে ফিরে দেখেছি। আজারবাইজানী মুসলমানের ধর্মীয় জীবন নিয়ন্ত্রণ এবং মসজিদ পরিচালনার জন্য আলাদা গ্র্যাণ্ড মুফতী আছেন। ভদ্রলোকের বয়স ঊর্ধ্বপক্ষে তিরিশ-বত্রিশ। অত্যন্ত সুশ্রী এবং সুপুরুষ। তাসখন্দে তাঁকে দেখেছিলাম। আমাদের আগেই তিনি দেশে ফিরেছিলেন। তিনি তাঁর দলবল নিয়ে বিমানবন্দরে আমাদের সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আমাদের হোস্ট। মসজিদের ইমাম এবং মুফতীর পোশাক-পরিচ্ছদে আজারবাইজানেও মধ্য-এশিয়ার মতো চোগা আবশ্যিক। মুফতী পাগড়ি পরেন। একজন বুড়ো ইমামের মাথায় লেজহীন লাল তুর্কী টুপি (ফেজ) দেখলাম। আমাদের ছোটবেলায় ও টুপি বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত ছিল। বনাতের তৈরী এ টুপির জন্মস্থান সম্ভবত ইতালি। তুর্কীরা এ টুপি পরতেন।

কামাল আতাতুর্ক বর্জন করেন। তারপর ক্রমে ক্রমে আমাদের দেশ থেকেও এ টুপি অন্তর্ধান করেছে। বিয়ের স্মৃতিরূপে আমার নিজেরটি এখনও আলমারিতে আছে।

সোভিয়েত আজারবাইজানে মুসলমানের সংখ্যা অল্প। ওঁরা জানালেন, বাকু শহর এবং আশপাশে মোট ৬টি মসজিদ আছে। প্রতিটি মসজিদ অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সযত্নে সংরক্ষিত। কার্পেটে মোড়া মেঝে। বাইরে টয়লেট এবং পানির ব্যবস্থা। খোলা আঙ্গিনায় বাগান। একটি মসজিদ বেশ বড়। সেদিন ছিল জুমাবার। স্থানীয়দের সাথে আমরাও মসজিদটিতে নামাজ পড়লাম। মধ্যাহ্নভোজন ওখানেই হলো। খানা মধ্য-এশিয়ায় যা এখানেও প্রায় তাই। ফেরার পথে সুদীর্ঘ সাগর সৈকত ঘুরে এলাম। এদিককার সৈকত বেশ কিছু দূর থেকে ক্রমে ক্রমে ঢালু হয়ে পানি স্পর্শ করেছে। তীরে ছোট ছোট বাড়ীঘর। এগুলো স্থানীয় লোকদের গ্রীষ্মাবাস। প্রতিটি বাড়ীতে বাগান। স্নানার্থীদের জন্য জলসংলগ্ন বিশ্রামাগারও আছে।

জনাব কোরবান নামক স্থানীয় এক ভদ্রলোক তাঁর বাড়ীতে মধ্যাহ্নভোজনের দাওয়াত করলেন। তাঁর গ্রামের নাম বিলগা—বাকু থেকে কমপক্ষে চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইলের পথ। চড়াই-উতরাই পেরিয়ে চলে গেছে হাইওয়ে। কোথাও বন, কোথাও তৃণ অথবা শস্যক্ষেত্র। পথে একটি বড় চিকিৎসাকেন্দ্র এবং স্বাস্থ্যনিবাস। কাস্পিয়ান সাগর বাঁয়ে রেখে আমরা যাচ্ছিলাম।

কাস্পিয়ান তীর ঘেঁষে অবস্থিত বিলগা গ্রামটি কাঁকরময় মরুবিশেষ। বিশ-পঁচিশটি বাড়ী। প্রতিটি বাড়ী অনুচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত। বিঘা-দেড়বিঘা পরিমাণ জমি জুড়ে ছোট বাড়ীর উঠোন-আঙ্গিনাসহ গোটা ফাঁকা জায়গায় আঙুর-আপেল প্রভৃতি ফল ও তরিতরকারির চাষ। জলসেচন করে ঐ অসাধ্য সাধন করা হয়েছে। কোরবান সাহেবের বাড়ীতে একটি চৌচালা ঘর এবং আলাদা ছোট রন্ধনশালা। চুনকামকরা দেয়াল, উপরে, যতদূর

মনে পড়ছে, টালি। ঘরটিতে গোটা তিনেক কামরা। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। আবৃত নাতি-প্রশস্ত বারান্দায় খাবার টেবিল পড়েছিল। এক কোণে ছোট বেসিনের উপরে পানির কল। বাগানে একটি কুয়াও দেখলাম। ইলেকট্রিসিটি আছে। বাইরের পাঁচিল ঘেঁষে মেহমানদের জন্য আলাদা হাফ-সেনিটারি পায়খানা। কতকটা আমাদের দেশের মতো ব্যাপার। মধ্য-এশিয়ার মতো এখানেও বদনা ব্যবহৃত হয়। মধ্যাহ্নভোজে আহার্য ছিল শিক কাবাব, নান রুটি, পোলাও, কালিয়া, নানা ফলফলারি প্রভৃতি। কোরবান সাহেবের স্ত্রীকে রান্নাঘরে দেখলাম। তিনি বাসন-কোষণ ধোয়ামোছা নিয়ে ব্যস্ত। বাইরে শুধু শিক কাবাব সেকা হচ্ছিল—বাকী রান্নাবান্না তিনিই করেছিলেন। পাকঘরের কাছে বেশ বড় সাদা মোরগ-মুরগী এবং হাঁস দেখলাম। সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বত্র পল্লীগ্রামে হাঁস-মোরগ দেখেছি।

এখানে সাগর পাড় বেশ উঁচু। পাড়ের উপর দিয়ে রেল-লাইন চলে গেছে। রেল লাইনটি কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী বাতুম থেকে এসেছে অথবা এটি মস্কো গেছে কি না জিজ্ঞাসা করিনি। সূর্যাস্তের একটু আগে আমরা রেল লাইন পেরিয়ে জলের কিনারায় গেলাম। কাস্পিয়ান একটি বিশাল হ্রদ কিন্তু তার জল এবং আমাদের পরিচিত বঙ্গোপসাগরের জলের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখলাম না। একই রকম লোনা এবং একই রকম অবিশ্রান্ত ঢেউয়ের গর্জন। বেলাভূমিতে ঝিনুক এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রাণীর খোলস ছড়িয়ে আছে। এদিকটায় নৌকো বা জাহাজ বড় একটা দেখলাম না। তৈল কূপও নেই। আমাদের পরিচিত হিমছড়ির মতো জনবিরল এই জায়গাটা। বিলগা সম্ভবত কোলাহলময় নগরজীবনের বাইরে সাপ্তাহিক ছুটি কাটানোর স্থান—রুশীদের ডাচা। প্রায় বাড়ীই জনশূন্য।

আমরা দু'টি সরকারী সংবর্ধনা পেয়েছিলাম। প্রথমটি দিয়েছিলেন আজারবাইজান সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সরকারের

পররাষ্ট্র মন্ত্রী। তিনি মধ্যবয়সী মহিলা। সাদাসিধে সাধারণ পোশাক—হাঁটুর নীচ অবধি সাদা স্কার্ট—উপরে সাদা কোট কি জ্যাকেট ঠিক মনে নেই। খোপাকরা কালোচুল। তাঁর মাড়িতেও দু'তিনটি সোনার দাঁত। সকাল দশটার অনুষ্ঠানে চা, কফি, বিস্কুট এবং শীতল পানীয়ের ব্যবস্থা ছিল। প্রচলিত প্রথা মাফিক মন্ত্রী মহোদয়া তাঁর মাতৃভাষায় প্রায় এক ঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন। স্বদেশের রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থার বিবরণ ছিল তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু। একজন তার আরবী অনুবাদ শোনাচ্ছিলেন। আমি ছাড়া বাকী প্রায় সকলেই ছিলেন আরবীভাষী। ওঁরা নানা প্রশ্ন করলেন। মধ্য-এশীয় ধর্মীয় বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান ডক্টর ইয়ুসুফ খান আমাকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রশ্ন করতে চাই কি না। বললাম, করতে তো চাই, কিন্তু আমি যে শুধু ইংরেজি বলতে পারি। আমাদের সংগে ডক্টর রউফ উনসাল এবং সৈয়দ এ ইব্‌কিন নামক দু'জন তুর্কী ভদ্রলোক ছিলেন। প্রথমজন অধ্যাপক এবং দ্বিতীয় জন উচ্চপদের সরকারী আমলা। ওঁরা দু'জন মোটামুটি ভালো ইংরেজি বলেন। সাইপ্রাসের তুর্কী অংশের অধিবাসী সৈয়দ ইব্‌কিন সাহেব সানন্দে সহায়তা করলেন। আজারবাইজানের ভাষা মূলতঃ তুর্কী এবং অধিবাসীরাও তুর্কী নৃগোষ্ঠীর লোক। এক সময়ে জর্জিয়া এবং আজারবাইজানসহ ভিয়েনা অবধি বিস্তৃত ছিল বিশাল তুর্কী সাম্রাজ্য।

আমার প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানালেন, তাঁর দেশ কেন্দ্রীয় রুশ পার্লামেণ্টে মোট ৬৩ জন ডেপুটি নির্বাচিত করে পাঠায়। আজারবাইজানের প্রেসিডেণ্ট এবং প্রধানমন্ত্রী পদাধিকারবলে কেন্দ্রীয় ফেডারেল সরকারের প্রেসিডিয়ামের সদস্য। ফেডারেল সরকারের সংবিধান অথবা মূলনীতিবিরোধী নয় এমন আইনকানুন আজারবাইজান পার্লামেন্ট প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে পারে। মোট রাজস্বের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে হয়। বাকী অর্থ আজারবাইজান সরকার ইচ্ছেমতো ব্যয় করতে পারে।

রাজ্যের উন্নয়ন পরিকল্পনাও তাঁরাই প্রণয়ন করেন। আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যিক ও অন্যান্য চুক্তিও করেন ওঁরা।

আজারবাইজানে নিরক্ষর লোক নেই। ডাক্তারি পেশায় মহিলাদের সংখ্যা শতকরা ৬০ জন। অন্যান্য সরকারী বিভাগের কোনো কোনোটিতে মহিলাদের সংখ্যা শতকরা ৬০, কোনো কোনোটিতে শতকরা ৪০। হালকা শিল্পে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা শতকরা ৪০, ভারী শিল্পে শতকরা ২০ জন। মন্ত্রিসভায় মহিলা মন্ত্রীর সংখ্যা, যতদূর মনে পড়ছে, ৪ থেকে ৬ জনের মধ্যে।

প্রশ্নোত্তরের এক পর্যায়ে লঘু হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছিল। কুয়েতের এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, ওয়ালাদুল জেনা—অর্থাৎ অবৈধভাবে প্রসূত সন্তানের কি গতি হয় সেদেশে। অপ্রত্যাশিত এ প্রশ্নে মজলিসে হাস্যরোল উঠল। মন্ত্রী স্মিত হেসে উত্তর দিলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নে ওয়ালাদুল জেনা—অর্থাৎ অবৈধ-সন্তান নেই। সন্তান মাত্রেই বৈধ এবং সমান অধিকারভোগী নাগরিক। বিবাহ এবং তালাক দু'টোই সে দেশে সহজ। উভয় ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সমান অধিকার। শিশুর লেখাপড়া, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা এবং পরিণত বয়সে যোগ্যতা অনুযায়ী অর্থকরী কাজে নিযুক্ত করার দায়িত্ব সরকারের। ইয়োরোপ আমেরিকার মতো সমাজের এক স্তরে বিপুল ধনৈশ্বর্য এবং অন্য স্তরে স্লাম ও বেকারজীবন সোভিয়েত ইউনিয়নের কোথাও নেই। তাই অবৈধ যৌন মিলন এবং তার ফলাফল অস্বীকারের প্রশ্ন ওঠে না। সন্তানের জন্য আলাদা ভাতা আছে। অধিক সন্তানের জননী ভাতা ছাড়াও বিশেষ পুরস্কার পান। পরে মস্কোতে ফিরে জেনেছিলাম, বিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে রেজিস্ট্রি না করেও নরনারী স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বসবাস করতে পারে। ওটাকে ipso-facto বিয়েরূপে গণ্য করা হয়। কিন্তু বলাৎকার গুরুতর অপরাধ—মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত তার শাস্তি।

তবে কিনা অর্থনৈতিক বিপ্লবের সংগে তাল রেখে সবসময়ই সামাজিক জীবন চলে না। সংস্কৃতির গতি শ্লথ। শহর থেকে

বহু দূরে অবস্থিত সোভিয়েত ইউনিয়নের পল্লী-সমাজ এখন পর্যন্ত ঐসব বৈপ্লবিক আইনের প্রকৃত তাৎপর্য পুরোপুরি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে বলে মনে হয় না। এ যুগের সোভিয়েত ইউনিয়নের বিখ্যাত কথাশিল্পী ভ্লাদিমির তেনদ্রিয়াকভের "দ্য ফাইণ্ড" (আবিষ্কার) শীর্ষক একটি মর্মস্পর্শী বড় গল্প পড়ে বুঝলাম, সব রকমের কুসংস্কারের মোহ থেকে মুক্ত হতে সমাজের দীর্ঘ সময় লাগে। তেমনি এমন কিছু লোক সব সমাজে সব সময়েই থাকে অপরাধ করাটাই যাদের স্বভাব। এ শ্রেণীর লোকের ন্যায়-অন্যায় বোধ নেই। সে কাজটাই করে। ফলাফল অন্যের বা সমাজের জন্য ক্ষতিকর হলে, অপরাধী তার অপরাধ অস্বীকার অথবা অকুস্থল থেকে পালিয়ে গিয়ে আইনের বিধান থেকে মুক্ত হতে চায়। তেনদ্রিয়াকভের গল্পে এক যুবক প্রেমিক কর্তৃক প্রেমিকা অন্তঃস্বত্বা এক পল্লীবালাকে পরিত্যাগ এবং তারপর লোক নিন্দার ভয়ে ঐ পল্লীবালার জংগলে আশ্রয় গ্রহণ ও পরবর্তী ঘটনাবলীর মর্মস্পর্শী বিবরণ দেয়া হয়েছে। গল্পটি তলস্তয়ের রিজারেকশন উপন্যাসের কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়। দেরীতে হলেও রিজারে-কশন কাহিনীর নায়কের অপরাধবোধ জন্মেছিল। তেনদ্রিয়াকভ কাহিনীর প্রতারক প্রেমিক সেই যে উধাও হলো আর তার দেখা পাওয়া গেলো না। এ সব সমস্যা আছে। কিন্তু এটাও তো সত্যি যে, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে যে যৌন-মিলন ঘটে সেটাই প্রকৃত বিবাহ। ইসলামসহ সমস্ত উন্নত ধর্মে বিবাহ স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে প্রদত্ত সম্মতিক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর একত্র বসবাসের সামাজিক সনদ ছাড়া আর কিছু নয়। রেজিস্ট্রেশন, স্বাক্ষী সাবুদের উপ-স্থিতি প্রভৃতি সম্ভাব্য বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ মাত্র। সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ভদ্রভাবে জৈবধর্ম পালন আবশ্যক। সে জন্যেই এ সব আনুষ্ঠানিকতা।

আজারবাইজানে মহিলাদের সম্মান এবং সমানাধিকার ভোগের প্রমাণ অন্যত্রও পেয়েছিলাম। বাকু থেকে প্রায় তিরিশ-চল্লিশ কিলোমিটার দূরে সুনগাই একটি নতুন ছোটখাটো শিল্পশহর।

শহরটি নির্মাণে বিরল নান্দনিক বোধের পরিচয় দেয়া হয়েছে। স্থানে স্থানে পার্ক, পথিপার্শ্বে বাগান, চৌরাস্তায় মস্ত বড় সবুজ আয়ল্যাণ্ড এবং সড়কের দু'দিকে সুদৃশ্য এ্যাপার্টমেন্ট বাড়ী। কোথাও গলিঘুপসি নেই—পুঁজিবাদী সমৃদ্ধির অন্ধকার দিক নোংরা বস্তি কোথাও দেখিনি। বাকু থেকে সুনগাই যাওয়ার পথ চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এগিয়ে গেছে। পথের এক জায়গায় সড়কের পাশে ছোটখাটো হ্রদসমতুল্য বিশাল জলাধার। এ জলাধার থেকে জল সেচন করে ঐ চড়াই-উতরাইর নিরেট ভূমিতে শস্যোৎপাদন এবং বৃক্ষের চাষ চলছে। সুনগাই শহরের কলকারখানায় প্রধানত তৈলবাহী পাইপ এবং তৈল উত্তোলন ও শোধন কার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, পাম্প ইত্যাদি তৈরী হয়। শহরের পৌরসভা আমাদের স্বাগত জানালেন। এখানেও দেখলাম পৌরসভার চেয়ারম্যান মহিলা।

বাকুর কাছাকাছি একটি স্থান আমাকে দারুণ বিস্মিত করেছিল। সাগর সৈকত ঘেঁষে দীর্ঘ পাকা সড়ক। সৈকত ছেড়ে কিছুদূর যাওয়ার পর অপেক্ষাকৃত উঁচু এক জায়গায় গাড়ী থেকে নামলাম। সামনে একটি পুরনো চক-মিলানো বাড়ী। সদর দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে দেখি, এযে প্রাচীন ভারত-বর্ষ। মাঝখানে মস্তবড় চতুষ্কোণ খোলা আঙ্গিনা। প্রথমে মনে হলো বুঝিবা একটি পরিত্যক্ত বৌদ্ধ বিহার। অসংখ্য ছোট-বড় প্রকোষ্ঠ—মহাস্থানগড়, ময়নামতি প্রভৃতি বৌদ্ধস্তূপ স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু সব দিক ঘুরে ফিরে দেখে মনে হলো স্থানটি যেন সকল প্রাচীন ধর্মের সংগমস্থল। এক জায়গায় প্রাচীন ইরানী অগ্নি উপাসকদের অনির্বান শিখা জ্বলছে। অন্যত্র হোমাগ্নি সম্মুখে রেখে পদ্মাসনে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণ উপাসক। সর্বাঙ্গ শৃঙ্খলিত প্রায়শ্চিত্ত-কারীদের মূর্তি। দেয়ালে কিছু সংস্কৃত রচনাও দেখলাম। এক জায়গায় ১৭৪৫ সালের তারিখ। আরো কিছু সন তারিখ ছিল। সেগুলোর পাঠোদ্ধার করতে পারিনি। ১৭৪৫ সাল অপেক্ষাকৃত হাল আমল হলেও সে সময়ে এ অঞ্চল তুর্কী সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। মাঝপথে ইরান ও আফগানিস্তান। মধ্য-এশিয়াও মুসলিম রাজা

বাদশাদের অধিকারে। ভারতবর্ষে ইংরেজ প্রবেশ করেছে কিন্তু অধিকার দৃঢ় হয় নি। গোটা পশ্চিম ভারত মুক্ত। বৌদ্ধ শ্রমণেরা বহুকাল আগেই বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। গোটা আজারবাইজান এক সময়ে ইরানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই বৌদ্ধ স্তূপ এবং ইরানী অগ্নি উপাসকের অনির্বান শিখার অবস্থিতির পক্ষে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু উপবীত এবং চৈতনধারী হিন্দু ব্রাহ্মণ এবং হিন্দু পেনিট্যান্ট কখন কোন্ সময়ে কিভাবে কোন্ পথে কাস্পিয়ানের পশ্চিম তীরে ককেশাসের পাদমূলে প্রবেশ করে তিন ধর্মের সংযোগ ঘটিয়েছিল? মুসলিম অধিকৃত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে হিন্দু ব্রাহ্মণের ওখানে প্রবেশের পথে নিরাপত্তা সম্বন্ধীয় বাধা ছাড়াও সামাজিক বাধা ছিল। সেকালের ব্রাহ্মণ মুসলমানের তৈরী খাদ্য গ্রহণ করতো না। একটি জবাব খুঁজে পেলাম। ভালোমন্দ নির্বিশেষে যেকোনো মতাদর্শে দৃঢ় বিশ্বাসী মানুষমাত্রেই দুঃসাহসী হন। কোনো বাধা তাঁর কাছে বাধা নয়। বৌদ্ধ, খৃস্টান এবং ইসলাম ধর্ম এঁদের দ্বারাই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ কালেও মতাদর্শে দৃঢ় আস্থাবান এবং উদ্বুদ্ধ লোকদের দ্বারাই সাম্যবাদ সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। এ শ্রেণীর লোককে সম্মোহিতও বলতে পারি—বলতে পারি অনন্য-সাধারণও।

উনিশে সেপ্টেম্বর রাত পৌনে ন'টা থেকে প্রায় বারোটা পর্যন্ত ছিল বিদায়-ভোজ। মোরগ রোস্ট এবং আমাদের দেশী ভাত-সহ ডিনারে যাবতীয় এশীয় ও ইয়োরোপীয় ভোজ্য এবং ঠাণ্ডা পানীয়ের বিপুল সমাবেশ ছিল। শেষ পর্যায়ে চা কফি। বক্তৃতা এবং খানাপীনা এক সংগেই চললো। আরবীভাষীরা আরবীতে বক্তৃতা করলেন, আমি ইংরেজিতে। বললাম, স্বচক্ষে দেখার পর বুঝেছি সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বত্র মুসলমানসহ সকল ধর্মাবলম্বীর যার যার ধর্মকর্ম করার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। অসংখ্য নরনারীকে মসজিদ ও গির্জায় যেতে দেখেছি। সোভিয়েত ইউ-নিয়নে ধর্মকর্ম করার অধিকার নেই—এটা অসদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত

মিথ্যা প্রচার। আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের নেতা মাকিন সাম্রাজ্য-বাদ। সে মুসলিম মধ্যপ্রাচ্যের বুকে ইসরাইলকে বসিয়েছে, প্রটেকশন দিচ্ছে এবং অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে প্রতিপালন করছে। তিরিশ লক্ষ প্যালেস্টাইনী আজ গৃহহারা। আরব ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছে মাকিন সাম্রাজ্যবাদ। মুসলিম ইতিহাসের আজ এক যুগসন্ধিক্ষণ। এ সময়ে বিশ্ব মুসলিমের—বিশেষভাবে মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য আবশ্যক। প্যালেস্টাইনী উদ্বাস্তুদের স্বদেশে পুনর্বাসিত করার একমাত্র পথ ঘৃণ্য মাকিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আরব জগতের ঐক্যবদ্ধ হওয়া। মাকিন সাম্রাজ্যবাদ শুধু মুসলমানের নয়, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবজাতির পয়লা নম্বরের দুশমন। আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর সুদানের আবদুল্লাহ মোহাম্মদ আহমদ হাসান তাঁর আরবী বক্তৃতায় আমাকে সমর্থন করতে গিয়ে ভাবাবেগে কেঁদে ফেললেন। রাত বারোটায় আজারবাইজানের শেখুল ইসলাম হোটেলকক্ষে দু'জোড়া আজারবাইজানী জড়োয়া নাগরা জুতো অতিথি বিদায়ের উপহাররূপে পাঠিয়ে দিলেন। মধ্য-এশিয়ার সর্বত্র এ রীতি। মেহমানদারি শুধু পানাহারে আপ্যায়িত করার মধ্যে সীমিত নয়, বিদায়কালে কিছু ভেটও মেহমানের প্রাপ্য।

ষোল

পরদিন বাকু সময় সকাল সাড়ে দশটায় মস্কোর বিমানে চড়লাম। পেছনে পড়ে রইল কুহ্ কাফ, আজারবাইজান এবং তার সুন্দর রাজধানী বাকু। একটানা তিন ঘণ্টা ওড়ার পর মস্কো বিমান বন্দরে অবতরণ করলাম। সেখান থেকে তিরিশ-চল্লিশ কিলোমিটার দূরে পুরনো মস্কোর এক হোটেলে পোঁছে দেখি আমার জন্য অপেক্ষা করছে দোভাষী নাতাশা। সে আমার সংগে মধ্য-এশিয়ায় যায়নি। বিগত ক'দিন আমি মধ্য-এশিয়ার মুসলিম ধর্মীয়-বোর্ডের মেহমান ছিলাম। মস্কো প্রত্যাবর্তন মাত্র আবার মূল নিমন্ত্রণকারী লেখক সংঘের মেহমান হলাম। নাতাশাকে দেখে আমি যুগপৎ আশ্বস্ত ও বিস্মিত হলাম। বিস্ময়ের কারণ, রুশীদের শৃঙ্খলাবোধ এবং দায়িত্বপালনে প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিষ্ঠা।

নাতাশা বললো, ঝটপট কিছু খেয়ে নিন, আজ বিকেলের ফ্লাইটেই আমাদের লেলিনগ্রাদ যেতে হবে, টিকেট নিয়ে এসেছি। প্রায় দু'সপ্তাহ মধ্য-এশিয়া ও আজারবাইজানে ঘোরাঘুরির পর স্বভাবতই ক্লান্তিবোধ করছিলাম। ইচ্ছে ছিল দু'একদিন বিশ্রাম নিই। কিন্তু স্বদেশ-বিদেশ সর্বত্রই নিমন্ত্রণকারীর অভিপ্রায়ই নিজের অভিপ্রায়। পথ খুব বেশী নয়, রেলেও যেতে পারতাম। কিন্তু বিমানের টিকেট নিয়ে এসেছে নাতাশা। অগত্যা হালকা কিছু খেয়ে নিয়ে বিমান বন্দরের দিকে ছুটলাম। ছ'টার প্লেন ছাড়লো ৭.১০ মিনিটে। বিমানে একটি আসনও খালি নেই। অধিকাংশ স্থানীয় লোক। একজন ভারতীয় বাংগালী উচ্চশিক্ষার্থীকে আমাদের বিমানে পেলাম। তিনি জাতিসংঘের বৃত্তিধারী। স্থানীয়দের

অনেককেই মনে হলো গ্রামবাসী। বোঁচকা-বুচকি টুকিটাকি জিনিসপত্র ভর্তি সাধারণ থলে প্রভৃতি হাতে। কোলের বাচ্চা নিয়ে দম্পতিরাও উঠলেন। তার উল্লেখ আগে করেছি।

এক ঘণ্টা দশ মিনিট ওড়ার পর লেনিনগ্রাদে অবতরণ করে দেখি মস্কোর মতো ঐ বিমানবন্দরেও প্রচণ্ড ভিড়। বাইরে ট্যাক্সির জন্যে বিরাট লাইন। একটি একটি করে ট্যাক্সি লাউঞ্জের সামনে আসে। আমরা লাইনের অনেক পেছনে পড়েছিলাম। কনকনে হিমেল হাওয়া জোরে বইছে। প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষার পর ট্যাক্সি পেলাম। সাড়ে ন'টারও পরে তিরিশ-চল্লিশ কিলোমিটার দূরে গন্তব্যস্থলে পৌঁছলাম। শত বছরের পুরনো অভিজাত হোটেল Everoospeiskaia। জা'র আমলে নাকি এটি ছিল শহরের অন্যতম অভিজাত ও ব্যয়বহুল হোটেল। আমাকে একটি পুরো স্যুট দেয়া হলো। বৈঠকখানা এবং শয়নকক্ষের আসবাবপত্র সোনালী কারুকার্যমণ্ডিত। টেলিভিশন, রেডিও, ফ্রীজ, টেলিফোন প্রভৃতিতো আছেই। প্রকাণ্ড গোসলখানা। এ পর্যন্ত যতগুলো হোটেলে ছিলাম তার চেয়ে এটি নিঃসন্দেহে অনেক বেশী উন্নত মানের। বাড়ীটি পুরনো, অত্যন্ত ভারী দেয়াল।

লেনিনগ্রাদ সোভিয়েত ইউনিয়নের সবচেয়ে সুপরিকল্পিত সুন্দর শহর। ইতিহাসখ্যাত রুশ সম্রাট পিটার দ্য গ্রেট তাঁর রাজধানীর জন্য নিরাপদ জায়গা খুঁজছিলেন। এখানে নেভা নদী বাল্তিক সাগরে পড়েছে। মোহনায় একটি দ্বীপ—জলপথে বৈদেশিক আক্রমণের প্রতিবন্ধক। পিটার স্থানটি পছন্দ করলেন। কিন্তু স্থানটি ছিল নদী মোহনার জলাভূমি। পিটার দমবার পাত্র নন। ভরাট করার কাজে নিযুক্ত হলো হাজার হাজার শ্রমিক। ম্যালেরিয়া জ্বরে মরলো বহু লোক। পিটার নির্বিকার। রাশিয়াকে ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের সমকক্ষ করে তুলতে হবে। মস্কো প্রাচীন শহর, নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। এটা নতুন জায়গা, পুরনো স্মৃতি থেকে মুক্ত। ইয়োরোপীয় রেনেসাঁর কিরণ এখানে

সহজেই প্রবেশ করবে। রাশিয়া উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখবে। বিশ্ববিখ্যাত ইতালিয়ান স্থপতি ও চিত্রকর রসত্রেলি শহর এবং রাজপ্রাসাদের নকসা তৈরী করলেন। সামার এবং উইণ্টার প্যালেস নির্মিত হলো। গড়ে উঠলো প্রায় জ্যামিতিক সরল রেখায় নির্মিত অসংখ্য সড়কের দু'পাশে সেণ্ট পিটার্সবার্গ শহর। অসংখ্য খাল কেটে নিয়ন্ত্রণ করা হলো জলাভূমির জল। নেভা নদীর দু'তীরও যথাসম্ভব সরল রেখায় আনা হলো। খাল পারাপারের জন্য শহরে তিন শত পুল আছে। তার মধ্যে এক শ'টি এখনও ড্র-ব্রীজ—রাত দু'টো হতে চারটা পর্যন্ত দু'ঘণ্টা শেষোক্ত পুলগুলো যন্ত্রের সাহায্যে উপরে তুলে নেয়া হয়। তখন বড় জাহাজ চলাচল করে। লেনিনগ্রাদ প্রকৃতপক্ষে সেতুবন্ধ কতকগুলো দ্বীপের সমষ্টি। লোক সংখ্যা ৪৫ লাখ। যাতায়াতের জন্য ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, ভূগর্ভস্থ রেললাইন (মেট্রো) প্রভৃতি সব কিছুই আছে। ওরা গাছ কেটে শহরকে 'তিলোত্তমা' করেনি। নতুন-পুরাতন নির্বিশেষে প্রায় সকল সড়কের দু'দিকে বৃক্ষরাজি। নতুন প্রশস্ত বুলেভার তৈরির কাজ চলছে। সড়ক ঘেঁষে নির্মিত অট্টালিকারাজি আশ্চর্য শৈল্পিক সিমেট্রি রক্ষা করছে। নকসা যেমন সুসমঞ্জস তেমনি একটি বাড়ীও সরল রেখার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেয়নি। শহরে অসংখ্য পার্ক এবং বাগান। বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে মনে হয় একটি বিশাল বাগানবাড়ীতে এসেছি।

নেভা নদীর এক তীরে নোঙ্গর করে রাখা আছে বিপ্লবী যুদ্ধজাহাজ অরোরা। ১৯১৭ সালে যেমনটি ছিল তেমনি। উপরে চড়ে ঘুরে ফিরে দেখলাম। ভিড় লেগেই আছে। পুরনো হয়েও নবীনদের কাছে চিরনতুন অরোরার বৈপ্লবিক আবেদন। জারের উইন্টার প্যালেস বিদ্রোহী অরোরার কামানের পাল্লায় পড়েছিল। আজ উইন্টার প্যালেসের নাম হারমিটেজ—পৃথিবীর বৃহত্তম এবং শ্রেষ্ঠতম আর্ট গ্যালারিগুলোর অন্যতম। হিটলারের বিমানাক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য লেনিনগ্রাদবাসীরা হারমিটেজের মূল্যবান শিল্পনিদর্শনগুলো নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়েছিলেন।

হিটলারের ফ্যাসিস্ট বাহিনী লেনিনগ্রাদের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছিল। অবরুদ্ধ হয় শহর। হিটলারের ব্লিৎসক্রিগ (ঝটিকা) আক্রমণ তখন উত্তুঙ্গে। রুশ-সেনাবাহিনীর উপর প্রচণ্ড চাপ—নগরবাসীদের সহায়তা করার সামর্থ্য সীমিত এবং পথও রুদ্ধ। লেনিনগ্রাদবাসীরা আপন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুললেন। ফ্যাসিস্ট বাহিনীর অক্রমণে শহরের জল সরবরাহ ব্যবস্থা ধ্বংস হলো। বিজলীবাতিও হলো বন্ধ। বাইরে থেকে খাদ্য সরবরাহের উপায় নেই। গোলাগুলীতে প্রতিদিন অগণিত লোক হতাহত হচ্ছেন। ডাক্তার নার্সও নিহত হচ্ছেন। কিন্তু লেলিনগ্রাদ আত্মসমর্পণ করেনি। মহিলারা খাল-বিল-পুকুর থেকে জল টেনে এনেছেন পাঁচ-সাত-দশ তলায়। প্রচণ্ড হিমে জ্বালানির অভাব, খদ্যাভাব। ইঁদুর বিড়াল আরশুলো জঠরজ্বালা নিবারণ করেছে। চোখের সামনে বাড়ীঘর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে—আটকা পড়ে মরছে ভাইবোন মা-বাবা, তবু লেনিনগ্রাদ আত্মসমর্পণ করেনি। একজন মার্শাল পেতা, একজন কুইসলিঙও খুঁজে পায়নি হিটলার ঐ বিশাল শহরের বিপুল জনতার মধ্যে।

ঐ ভয়াবহ দিনগুলোতেও সচেতন নাগরিকেরা ভবিষ্যৎ বংশ-ধরদের জন্য তথ্য রেখেছেন। গণ-গোরস্থানে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে তার প্রমাণ পেলাম। ছোট ছোট কাগজের টুকরোতে লিখিত আছে দিনের নিহতের সংখ্যা—৫৫০০ থেকে ১১০০০ হাজার। মনে মনে নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, কোন্ প্রেরণা সক্রিয় ছিল ঐ অপরাজেয় মনোবলের পেছনে? সেকি শুধু জাতীয়তাবাদ? ফরাসী ও নরওয়েজীয় জাতীয়তাবাদ অগণিত কুইসলিঙ সৃষ্টি করেছিল। ওরা হিটলারের হাতে দেশ তুলে দিয়েছিল। ঐ বিশাল গণ-সমাধি ক্ষেত্রের এক প্রান্তে জ্বলছে অপরাজেয় মানবাত্মার অনির্বান শিখা। হেমন্তের নরোম সূর্যালোকে দাঁড়িয়ে ঐ প্রশ্নের উত্তর মনে মনে খুঁজছিলাম। না, শুধু জাতীয়তাবাদ নয়। সামন্তবাদী সমাজে জাতীয়তাবাদী চেতনা অনুপস্থিত। সেখানে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, অযথাই উলুখড়ের প্রাণ যায়। পুঁজিবাদী সমাজে জাতীয়তা-

বাদী চেতনার উদ্ভব ও বিস্তার। কিন্তু এ সমাজ নানা অর্থনৈতিক শ্রেণী ও স্তরে বিভক্ত এবং এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর সাথে অর্থ-বিত্তের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। দেশরক্ষার দায়িত্ব পেশাধারী সৈনিকের উপর। সেনাবাহিনীও শ্রেণী-চেতনাপ্রসূত আভিজাত্য এবং অনাভিজাত্যবোধ দ্বারা বিভক্ত। তাই পুঁজিবাদী সমাজে যুদ্ধ কখনও জনযুদ্ধ হয় না। পেশাদার সেনাবাহিনীর পরাজয় হওয়া মাত্র কায়েমী স্বার্থান্ধ শাসক-শোষক শ্রেণী ধন-সম্পত্তি এবং সামাজিক শীর্ষ অবস্থান টিকিয়ে রাখার জন্য আত্মসমর্পণ করে। আশ্রিতের নিরাপত্তাওতো নিরাপত্তা বটে। সামন্তযুগে রাজরাজড়ারা শূন্যগর্ভ রাজসিংহাসনের বিনিময়ে দেশ বিকিয়ে দিতে পারতেন। ভারতবর্ষের সামন্ত ও বণিকশ্রেণী ইংরেজের সংগে সহযোগিতা করে ব্রিটিশ শাসনের বুনিয়াদ দৃঢ় করেছিল। স্যার সৈয়দ আহমদ ও নবাব আব্দুল লতিফ ব্রিটিশ শাসনকে আল্লাহতালার রহমত জ্ঞান করে-ছিলেন। পুঁজিবাদের চরম বিকাশের যুগে মার্শাল পেতা এবং নরওয়ের কুইসলিঙ হিটলার বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে স্বশ্রেণীকে নিরাপদ করেছিলেন। পোলাণ্ডের পিলসুডুস্কি সোভিয়েত সহায়তা গ্রহণের চেয়ে তাঁর দেশকে প্রায় বিনাযুদ্ধে হিটলারের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। চীনের চিয়াং কাইসেক স্বদেশের সামা-জিক বিপ্লব মেনে নেয়ার চেয়ে মার্কিনী আশ্রয়ে "স্বাধীন" থাকা বেশী পছন্দ করেছিলেন। তাই মনে হলো, অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদ-বাসীর অজেয় প্রতিরোধক্ষমতার পেছনে জাতীয়তাবাদ একমাত্র প্রেরণা ছিল না। আমার ক্ষুদ্র মতে, সাম্য-মৈত্রী এবং ভ্রাতৃত্বের অকৃত্রিম বন্ধনে আবদ্ধ গণমানুষের সমাজতান্ত্রিক জীবনবোধই ছিল ঐ প্রতিরোধের মূল প্রেরণা। শ্রেণীবৈষম্যহীন সামাজিক জীবনের অপ্রতিরোধ্য মনোবলই শুধু যুদ্ধকে জনযুদ্ধে রূপান্তরিত করতে পারে। এটা সাংস্কৃতিক রূপান্তরও বটে। জনযুদ্ধের পরাজয় নেই। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলেই বহু জাতির সমন্বয়ে গঠিত সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম আক্রমণের মুখে তার সবচেয়ে উর্বর অঞ্চল এবং পাঁচ বৎসরব্যাপী যুদ্ধে তিন কোটি লোক

হারিয়েও পরিশেষে চূড়ান্ত জয়লাভ করেছিল। শেষ পর্যায়ে হিটলার তার সেনাবাহিনীর তিন-চতুর্থাংশ পূর্ব ফ্রন্টে নিয়োগ করেছিল। কিন্তু প্রতি-আক্রমণকারী মার্শাল ঝুকভের সোভিয়েত সেনাবাহিনী সমস্ত বাধা ধূলিসাৎ করে ঝড়ের গতিতে উপস্থিত হলো বার্লিনে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশেও জনযুদ্ধ হয়েছিল। নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর সশস্ত্র শত্রুর অঘোষিত আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল ঐক্যবদ্ধ বাংগালী জাতি। আত্মরক্ষার স্বাভাবিক জৈব তাগিদ প্রসূত স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার নেতিবাচক জাতীয়তাবাদ ছিল বাংলার জনযুদ্ধের প্রেরণা। তাই জয়ী হওয়ার পরমুহূর্তেই দেখা দিল ইতিবাচক প্রেরণাবর্জিত শ্রেণীবিভক্ত অন্তঃসারহীন জাতীয়তাবাদী সমাজের অভ্যন্তরীন স্বার্থ সংঘাত। ইতিবাচক জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রতিষ্ঠার একমাত্র পন্থারূপে সমাজতন্ত্র প্রবর্তনের পর্যায়-ক্রমিক কর্মসূচী গ্রহণমাত্র রাজনৈতিক মানচিত্রে বাংগালী জাতির প্রতিষ্ঠাতা বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হলেন। সংগে সংগে সরকারীভাবে পরিত্যক্ত হলো শুধু সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্র নয়—বাংগালী জাতীয়তাবাদও। দেশ এখন সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের আজ্ঞাধীন। শ্রেণী স্বার্থান্ধ জাতীয়তাবাদী শক্তি এভাবেই দেশের সর্বনাশ করে। ইন্দোনেশিয়া এবং মিশরে তাই-ই হয়েছে।

*　　　*　　　*

গলির পাশে অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত একটি ছোটখাটো পুরনো দোতলা বাড়ী। ১৮০৬ সাল থেকে বলকনস্কি পরিবার এ বাড়ীতে বসবাস করতো। রুশ সাহিত্যের অবিস্মরণীয় নাম আলেকসান্দর পুশকিন ১৮৩৬ সালে বাড়ীটি চার বছরের জন্য ভাড়া নেন। রুশীরা তাঁকে দান্তে, সেকস্‌পীয়র, গ্যয়টে, প্রমুখের সমতুল্য প্রতিভা বলে মনে করেন। তিনি বেঁচে ছিলেন মাত্র ৩৮ বছর—১৭৯৯-১৮৩৭ সাল। তলস্তয়ের জন্মের ৯ বছর পর তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁর ইউজিন ওনেগিন নামক কাহিনীকাব্যের ইংরেজি অনুবাদ বাংলাদেশের সুধীমহলের একটি

সুপরিচিত নাম। অনেকে তাঁর খণ্ড কবিতাও পাঠ করেছেন। ভাবাবেগী কবি আত্মসম্মান রক্ষার্থে ডুয়েলে নামেন। প্রতিপক্ষের গুলী তাঁর মৃত্যুর কারণ। অনেকের মতে, এই শোচনীয় ঘটনার পেছনে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ছিল। রুশীরা মনে করেন, পুশকিনের প্রতিপক্ষ প্রকৃতপ্রস্তাবে জার মন্ত্রিসভার প্রতিনিধি ছিলেন। আহত পুশকিন ৪৮ ঘন্টা বেঁচেছিলেন।

বাড়ীটি এখন পুশকিন মিউজিয়ম। কবির লাইব্রেরী, লেখার সরঞ্জাম, পারিবারিক রুকারি, শয্যা, চেয়ার-টেবিল, ক্যাণ্ডেলিয়ার (ঝাড়বাতি), আহত পুশকিনকে এনে প্রথম যে শয্যায় রাখা হয়েছিল সেটি, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাদ্যাস্ত্র, কবির হস্তলিপি, রচিত গ্রন্থ, কবি, তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্যের ছবি প্রভৃতি সবকিছু বিভিন্ন কামরায় সযত্নে রক্ষিত। পুশকিন সুপুরুষ ছিলেন। স্ত্রী ছিলেন সেকালের ডাকসাইটে সুন্দরী। প্রতিভা মাত্রেই হীনমনা ব্যক্তিদের শত্রু। নির্বিবাদী সক্রেটিস শত্রুদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন। প্ল্যাটোকেও পালাতে হয়েছিল। মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সামাজিক স্থিতিশীলতার (স্টেটাসকো) ভিত শিথিল করে, ফলে বিপ্লব হয়। তাই ওঁরা সব যুগে সব কালেই শাসক-শোষক শ্রেণীর শত্রু। পুশকিনের কাছে চিঠি এলো, তাঁর স্ত্রী ব্যভিচারিনী। সত্যাসত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলাম। স্থানীয় সংগীদের কেউ কেউ বললেন, অভিযোগ হয়তো অসত্য ছিল না। সেকালের, এমনকি পরবর্তীকালের জার আমলীয় সাহিত্যেও অভিজাত মহলে ব্যাপক ব্যভিচারের চিত্র পাওয়া যায়। সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ এবং পরবর্তী মহিলা জার ক্যাথারিন দ্য গ্রেটের ঘনঘন প্রেমিক বদলের বিবরণ রুশ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে।

পুশকিন মিউজিয়ম থেকে বের হওয়ার সময় মনে পড়লো তাঁর অমর কাব্যের চারটি পঙক্তির ইংরেজি অনুবাদ ঃ

Of love ashamed of truth abraid
Foul prejudices fill their brains

Their liberty they gladly trade
For money to procure more chains.

প্রেমে লজ্জিত সত্যে শঙ্কিত
মস্তিষ্ক ওদের কুসংস্কারের আস্তাকুঁড়,
অর্থের বিনিময়ে ওরা বিকিয়ে দেয় স্বাধীনতা,
সংগ্রহ করে আরো অধিক শৃঙ্খলের পরাধীনতা।

আজকের জগতেও পুশকিনের মন্তব্য কত সত্য। খেটে খাওয়া সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ কিন্তু প্রেমে লজ্জিত নয়, সত্যেও ভীত নয়। হোটেলে ফিরে জানালা দিয়ে বাইরের জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। দালানের জানালায় অথবা ছাদে দাঁড়িয়ে রাজপথের জনস্রোত দেখতে আমার ভালো লাগে। মানুষ মরে, জীবন মরে না। জনস্রোতের মধ্যে আমি শাশ্বত জীবন-প্রবাহ দেখতে পাই। পিতা নেই, আমিও থাকবো না, কিন্তু রাজপথের জীবনস্রোত আজকের মতো সুদূর ভবিষ্যতেও সাবলীল ছন্দে বয়ে যাবে। অবারিত যৌথ অস্তিত্বের মধ্যেই জীবনের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। একা মানুষ কিছুই নয়—একটি ধূলিকণার সমতুল্যও নয়।

মনে হলো, বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষকে রেল-লাইন এবং খাল-বিল পাড়ের নোংরা বস্তির নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রেখে আমরা সংস্কৃতি ও সভ্যতার চর্চা করি। সাহিত্য রচনার মালমসলা খুঁজে বেড়াই ঃ কেননা আমরা সহজ স্বাভাবিক মানবিক প্রেমকে লজ্জার চোখে দেখি, আমরা দুর্ভিক্ষের সময় সড়কে মৃতদের পাশ কাটিয়ে কলহাস্যে মোটর দৌড়াই, ছিন্নমূল ভিক্ষুকের প্রসারিত হাতের প্রতি বিরক্তির দৃষ্টি হেনে বড় বড় বিপণিতে প্রবেশ করি ঃ কোটি কোটি মানুষের লজ্জা নিবারণের উপযোগী সামান্য বস্ত্রের ব্যবস্থা না করে হাঁটুর নীচ অবধি লম্বা কোর্তা চড়িয়ে এবং বিশ হাত বস্ত্রে পাগড়ি বেঁধে সুন্নত পালন করি ঃ শতকরা ৮০ জনকে নিরক্ষর ও ভুখা রেখে বহুতল ইমারত বানাই এবং বিদেশী আসবাবপত্র, রেডিও-টেলিভিশনে বাড়ী সাজাই। এই

হচ্ছে আমাদের সুরুচি ও সফিসটিকেশন। কিন্তু এ সভ্যতা কি থাকবে? থাকতে পারে না। অবকাঠামোহীন অধিকাঠামোর ধ্বংস অনিবার্য। আবার মনে পড়লো পুশকিনের কিছু পঙক্তি:

অধৈর্য হয়ো না সাইবেরীয় খনির বন্দী শ্রমিক,
শ্রম তোমার হবে না ব্যর্থ
সমুন্নত রাখো গর্বিত শির—
বিদ্রোহী বীর।
দুর্ভাগ্য ও আশা সহদোরা দুই।
মৃত্তিকার অন্ধকার গর্ভে
নির্বাক তোমার আশা
অন্তরে সঞ্চারে দুঃসাহসের আনন্দ—
আসিবে বাঞ্ছিত সুদিন,
ভেদি অন্ধকার
পৌঁছে দিলাম বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা আমার,
তোমার কঠিন শয্যাপাশে শোনো আমার সংগীত
গুরুভার শৃঙ্খল পড়বে খসে,
নিমিষে পড়বে দেয়াল ধ্বসে
মুক্তির আলো জানাবে স্বাগত
ফিরে পাবে পুনঃ স্বাধীনতার তরবারি।

*　　*　　*

রুশ সম্রাটদের গ্রীষ্মাবাস (সামার প্যালেস) এবং শীত প্রাসাদ (উইণ্টার প্যালেস) এক নকসায় তৈরী। দু'টিই আয়তনে বিশাল। সামার প্যালেসে ঢুকেছিলাম। যতদূর মনে পড়ছে প্রাসাদটি চারতলা। কক্ষ সংখ্যা কত আল্লাহই জানেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরেও একদিনে সামার প্যালেসের সবগুলো কক্ষ ভালো করে দেখা সম্ভব না। হিটলারী বিমান হামলার এটাও ছিল লক্ষ্যবস্তু। শহর থেকে তিরিশ-চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত এ প্রাসাদের উপর বোমা পড়েছিল। কিছু কিছু জায়গা

ভেঙেও গিয়েছিল। মূল প্রাসাদটি রেস্টোরেশনের কাজ শেষ হয়েছে। এখন এ প্রাসাদ দর্শকদের জন্য খোলা, তবে টিকিট কেটে ঢুকতে হয়। বহির্বাটিতে অবস্থিত চাকর-নকর-আমলাদের একতলা দালান-কোঠা, আস্তাবল প্রভৃতি এখনও সম্পূর্ণ মেরামত হয়নি।

দক্ষ স্থপতি, চিত্রশিল্পী এবং ভাস্কর একত্রে মিলেই শুধু সামার প্যালেসের ভেতর ও বাহিরের বর্ণনা দিতে পারে। অসংখ্য কামরার নির্মাণকৌশল, দেয়ালগাত্র ও মাথার উপরে ছাদের সোনালী কারুকার্য ও বিচিত্রন, শ্বেতপাথরের নগ্ন-অর্ধনগ্ন নারী-মূর্তি, সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞীদের তৈলচিত্র, শয্যা, আসবাবপত্র, বাসনকোসন প্রভৃতি এযুগের অপরিমেয় ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিকেও যুগপৎ বিস্মিত ও অভিভূত করবে। পিটার এবং ক্যাথারিন—দু'ই গ্রেটের তৈলচিত্র বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম। পিটারকে রুশ দেশের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। প্রায় নিরক্ষর পিটার নানা ছদ্মবেশে রেনেসাঁর আলোকে আলোকিত পশ্চিম ইয়োরোপ—এমনকি ইংলণ্ডও ঘুরেছিলেন। পশ্চিম ইয়োরোপে তখন শিল্প বিপ্লব শুরু হয়েছে। পিটার ১৭২৫ সালে মারা যান। নানা ধরনের নিষ্ঠুরতা এবং বর্বরতা সত্ত্বেও পিটার দ্য গ্রেটই প্রকৃতপক্ষে আধুনিক রাশিয়ার প্রথম স্থপতি। শ্বাশুড়ী এলিজাবেথের মতো ক্যাথারিনও ছিলেন চরম নিষ্ঠুর এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ। এলিজাবেথ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে হত্যা করেন। স্বামীর মৃত্যুতে ক্যাথারিনের হাত ছিল। স্বরচিত রোজনামচায় ক্যাথারিন চরিত্রের আভাস পাওয়া যায়। ক্যাথারিন লিখেছেন, "নীতির কথায় কি হবে, ইন্দ্রিয় জাগ্রত হলে মানুষ নীতির দেয়াল অতিক্রম করে যায়। আমি কোনক্রমেই আমার ইন্দ্রিয় দমন করতে পারিনা। পালিয়ে আত্মরক্ষা করা যায় হয়তো। কিন্তু রাজত্ব এবং রাজদরবার ছেড়ে পালাবো কি করে। পালালে মানুষের রসনা রসাল হবে। যে কাজ মানুষকে আনন্দ দেয় তা থেকে বিরত থাকা অসম্ভব। তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমস্ত যুক্তি প্রকৃতপক্ষে নিজেকে ফাঁকি দেয়া।"

ইন্দ্রিয়াসক্তা হলেও এ মহিলা কূটনীতিতে অসাধারণ যোগ্যতা দেখিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "কুসংস্কারের প্রতি সাধারণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করা ভালো। কিন্তু চাপ দিতে নেই। দার্শনিকেরা ভালোই জানেন যে, জাতীয় জীবনে এমন বহু কুসংস্কার থাকে যেগুলোকে শ্রদ্ধা করা উচিত। শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যমান কুসংস্কারাদিও বিচার-বিবেচনা সাপেক্ষ। ধর্মীয় কুসংস্কারাদি উৎসাহিত করতেই হয়।" আবহমানকাল থেকে শাসক-শোষক শ্রেণী এ নীতিই অনুসরণ করে আসছে। চোরকে চুরি করার এবং সাধুকে সজাগ থাকার যে প্রবচনটি আমাদের দেশে প্রচলিত সেটি সম্ভবত চানক্য (কৌটিল্য) রাজনীতির সংক্ষিপ্তসার। বর্তমান বাংলাদেশেও আমরা ক্যাথারিন-রাজনীতি ও সমাজনীতির প্রয়োগ ভালোভাবেই দেখছি।

সমরকন্দ-বোখারার পুরাকীর্তি দেখে মোগল আমলের দিল্লী আগ্রার স্থাপত্যশিল্পকে শিশু মনে হয়েছিল। সামার প্যালেস দেখে মনে হলো, ব্যয়বাহুল্য, বিলাসিতা এবং অনাচার-ব্যভি-চারে রুশ জারদের মোকাবেলায় মধ্য-এশিয়ার মুসলিম রাজা বাদশাহগণ ছিলেন দুগ্ধপোষ্য শিশু। মধ্যযুগের উৎপাদন ক্রিয়ায় আধুনিক যন্ত্রপাতি অনুপস্থিত ছিল। প্রাচীন পদ্ধতির কৃষিই ছিল প্রধান অর্থনীতি। ওরকম পশ্চাৎপদ আর্থ-ব্যবস্থার মধ্যে এ শ্রেণীর বিলাসভবন নির্মিত হয়েছে। ভার বহন করেছে জনসাধারণ। ইতিহাস কীর্তি স্থাপনকারীদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলে। পশুর মতো ভারবহনকারী জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায় সাহিত্যে।

সামার প্যালেস সংলগ্ন বিশাল বাগান ও জলাধার দেখে হোটেলে ফেরার পথে গাড়ীতে বসে আমার মনে প্রশ্ন জাগলো, ১৯১৭ সালের বহু আগেই জারতন্ত্র উচ্ছেদ হলো না কেন? আরো শ'-পঞ্চাশ বছর আগে নির্যাতিত জনগণের রোষে জারবংশ নির্বংশ হলেও বিস্ময়ের কিছু থাকতো না। মধ্য-এশিয়ার আমীর ওমরাহ

রাজাবাদশাহগণও শত বৎসর আগে উৎখাত ও নিশ্চিহ্ন হতে পারতেন। ধর্ম-ব্যবসায়ী মোল্লাদের সংগে মিলে ওঁরা ধর্মের নামে যে অধর্ম দেশে চালিয়েছিলেন তাঁর তুলনা মধ্যযুগের যাজকশাসিত ইয়োরোপেই শুধু পাওয়া যায়।

লেনিনগ্রাদের শেষ রাত্রিটি বেশ আনন্দে কাটলো। বিয়েলোরুশিয়ান দলের এক বিচিত্রানুষ্ঠান ছিল শহরের এক সুন্দর প্রেক্ষাগৃহে। দু'ঘণ্টার প্রোগ্রাম। মূলতঃ লোকনৃত্য ও লোকসংগীত। তার মধ্যে আধুনিক মোটিফ্ এবং মঞ্চায়ন কৌশল যুক্ত হয়েছে। চমৎকার পারফরম্যান্স। স্বদেশ এবং বিদেশের লোকসংগীত ও নৃত্য দেখে মনে হলো, যেখানে যে পরিবেশেই অনুষ্ঠিত হোক, লোক সংস্কৃতি একটি সাধারণ মানবিক ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। বিশ্বজুড়ে তার আবেদন। অব্যাখ্যাত এক অন্তর্লীন ফল্গুধারা এই ঐক্য রক্ষা করছে। বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে সমুদ্রশোভা অথবা পর্বতশীর্ষে দাঁড়িয়ে নিসর্গশোভা দেখার মতো এক অব্যাখ্যাত সুন্দরের মধ্যে মনকে নিয়ে যায় লোক সংস্কৃতির অনুষ্ঠান ।

সতের

তেইশে সেপ্টেম্বর, '৮০। বিকেল একটার কিছু পরে আবার ফিরে এলাম মস্কোতে। পরদিন দুপুরটা কাটলো বাংলাদেশ দূতাবাসে। রশীদ আহমদ সাহেব রাষ্ট্রদূত। অত্যন্ত অমায়িক এবং নম্রভাষী এই ভদ্রলোকের সান্নিধ্য আমাকে অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছিল। তিনি ফিনল্যাণ্ডেও আমাদের রাষ্ট্রদূত। সেখানেও তাঁকে যাতায়াত করতে হয়। একটি বহুতল অট্টালিকায়, কোন্ তলায় যেন মনে করতে পারছিনা, অপেক্ষাকৃত অল্প পরিসরে আমাদের দূতাবাস। কর্মচারীর সংখ্যা খুব বেশী নয়। সেক্রেটারি সালাহউদ্দীন সাহেব এবং আরো কয়েকজন এলেন। কফি এবং নানা রকম উপাদেয় বিস্কুট এলো। স্বদেশ-বিদেশ সম্পর্কিত হালকা আলাপে সময়টা বেশ কাটলো। পঁচিশ দিন পর মাতৃভাষায় ভাব বিনিময়ের সুযোগ পেয়ে ওঁদের চেয়ে সম্ভবত আমিই বেশী আনন্দ বোধ করছিলাম। শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অফিসার আমাদের দেশের প্রখ্যাত কবি এবং কথাশিল্পী ডক্টর আলাউদ্দীন আল-আজাদ তখন ছুটিতে লণ্ডনে ছিলেন। সেদিন তাঁর সংগে দেখা হলো না। লণ্ডন যাওয়ার আগেই তিনি এবং তাঁর স্ত্রী আমাকে রীতিমতো কোর্মা-পোলাও সহযোগে নৈশভোজে আপ্যায়িত করেছিলেন।

মস্কোতে অনেকদিন ধরে আছেন ঢাকার নটরডেম কলেজের উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ভূতপূর্ব অধ্যাপক এবং প্রখ্যাত লেখক দ্বিজেন শর্মা। তিনি সেখানকার এক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে বাংলা অনুবাদ বিভাগে কাজ করেন। স্ত্রী ও পুত্রকন্যা নিয়ে শহরতলির বহুতল বাড়ীর সুসজ্জিত ফ্লাটে তাঁর বাসা। ভাড়া খুব কম, মাত্র ১০

রুবল। তাঁর স্ত্রী ও পুত্র তখন লণ্ডনে বেড়াতে গেছেন। কিন্তু তাতে পিছপা হননি অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা। তিনি নিজের হাতে রান্না করে দু'দিন ভূরিভোজন করালেন। তাঁর হাতের বাঁধাকপি ভাজির স্বাদ আজীবন অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। দ্বিজেন বাবুর বালিকা কন্যার প্রাণোচ্ছলতা আমাকে পুনরায় নিজ বাল্যকালে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। সে স্থানীয় স্কুলে যায়, রুশী বালিকারা তার বন্ধু। রুশী ভাষা এখন তার দ্বিতীয় মাতৃভাষা।

২৬শে সেপ্টেম্বর বিকেলটা কাটলো রাইটার্স ইউনিয়নের (লেখক সংঘ) অফিসে। সম্পাদক মিরিয়ম সালগানিকের কক্ষে একটি ছোটখাটো আলোচনা বৈঠক বসেছিল। বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে তাসখন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে উজবেক ভাষার অধ্যাপক ইয়াকুব এবং একজন তরুণ কবিও উপস্থিত ছিলেন। আমার দোভাষী নাতাশা ছাড়াও অন্য দোভাষী ছিলেন। কিন্তু আলোচনার এক পর্যায়ে দেখলাম, সব চেয়ে দক্ষ দোভাষীর কাজ করছেন মিরিয়ম সালগানিক নিজে। মহিলা বাংলা জানেন না বটে, কিন্তু ইংরেজি-সহ কয়েকটি বিদেশী ভাষা বেশ ভালোই জানেন।

বাংলা এবং বিশ্বসাহিত্য বিষয়ে দীর্ঘ সময় আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ শুধু সুপরিচিত নাম নয়, রবীন্দ্র সাহিত্যের সংগেও অনেকেই পরিচিত। নজরুল কাব্যের রুশী অনুবাদ আছে এবং ওঁরা পাঠ করেছেন। জিজ্ঞাসিত হয়ে আমি বললাম, আমার মতে, বাংলা কাব্য এবং সংগীতে রবীন্দ্রনাথের পরেই নজরুলের স্থান। তৃতীয় স্থানে আছেন জীবনানন্দ দাশ। রবীন্দ্র-যুগে রবীন্দ্র প্রতিভার সর্বগ্রাসী বলয়ের বাইরে তাঁর কাব্যজীবনের মধ্যাহ্নেও নিজস্ব কাব্যভুবন তৈরী করতে সর্বপ্রথম সক্ষম হন কাজী নজরুল ইসলাম। বিদ্রোহী নামক কবিতা বাংলা সাহিত্যে অভিনব সৃষ্টি—নতুন মূল্যবোধ এবং নতুন দিগন্তের উন্মোচন। সাম্যবাদী নামে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে সাম্যবাদী চেতনার প্রথম বলিষ্ঠ স্বাক্ষর। তিন হাজারের বেশী গানের রচয়িতা

এবং সুরস্রষ্টারূপে নজরুল ইসলাম তাঁর আশ্চর্য স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে এখনও ভাস্বর। বাংলা ভাষাভাষী শ্রোতা তিনজন সুরস্রষ্টার সংগীতের প্রথম দু'টি পঙক্তি শোনামাত্র বলতে পারে ওটা কার রচনা। প্রথম ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় ব্যক্তি কাজী নজরুল ইসলাম এবং তৃতীয় ব্যক্তি অতুল প্রসাদ সেন। সুধীন দত্ত ভাষার কারুকার্য সত্ত্বেও রবীন্দ্রবলয় অতিক্রম করতে পারেন নি। সুভাস মুখার্জি, ফররুখ আহমদ এবং সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্যজীবনের সূত্রপাতে নজরুলের বিদ্রোহী এবং সাম্যবাদীর প্রেরণা অস্বীকার করা যায় না। জীবনানন্দ দাশ নৈসর্গিক সুন্দরের কবি। তাঁকে কিছুটা নৈরাশ্যের কবিও বলা যায়। জীবনানন্দ দাশের পরিণত বয়সের কাব্যভুবন, ভাষাশৈলী, প্রকাশভঙ্গী ও বোধ প্রভৃতি সব কিছুই তাঁর নিজস্ব এবং স্বকীয়তার গুণে অনবদ্য। বাংলাদেশের সবচেয়ে খ্যাতিমান কবি শামসুর রাহমান মূলতঃ জীবনানন্দধর্মী। শামসুর রাহমানের হাল আমলের কবিতা সবল জীবনবোধ, সুস্থ মানবিকতা এবং প্রবল স্বদেশপ্রেমে প্রদীপ্ত।

সর্বাধুনিক কবি সাহিত্যিকদের খোঁজ খবরও ওঁরা জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আমার প্রথমেই মনে পড়লো নির্মলেন্দু গুণের নাম। তার সিনিয়রদের মধ্যে সকলের আগে নাম করতে হয় রফিক আজাদ, মহাদেব সাহা প্রমুখের। অত্যন্ত তরুণ কবিদের মধ্যে নির্মলেন্দু গুণ, আমার মতে, সবচেয়ে সবল জীবনবাদী দুঃসাহসী এবং সমাজ সচেতন কবি। স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যে কাব্যের নান্দনিকতা অক্ষুন্ন রেখে নির্মলেন্দু গুণ অত্যাচারিত-নির্যাতিত মাটির মানুষের মনের কথা সহজবোধ্য ভাষায় অবলীলাক্রমে বলে যাচ্ছেন। তাঁর স্বকীয়তা এখন তর্কাতীত। কথাশিল্পীদের বিষয়ও উঠেছিল।

বাংলার লোক সংস্কৃতি সম্বন্ধেও ওঁরা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। বাংলার লোক সংস্কৃতির মূল আবেদন কি? এই ছিল

ওঁদের প্রশ্ন। আমি চণ্ডীদাসের সুবিখ্যাত পঙক্তি, "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই" আবৃত্তি করে বললাম, বাংলার লোক সংস্কৃতির এটাই মূল আবেদন। বহু ধর্ম এবং নানা নৃগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ হয়েছে বাংলাদেশে। কিন্তু পল্লীবাসী সাধারণ মানুষ বিশেষ কোনো ধর্ম বা নৃগোষ্ঠীর গোঁড়ামি গ্রহণ করেনি। তার স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহ অস্বাভাবিক উত্তেজনামূলক ক্রিয়া-কলাপ দ্বারা কলুষিত হয়নি। বাংলার লোক সংস্কৃতির সবকিছু—তার সংগীত, সুর, বাদ্যযন্ত্র, কাব্য, গাঁথা, কাহিনী, তৈজসপত্র, গৃহনির্মাণপদ্ধতি, অংকন ও সূচীশিল্প, কৃষি যন্ত্রপাতি, আহার্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, গৃহসজ্জা, শয্যা প্রভৃতি এক আশ্চর্য ঐক্যবন্ধনে বাঁধা ঃ শত শত বৎসরব্যাপী যৌথ সাধনা ও সৃজনের এক আশ্চর্য সমন্বয় এবং মিশ্রণ। তাই আমরা দেখতে পাই, লালন শাহের মতো রবীন্দ্রনাথও এক পরম বাউল যিনি বৃষ্টিবিন্দুর পতনকে একতারার ঝঙ্কারের সাথে তুলনা করেন। বাংলার লোক সংস্কৃতি কোনো বিশেষ ধর্ম বা নৃগোষ্ঠীর সব কিছু অবিকলভাবে কখনও গ্রহণ করেনি। এ সংস্কৃতিকে একদেশ-দর্শিতার দিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়নি কোনো রাজা এবং রাজতন্ত্র। বাংলার লোক সংস্কৃতি আবহমানকাল ধরে এসটাবলিশমেন্টকে উপেক্ষা করেছে ঃ করেছে অঘোষিত বিদ্রোহ। কিন্তু দুর্বলতামুক্তও নয় সে। ব্যক্তির অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাসী এ সংস্কৃতি। অলৌকিক ভক্তিবাদ বাংলার লোক সংস্কৃতির একটি বিশেষ উপা-দান। এ ব্যাপারে জীবিত-মৃত ভেদাভেদ নেই। এমনকি সমাধিমন্দির, কবর, প্রভৃতির অলৌকিক ক্ষমতায়ও বাংলার মানুষ বিশ্বাসী। যৌথ কর্মোদ্যোগের চেয়ে ডেমাগগ রাজনীতি:কর উপর বাংগালীর অধিকতর আস্থার কারণ সম্ভবত এটাই। ভক্তি-বাদ কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থূল যৌনাচারের মধ্যে পালিত। স্বাধীনতা সংগ্রামের মতো দুঃসাধ্য কাজে অগণিত প্রাণদান করে সাফল্যলাভ সত্ত্বেও বাংলার জনজীবন আজও যে তিমিরে সেই

তিমিরেই থাকার কারণও সম্ভবত এগুলোই। ওঁরা বললেন— লোক সংস্কৃতি পৃথিবীর সর্বত্রই নানা পরস্পরবিরুদ্ধ উপাদানে গঠিত : সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটতে বহু সময় লাগে, রাজনৈতিক রূপান্তরের মতো সহসা ঘটেনা।

আমরা অন্য প্রসংগে এলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, বিগত এক শতাব্দীকালে পশ্চিম ইয়োরোপে শিল্পকে (আর্ট) নানাভাবে বোঝার চেষ্টা হয়েছে। সিম্বলিজম, সার-রিয়ালিজম, রিয়ালিজম, স্ট্রীম অব কনসাসনেস এবং সবশেষে এক্সিসটেনশিয়ালিজম— প্রভৃতি দার্শনিক তত্ত্বভিত্তিক সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে আপনাদের মতামত কি? ওঁরা খুব সহজভাবেই উত্তর দিলেন, মানব-মস্তিষ্ক স্থবির নয়। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমেই মানবসমাজ এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা কোনো দার্শনিক তত্ত্বভিত্তিক শিল্পকর্ম নাকচ করি না। কিন্তু আমাদের মতে, সোশালিস্ট রিয়ালিজম (সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা) এ যুগের শিল্পদর্শন। সোশালিস্ট রিয়ালিজম নিছক বাস্তব অবস্থার বর্ণনা নয়। বৃহত্তর মানব-কল্যাণের পরিপন্থী বা প্রতিকূল বাস্তব অবস্থা পরিবর্তনের সবল ইংগিতময় শিল্পকর্মকে আমরা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা বলে মনে করি। ওঁদের মতে গোর্কী সোশালিস্ট-রিয়ালিস্ট, পক্ষান্তরে শেকভ বিমূর্ত কল্পনাশ্রয়ী এ্যাবস্ট্রাকশনিস্ট। শেকভের রচনা সোশালিস্ট রিয়ালিজমের প্রতিনিধিত্ব করছে না।

সমাজে লেখকের ভূমিকা সম্বন্ধে ওঁরা আমার মতামত জানতে চাইলেন। লেখক কি সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন? ওঁরা প্রশ্ন করলেন। আমি বললাম, একজন লেখক একা কতটুকু পারেন বলতে পারছি না, কিন্তু সম্প্রদায় হিসেবে অবশ্যই পারে। অন্ধকার থেকে আলোতে, অন্ধ আস্থার বেড়াজাল থেকে মুক্ত অঙ্গনে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মহৎকার্যে লেখক শ্রেণীর অবদান রাজনীতিকের অবদানের চেয়ে অনেক বেশী স্পষ্ট এবং সার্থক। প্ল্যাটো, এ্যারিস্টটল হতে শুরু করে

মার্কস-এ্যাঙ্গেলস-লেনিন-রাসেল পর্যন্ত সবাই ছিলেন লেখক। কম্যুনিস্ট মেনিফেস্টো শুধু শ্রমিকের মুক্তিসনদ নয়, অত্যন্ত উন্নত মানের সাহিত্যকর্মও বটে। বাইবেলের মতো এটিও বিশ্ব সাহিত্যের ক্লাসিক। প্রতিভাবান শিল্পী সামাজিক এবং ব্যৈক্তিক মনের নানা বিচিত্র—অনেক সময় পরস্পর-বিরুদ্ধ—ভাবনা-চিন্তা বীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার মধ্যেও সবল জীবনবাদী স্রোতকে অগ্রাধিকার দিতে পারেন। বিদ্রূপ করতে গিয়েও পাঠকের মনে প্রতিকার স্পৃহা জাগ্রত করতে সক্ষম মলিয়ের মতো লেখক।

আলোচনার শেষের দিকে রাজনীতির কথা ওঠাতে বললাম, এশিয়া-অফ্রিকার অনুন্নত দেশের অধিকাংশ রাজনীতিক আক্ষরিক অর্থে না হলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে মূর্খ। মূর্খতার সঙ্গে মিশেছে সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থপ্রসূত অদূরদর্শিতা। সাধারণ মানুষের নিরক্ষরতা ও অজ্ঞানতা ওদের রাজনীতির উপাদান। এশিয়া-আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলোর এটাই সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। লেনিন ছিলেন একাধারে বড় লেখক, দার্শনিক এবং রাজনীতিক। সব অর্থেই তিনি ছিলেন একজন মহৎ শিল্পী। অনুন্নত দেশকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঐ শ্রেণীর দক্ষ শিল্পী চাই—এমন শিল্পী যিনি যুগপৎ ভাঙ্গা এবং গড়ার কাজ করতে সক্ষম।

পরে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, রুশী জনসাধারণ এখন কাফ্কা হেরম্যান হেস, গুন্টার গ্রাস, ক্যামু, সার্ত্রে, জয়েস, প্রুস্ত এমনকি মাদাম বভিয়েঁও পাঠ করে। অপরদিকে দস্তয়ভস্কির সকল রচনাই এখন প্রকাশিত ও বিক্রয় হচ্ছে।

বিখ্যাত আণবিক বিজ্ঞানী সাখারভ, ঔপন্যাসিক সোলঝ্নিৎসিন কবি পাস্তেরনাক, প্রমুখের বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। অসাধারণ প্রতিভাবান বিজ্ঞানী সাখারভ। এ বিষয়ে ওঁরা একমত। ওঁদের মতে পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়াবহতা বিজ্ঞানী সাখারভের মস্তিষ্কের

ভারসাম্য নষ্ট করেছে। তিনি এখনও একজন সম্মানিত ব্যক্তি। সোলঝেনিৎসিন এবং পাস্তেরনাক সম্বন্ধে ওঁদের মন্তব্য অন্য রকম। স্তালিন আমলের একটি বিশেষ দিককে অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিতে গিয়ে ওঁরা সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃতিত্ব এবং তার বৃহত্তর স্বার্থের দিক বিস্মৃত হয়েছেন—এই ওঁদের মত।

দেশ থেকে যাওয়ার সময় মনে মনে ঠিক করেছিলাম, বিশাল সোভিয়েত ইউনিয়নের বহু দর্শনীয় বস্তু বাদ পড়লেও, তলস্তয়ের বাড়ী এবং সমাধি না দেখে ফিরব না। ইয়াজনিয়া পলিয়ানা আজ বিশ্ববিখ্যাত স্থান—মস্কোর সঙ্গে পাকাসড়কে যুক্ত। সেকালে এটা ছিল একটি জংগলাকীর্ণ সাধারণ গ্রাম। মস্কো থেকে ২৫০ কিলোমিটারের (১৬০ মাইল) পথ। তলস্তয়ের জীবনকাহিনীতে পড়েছি, সে সময়ে ইয়াজনিয়া পলিয়ানা থেকে মস্কো যাতায়াতের জন্য ঘোড়ার গাড়ী ব্যবহৃত হতো। কর্দমাক্ত পথে মস্কো পৌঁছিতে কত সময় লাগতো আল্লহই জানেন। মস্কো-তুলা রেলপথও ছিল। কিন্তু ইয়াজনিয়া পলিয়ানা থেকে তুলা শহর খুব কাছে নয়।

তলস্তয়ের প্রতি আমার অনুরাগ তাঁর সাহিত্যের সংগে পরিচিত হওয়ার দিন থেকেই। ওয়ার এ্যাণ্ড পীস, আমার মতে, এখনও বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। তাঁর রিসারেকশন কাফকাকে অনুপ্রাণিত করেছিল কি না কে জানে! সাতাশে সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ন'টায় ট্যাক্সিতে করে রওয়ানা হলাম। আমার সংগিনী নাতাশা এবং ড্রাইভার উভয়েই আমার মতো নতুন যাত্রী। ওঁরা কেউ জীবনে এদিকে আসেন নি। আমি বিদেশী। মানচিত্রনির্ভর আমার জ্ঞান। ভাগ্য ভালো, সেদিন আকাশ ছিল রৌদ্রালোকে ঝলমলে। মস্কোর শহরতলি ছাড়তেই শুরু হলো দু'পাশে ঘন বন এবং চড়াই-উৎরাই। ক্রমে প্রাইভেট গাড়ীর সংখ্যা কমে এলো। দু'পাশের সরু কিন্তু দীর্ঘদেহী বৃক্ষরাজি শোভিত ঘন বন ভেদ করে চলেছে সুপ্রশস্ত আধুনিক হাইওয়ে। প্রচণ্ড

বেগে চলছে যাত্রীবাহী বাস এবং মালবোঝাই লরি। জংগলের ধারে স্থানে স্থানে যুবক যুবতীরা চড়ুইভাতি করছে। ড্রাইভার দু' দু'বার পথ ভুল করলো। একটা মোড়ে গিয়ে মূল সড়ক ছেড়ে অন্য সড়ক ধরলো। আমি বিদেশী। তবু আমার সন্দেহ হলো। কয়েক মাইল যেতে, আমি বললামঃ সন্দেহ হচ্ছে, মনে হয় ভুল পথে চলছি, কাউকে জিজ্ঞাসা করে নাও।

ভাগ্য ভালো, একজন লোক পাওয়া গেল। ভুল ধরা পড়লো। গাড়ী ঘুরিয়ে আবার মূল সড়কে পড়লাম। দ্বিতীয়বার ভুল হলো একটি ছোটখাটো শহরে। ড্রাইভার হাইওয়ে ছেড়ে অন্য রাস্তায় চলে গেল। কিছুদূর গিয়ে দেখি সামনে এক নয়নাভিরাম স্রোতোস্বিনী—সড়ক ওখানেই শেষ। কিছু দূরে রেলওয়ে ব্রীজ। সেখানে এক ভদ্রলোক আমাদের সাহায্য করার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গাড়ীতে উঠলেন। বেশ কয়েক মাইল পেছনে যেতে হলো। মূল সড়ক ধরিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক নেমে গেলেন। দু' দু'বারের ভুলে বেশ কিছুটা সময় অপচয় হলো। পথে পড়লো তুলা শহর। এখন বেশ বড় শহর। নানা কলকারখানা স্থাপিত হয়েছে। বিরাশি বছর বয়সে তলস্তয় গোসা করে বাড়ী ত্যাগ করেন এবং তুলা পৌঁছে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। রেলস্টেশন সংলগ্ন একটি ছোট বাড়ীতে এখানেই তিনি পরলোকগমণ করেন। এটা ১৯১০ সালের ঘটনা। আজ তুলার বহু পরিবর্তন হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন শুধু নিজের জন্য নয় সারা দুনিয়ার জন্য নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে যাচ্ছে। তবু পথিপার্শ্বে কাউন্ট লেভ তলস্তয়ের মৃত্যুর অবিস্মরণীয় ঘটনার চেয়ে অধিক অবিস্মরণীয় কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা তুলা শহরের সাথে আর কখনও যুক্ত হবে কি না সন্দেহ।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে প্রায় আড়াইটা বেজে গেল। শীতল হাওয়া শন শন বইছে। কিন্তু আকাশ পরিচ্ছন্ন এবং সূর্যালোকিত। ইয়াজনিয়া পলিয়ানা এখন আর সেকালের গণ্ড গ্রামটি নেই।

ঘন বন ঘেরা তলস্তয়ের বসত বাড়ীর সম্মুখে দিয়ে একটি শাখা সড়ক চলে গেছে। সড়ক সামনে রেখে ট্যুরিস্টদের জন্য বাড়ী ছাড়াও দু'টি রেস্তোরাঁ উঠেছে। অসংখ্য দেশী-বিদেশী পর্যটক বাস ভর্তি করে আসছে যাচ্ছে। টিকেট করার জন্য দোতলা বাড়ীর নীচে অফিস ঘর। তলস্তয়ের বাড়ীর প্রবেশমুখে পাকা গেট। কুঠরিতে বসা প্রহরীকে টিকেট দেখিয়ে প্রবেশ করতে হয়। গাড়ী ঢুকতে দেয়া হয় না। ঢুকতেই বাঁ দিকে একটি বড় জলাশয়। ডান দিক থেকে একটি পাহাড়িয়া ঝর্ণা এসে জলাশয়ে মিশেছে। উপরে পাকা সেতু। ডান দিকে কিছুটা দূরে ঝর্ণার উপরে একটি বাঁশের সাঁকো দেখলাম। ওঁরা বললেন, তলস্তয়ের কালে ঠিক ও-জায়গাটায় ওরকম বাঁশের সাঁকো ছিল। তিনি ওটার উপর দিয়ে পারাপার হতেন। তাই ওটা ওখানেই রাখা হয়েছে। ঘন বনাকীর্ণ বিশাল জায়গা নিয়ে জমিদার বাড়ী। প্রথমে চোখে পড়লো জলাশয়টিকে সামনে রেখে একটি মস্ত বড় একতলা। সম্ভবতঃ ওটি ছিল কাচারি বাড়ী ঃ নায়েব গোমস্তা তহশিলদারদের দপ্তর—আমাদের দেশের বড় জমিদারদের যেমন ছিল তেমনি। তারপর কিছুদূর অগ্রসর হলে হাতের বাঁ দিকে একটি ছোট দোতলা বাড়ী এবং ডান দিকে কিছু দূর এগিয়ে গেলে তলস্তয়ের নিজের দোতলা বসত-বাড়ী, আজ যেটি তলস্তয় মিউজিয়ম। বসত বাড়ীটি খুব একটা বড়ও নয়, অসাধারণ কিছুও নয়। আমাদের দেশের বড় জমিদারদের বাড়ীঘরের তুলনায় নিতান্তই আটপৌরে একটি সাধারণ বাড়ী ঃ নীচে-উপরে মিলিয়ে দশ বারটি কামরা হতে পারে। এ বাড়ীর ছবির সাথে আমরা পরিচিত।

দু'ধারে গভীর জঙ্গল ঃ নীচে ঝরা-পাতার মর্মরধ্বনি। সোঁ সোঁ বাতাস বইছে। মধ্যের অপ্রশস্ত রাস্তা ধরে এগিয়ে চলছি আর চড়াইউৎরাই ভাঙছি। এ পথে প্রায় এক মাইল হেঁটে তলস্তয়ের সমাধিস্থলে পৌঁছলাম। তিনটি সুউচ্চ তরুমূলে তলস্তয়ের মাটির কবর। কোথাও ইট-পাথরের চিহ্ন নেই। হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে

কবরের মাটি আধ হাত খানিক উঁচু একটি ছোট বেদীর মতো করে স্তূপীকৃত। অসংখ্য লোক ফুল নিবেদন করছে। কয়েকটি নববিবাহিত দম্পতি দেখলাম। রেজিস্ট্রেশন অফিস অথবা গির্জা থেকে সরাসরি তলস্তয়ের সমাধি জেয়ারত করতে এসেছে। কৌতূহল হলো। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, বিয়ের পর মহান ব্যক্তিদের সমাধি দর্শন ও শ্রদ্ধা নিবেদনের রেওয়াজ নাকি রাশিয়ার কোনো কোনো অঞ্চলে আছে। মনে পড়লো, তলস্তয়ের মৃত্যুর এক যুগেরও বেশী আগে নোবেল পুরস্কার চালু হয়। তলস্তয়কে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয় নি। কিন্তু তলস্তয় আজও নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত অসংখ্য লেখকের বহু উর্ধ্বে অবস্থান করছেন। তিনি বিশ্ব-সাহিত্যে অমর—যেমন অমর সেকসপিয়র, গ্যয়টে প্রমুখ মণীষী। পুরস্কার, প্রশংসা, বিরূপ সমালোচনা তলস্তয়ের মর্যাদা বৃদ্ধি বা হানি করতে পারে না। অপরদিকে গোড়া রুশ চার্চ কর্তৃক বহিষ্কৃত হয়েও তিনি গুড খ্রীশ্চান। পাদরী কর্তৃক সমাহিত না হয়েও তিনি মহৎ ঃ তাঁর কবর বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধাস্থল। তলস্তয়ের সমাধিস্থলে আগত দেশী-বিদেশী পর্যটকের সংখ্যা এবং অর্ঘ্যরূপে নিবেদিত পুষ্পসম্ভার আমাকে বিস্মিত করে নি। আমি বিস্মিত হয়েছিলাম, সমাধিসৌধ না দেখে। শুনলাম, ঐ তিনটি তরুতলে একজন সাধারণ মানুষের মতো সাধারণভাবে সমাধিস্থ হওয়ার অসিয়ত তিনি নিজেই নাকি করে গিয়েছিলেন। কোনো সৌধ নয়, নিয়মিত মোমবাতি বা বিজলীর আলোক নয়, মাটির দেহ মাটিতে বিলীন হয়ে যাক, উপর হতে পড়ুক পত্রপল্লব এবং ফুলের মওসুমে ফুল। মনে পড়লো, লাহোরের উপকণ্ঠে সাম্রাজ্ঞী নূর-জাহানের উপেক্ষিত কবরের কথা। তার উপরেও ছোট একটি ইটের কুঠি আছে। তলস্তয়ের কবরের উপরে তাও নেই। মস্কো, লেনিনগ্রাদে ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের গোরস্থান দেখেছি—দেখেছি প্রতিটি সমাধি গাত্রে উৎকীর্ণ পরিচয় পত্র। ও রকমের কোনো পরিচিতি ফলক তলস্তয়ের কবর চিহ্নিত করে না। মানুষের অন্তর চিহ্নিত করছে তাঁর প্রকৃত স্থান। সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে

যাঁরা যুগে যুগে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের সমাধি মন্দির সমগ্র বিশ্ব।

চারদিকে গভীর জঙ্গল। কারা যেন কিছুটা জায়গা সাফ করে বাঁধাকপির চাষ করেছে। তলস্তয়ের সাহিত্য জীবনের কথা ভাবছিলাম। তিনি ১৮২৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ওয়ার এ্যাণ্ড পীস রচনা শুরু করেন ১৮৬২/৬৩ সালের দিকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মস্কো পিতর্সবার্গের আভিজাত্য ও গরিমা ছিল। কিন্তু ইয়াজনিয়া পলিয়ানা ছিল ঘন বনবেষ্টিত পল্লীগ্রাম। মহাভারতের পাণ্ডবেরা যে রকম বনে নির্বাসনে গিয়েছিলেন তলস্তয়ের সাহিত্য জীবনে ইয়াজনিয়া পলিয়ানাও সম্ভবতঃ ছিল প্রায় তেমনি সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংগে যোগসূত্রহীন। জমিদারতনয় তলস্তয় বাল্যে এবং যৌবনে মস্কো পিতর্সবার্গের সমাজে মিশেছেন। সেভাস্তপোল, ক্রিমিয়া ঘুরেছেন। অভিজাত মহলের খানাপীনা এবং নাচগানের মজলিসেও তিনি রাত কাটিয়েছেন। অভিজাত নগরজীবনে অভ্যস্ত তলস্তয় কেমন করে ইয়াজনিয়া পলিয়ানার মতো বনভূমিকে সাহিত্য সাধনার স্থান হিসেবে নির্বাচন করলেন? বেছে নিলেন নিভৃত পল্লীর নিঃসঙ্গতা। বিচিত্র মানুষের জীবনবোধ। কিন্তু তলস্তয়ের জীবনবোধ বৈচিত্র্যের মধ্যেও এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ছিল না ইয়াজনিয়া পলিয়ানা—এখনও নয়। সাহিত্য জীবনের মধ্যাহ্নে রবীন্দ্রনাথের চেয়েও নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেছেন তলস্তয়। রবীন্দ্রনাথ বহুবার বিশ্ব ভ্রমণ করেছেন—রয়েছেন জাহাজে জাহাজে। তাঁর রচনাস্থল শুধু শান্তিনিকেতন, শাহজাদপুর, শিলাইদহ, কলকাতা নয়। হারুনামারু জাহাজ এমন কি বুয়েনস এয়ারিসও। রবীন্দ্রনাথের তুলনায় তলস্তয় খুব সামান্যই ভ্রমণ করেছেন। তাই আমার কাছে সাহিত্য সাধনার পীঠস্থান হিসেবে নির্বাচিত তলস্তয়ের ইয়াজনিয়া পলিয়ানা আজও একটি বিস্ময়। দ্বিতীয় বিস্ময় ১৩/১৪টি সন্তানের জননী কাউণ্টেস তলস্তয়ের অসাধারণ সহনশীলতা। তলস্তয় বারবার রচনার খসড়া সংশোধন করতেন। ওয়ার এ্যাণ্ড

পীসের মতো বিশাল গ্রন্থের চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি তৈরী করতে নাকি কাউন্টেসকে গোটা বইটি সাতবার নকল করতে হয়েছিল। অবশ্য ওঁদের শেষ জীবন সুখের হয় নি। সেটা অন্য প্রসংগ এবং সেজন্য তলস্তয় কম দায়ী নন। মনে পড়ে কার্ল মার্কসের স্ত্রীর কথা। স্বামীর প্রতিভা বিকাশে নিঃশর্ত সহযোগিতা করতে গিয়ে ঐ উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা নিজ ব্যক্তিত্বকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে দিলেন।

ঘণ্টা দু'য়েক ঘুরাফেরা করেছিলাম ঐ জঙ্গলে। বেরিয়ে রেস্তোরাঁয় ভাত খেলাম। ফেরার পথে ঘুরতে হয় নি। সন্ধ্যার একটু আগে ভলগা নদীর পুল পার হচ্ছিলাম। বনজঙ্গল পাহাড় পর্বত ভেদ করে সুদূরে চলে গেছে নদীর আকাবাঁকা স্রোত। বেশ লাগলো সে দৃশ্য। গোধুলি লগ্নে পথি-পার্শ্বের জলাশয়ে হংসবলাকা ভাসছে। একটু পরে কুলায় উড়ে যাবে। পল্লীর বুড়ী মহিলারা লাঠি হাতে বাড়ীর সামনে দু'এক পা হাঁটছেন। কেউ কেউ বাড়ীর সামনে হেলানো টুলে বসে হয়তো অতীত রোমন্থন করছেন। মনে হলো ঐ বৃদ্ধা মহিলারাও এখন জগতে নিঃসঙ্গ একা। দুজন লোক ছালা ভর্তি গরুর ঘাস মাথায় বাড়ী ফিরছিল। বাসস্ট্যাণ্ডের টুলে বসে বাসের জন্য অপেক্ষা করছে বোঁচকাবুঁচকি ও ছেলেমেয়েসহ দূরের যাত্রী। শিশুরা লজেন্স খাচ্ছে। পৃথিবীর কোনো জায়গাই প্রকৃতপ্রস্তাবে অজানা অচেনা নয়। মানুষরূপে অন্তর্গভীরে ওরাও যা আমরাও তাই। আর্থিক নিরাপত্তা, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য মানবজীবনকে সংস্কারমুক্ত করে ঃ জীবনে আনে সুশৃঙ্খল সৌন্দর্যবোধ। লেনিন সম্ভবতঃ এই ভেবেই বলেছিলেন—স্বাধীনতা অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু বলেই সেটাকে রেশন করে উপভোগ করতে হয়। মস্কো ফেরার পথে গোধূলির নিঃসঙ্গতায় আমার মনে হলো, স্বাধীনতাকে শ্রেণী বিশেষের ভোগ্যবস্তু না করে সকলে মিলে একটু একটু করে ভোগ করার ফলেই আজ সোভিয়েত ইউনিয়নের কোনো একটি মানুষও আমাদের দেশের শতকরা ৮০/৯০ জন মানুষের মতো স্বাধীনতার সুখ থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত নয়।

মস্কো-লেনিনগ্রাদের মানব জীবন আজ নিঃসন্দেহে এ্যাফ্লুয়েণ্ট সোসাইটির (সুখ সমৃদ্ধির) জীবন। প্রতি পরিবারে রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন, গ্যাস, বিজলীবাতি আছে। মোটর গাড়ীর সংখ্যাও বিপুল। ওঁরা ফ্রয়েড পড়েন, মনোবীক্ষণ করেন। তলস্তয়ের আনা কারনীনাদের মতো দ্বৈত আনুগত্যের পীড়নেও হয়তো ভোগেন মস্কো-লেনিনগ্রাদের বহু নরনারী। জয়েস, প্রুস্ত কাফকা, দস্তয়ভস্কিতেও ওঁরা আজ বিচরণ করেন। কথাগুলো শ্রীমতী সালগানিক আয়োজিত বৈঠকেও বলেছিলাম। জীবনবোধ এবং ভোগ-বিলাসের উপলব্ধিগত ও ব্যবহারিক তারতম্য আছে বৈকি। কিন্তু এটাও সত্য যে, সুখসৌন্দর্যময় জীবনযাপনের অত্যাবশ্যক উপাদানগুলো পল্লীবাসী সাধারণ মানুষের ঘরেও পেঁাছে গেছে। স্বাধীনতা ভোগের পূর্বশর্ত পরাধীনতা এবং স্বাধীনতার পার্থক্য বিদূরণ। সে পার্থক্য বিদূরিত হয়েছে। ইতিহাসের শেষ অধ্যায় নেইঃ মার্কসের দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের মূল কথাও তাই। অর্জিত আর্থ-সামাজিক স্বাধীনতা সুদূর ভবিষ্যতের সোভিয়েত মানুষ কিভাবে কোন্ পদ্ধতিতে ভোগ করবেন সেটা তাঁরাই স্থির করবেন।

মস্কো-ইয়াজনিয়া পথের পাহাড়গুলোর একটি বৈশিষ্ট্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড় চূড়ার মতো ওগুলোর চূড়া খাড়া নয়—ক্রমে ক্রমে উঁচু হয়েছে এবং উপরে বিস্তীর্ণ সানুদেশ। তাই সাপের মতো পেঁচানো সড়কপথ নেই। সরল রেখায় চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে চলে গেছে সড়ক। ওঠা-নামার সময় রোমাঞ্চ বোধ করেছি। জঙ্গলের মাঝে মধ্যে—উপত্যকায় অথবা সানুতে—কোথাও কোথাও বিশাল কৃষি খামার—বাঁধাকপি এবং ঐ ধরণের শাকসব্জির খেত—সে অঞ্চলে এসব ফসলের ওটাই সময়। নদী উপত্যকাগুলো অতি মনোরম। লোকেরা দল বেঁধে বাঁধাকপি কাটছেঃ তুলছে ধনে পাতা এবং আরো কত কি। কৃষি ব্যবস্থা যান্ত্রিক। পরিবহণ ব্যবস্থাও যান্ত্রিক। গরু-ছাগল দুধ ও মাংসের জন্য পালন করা হয়। মোরগ-মুরগী প্রধানত ডিমের জন্য। ওরা হাঁসের ডিম খায় না। হাঁস পালন

করে মাংসের জন্যে। হাঁস-মোরগ-ছাগল-বকরি-ভেড়া-দুম্বা-গরু প্রভৃতি প্রায় সব প্রাণী সোভিয়েত ইউনিয়নে দেখেছি। কিন্তু ঘোড়া বিরল। রাস্তার ধারে মাত্র এক জোড়া ঘোড়া নজরে পড়েছিল। এমন তাজা ঘোড়া আমাদের দেশে এখন বিরল। বুঝলাম, যন্ত্র অশ্বের স্থান অধিকার করেছে।

আরো চোখে পড়েছে ব্যাপক নির্মাণকার্য। নতুন নতুন বাড়ীঘর উঠছে ঃ নির্মিত হচ্ছে বড় বড় কলকারখানা। সড়ক হচ্ছে। পল্লীর পুরনো বাড়ীঘরের জায়গায় উঠছে বহুতল এ্যাপার্ট-মেণ্ট দালান। গ্রাম ও শহরের পার্থক্য ঘুঁচে যাচ্ছে। সর্বত্র বিদ্যুতালোক। যত ছোটই হোক প্রতি জনপদে একটি করে বড় সরকারী বিপণি। রুটি থেকে শুরু করে বস্ত্র পর্যন্ত সব কিছুই ওসব দোকানে মজুত থাকে। মস্কোর এক বহুতল ডিপার্টমেণ্টাল বিপণির অসামান্য ভিড়ের মধ্যে আমার মনে এক কৌতুকপ্রদ প্রশ্ন জেগেছিল ঃ ওঁরা এত মাল কেনাবেচার যথার্থ হিসেবপত্র রাখেন কি করে? তার উপরে আবার সরকারী দোকান। আমাদের দেশের সরকারী প্রতিষ্ঠান হলে, হাত সাফাইর ফলে, লোকশান দিতে দিতে লাটে উঠতো। আমাদের সরকারী সংস্থা প্রতি বছর পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করেও বিপুল লোকশান দেয়। পল্লীগ্রামের সরকারী এবং আধা সরকারী সমবায় বিপণিগুলো বহু আগেই পটল তুলেছে। প্রশ্নের জবাব নিজেই খুঁজে বের করলাম। অবাধ স্বাধীন প্রতিযোগিতার ইকনমির পাশাপাশি নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার ইকনমি অচল। স্বাধীনতা, সততা, সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব এবং জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি বোধগুলো প্রকৃতপক্ষে একটি অবিচ্ছেদ্য বস্তু।

সেদিনের তাপমাত্রা ছিল শূন্য সেণ্টিগ্রেডে। বরফ পড়েনি। তবু চড়াই উতরাইর সড়কে স্বাস্থ্যবান তরুণ তরুণীরা স্কী প্র্যাকটিস করছিল। বরফ পড়লে খেলা জমবে। সিনেমার পর্দায় স্কী খেলা দেখেই আমি আতঙ্কে শিউরে উঠি ঃ আমার কেবল হাত পা ভাঙ্গার কথাই মনে হয়। মস্কোর হোটেলে যখন ফিরে এলাম রাত তখন প্রায় ন'টা।

পরদিন ২৮শে সেপ্টেম্বর, সকাল সাড়ে সাতটা। বাইরে চমৎকার সূর্যালোক ঃ কুয়াশাকাটানো আলতাছোপানো মস্কো। পঁচিশ-ত্রিশ তলা বিশাল অট্টালিকার কাঁচের জানালা চিকমিক করছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে আজ আমার শেষ দিন। রাত সাড়ে আটটায় হোটেল ছাড়তে হবে, সাড়ে দশটায় ঢাকাগামী বিমান। দিনটি অলস বিশ্রামে কাটিয়ে দিলাম। বিমানবন্দরে বিদায় দিল আমার দোভাষী নাতাশা এবং মস্কো মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র স্নেহভাজন মোশতাক। এগারোটায় বিমান উড়লো।

যে-পথে গিয়েছিলাম বিমান সে-পথে ফিরলো না। ইরানে বিপ্লব হচ্ছে। এবার পথ তাসখন্দ, করাচি, বোম্বাই হয়ে ঢাকা।

বিমান উড়তে মনে পড়লো মায়াকভস্কির কবিতার কয়েকটি পঙক্তি ঃ

"Look at heaven, gaping with boredom :
We have shut it out from our songs
Hey, great Dipper, demand
That they hoist us to heaven alive.
Drink to joy ! shout !
Spring has flooded our blood.
Heart exults beat !
Our breasts are crashing brass.

"তাকাও আকাশ পানে ঃ সেখানে অলস ক্লান্তির ব্যাদান
আমাদের সংগীতের দ্বার, তার জন্য মুক্ত নয় আর
হে মহান ডিপার ওঠাও ওঠাও জোর দাবী
সজীব মানুষের তরে খোল স্বর্গের চাবি
আনন্দেরে করো পান, তোল উল্লাসধ্বনি
বসন্ত এনেছে রক্তে মোদের প্লাবন
হৃদয় তুমি করো উল্লাস, উঠুক রণি।
বক্ষ মোদের হোক পিত্তলভেরী।

———